র্পণ (কবিত)—শ্রীনিরুপমা দেবী ৭৯৮
মি মোরে করেছ কামনা (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ৩৮৭
াসী (চিকিৎসাশাস্ত্র)—ভিষগ্‌রত্ন, কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী কবিশেখর এল্‌-এ-এম-এস, এচ-এম-বি ২৯৬
ক্ষণ জার্ম্মাণী (বিবরণ)—অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ ১৮৫
রিদ্রতা (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৪৯০
নের মর্য্যাদা (উপন্যাস)—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ৪,১৮০
বীহারা (গল্প)—শ্রীরাধারাণী দত্ত ৯০৮
ঃখ (কবিতা)—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ৬১
ালনা (চিত্র)—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর ৫৫৬
ন্দ্ব (উপন্যাস)—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় ১২,২১৯,৩৪০,৫০৯,৬৫৫,৮১৫
র্ম্মের বিকৃতি (ধর্ম্ম)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় এম-এ ৫৯
বদ্বীপ—মায়াপুর (প্রতিবাদ)—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৪৫৩
বান্ন (কবিতা)—শ্রীরামেন্দু দত্ত ৩
রীজীবনের বিশেষত্ব (মাতৃ-মঙ্গল)—ডাক্তার শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় ১৯
রীপ্রসঙ্গে ইস্‌লাম্‌ (মাতৃ-মঙ্গল)—মুহম্মদ্‌ অব্‌দুল্লাহ্‌ ৭০৮
খিল-প্রবাহ (বৈদেশিকী)—শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্‌সি ১৫৬, ৩১১, ৪৬০, ৬১৯, ৭৪৮, ৯২৫
নির্য্যাতিতার কাহিনী (মাতৃমঙ্গল)—শ্রীরাধারাণী দত্ত ১৭
নিশীথ রাতের ঘুম (গল্প)—শ্রী মীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ ৬২৮
নূতন যাত্রী ৪০৭
নৃতত্ত্বে জাতিনির্ণয় (বিজ্ঞান)—অধ্যাপক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম.এ, পিএইচ-ডি (বার্লিন) ৫৬৬, ৭৬৩
পতিতার কথা (মাতৃমঙ্গল)—শ্রীহরিপদ মহলানবীশ ২৪
পতিতা-সমস্যা (সমাজতত্ত্ব)—শ্রীশৈলেশনাথ বিশী বি-এল ৭২০
পথের আলো (গল্প)—শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৪
পরলোক-প্রসঙ্গে ইস্‌লাম্‌ (ধর্ম্মতত্ত্ব)—মুহম্মদ্‌ অব্‌দুল্লাহ্‌ ২০৫
ল্লী-বিধবা ও শিক্ষা (মাতৃ-মঙ্গল)—শ্রীগিরিবালা রায় ৫১৫
ল্লী-সংস্কার ও সংগঠন (অর্থনীতি)—শ্রীগুরুসদয় দত্ত এম-এ, আই-সি-এস ৫২৭
পাগল (কবিতা)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৫২৬
পাণ্ডুয়া (কাহিনী)—কুমার শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ২৫০
পারের ডাক (কবিতা)—শ্রীপরিতোষ চন্দ্র ৪৫৯
পিয়ারী (উপন্যাস)—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল ২৪৬, ৩৫৮, ৫৪০, ৭৪১, ৮৪৪
পীঠস্থান (গল্প)—অধ্যাপক শ্রীআনন্দকিশোর দাশ এম-এ ৩৮
পুস্তক-পরিচয় ১৪৪, ৪৬৭
প্রণবের ব্যাখ্যা (দর্শন)—সত্যভূষণ শ্রীধরণীধর শর্ম্মা ৪৮১
প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কার (প্রত্নতত্ত্ব)—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় ১১১
প্রাচীন কথা-সাহিত্য (সাহিত্য)—ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি ৮১৩
প্রাচীন কলিকাতা (বিবরণ)—কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর, বি-এ ৩০৩
প্রাচীন ভারতে কাম্বোজ জাতি (ইতিহাস)—ডাক্তার শ্রীবিমলচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি ৫০
প্রাচীন যুগে রেশম ব্যবসায় (বাণিজ্য)—শ্রীনলিনীকান্ত

প্রেততত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব (আলোচনা)—শ্রীচণ্ডীদাস মজুমদার, বি-এ, বিদ্যারত্ন, সাহিত্যভূষণ ৭৪৫
প্রেততত্ত্ব (Spiritualism)—শ্রীচণ্ডীদাস মজুমদার; বি-এ, বিদ্যারত্ন সাহিত্যভূষণ ২০১
প্রেমতত্ত্ব (বিজ্ঞান)—অধ্যাপক শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ২৬৯
ফাঁকি (কবিতা)—বন্দে আলি মিয়া ৬৭০
ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত (রঙ্গ ও ব্যঙ্গ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৫৬
ভারতের সহিত আফ্রিকা ও ইজিপ্টের প্রাচীন কালে ঘনিষ্ঠ সংস্রবের বিশেষ ঐতিহাসিক প্রমাণ (ইতিহাস)—অধ্যাপক শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ ৫৬
ভূটান (বিবরণ)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ১১৯
ভোরের বায় (কবিতা)—মৌলবী গোলাম মোস্তফা বি-এ,বি-টি ৫৬১
ভ্রম সংশোধন (গল্প)—শ্রীরেবা দেবী ২৬৪
ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ৩৩৪
মন দিয়ে মন জানা যায় (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ৮৯১
মনের ঘাত-প্রতিঘাত ও কর্ম্মফল (বিজ্ঞান)—ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার ৮৬
মনোবিদ্যা (মনস্তত্ত্ব)—ডাক্তার শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম-এ, পিএইচ-ডি (হার্ভার্ড) ৮৫১
"মর্গে"র মর্ম্মব্যথা (গল্প)—শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ ৮৭৫
মহম্মদপুর (কাহিনী)—শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী ৫১৪, ৭৩০
মান্দ্রাজের বন্দরে (ভ্রমণ-কাহিনী) শ্রীযতীশচন্দ্র বসু বি-এ ৮৮৫
মায়ের মিনতি (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৪৪৩
মিরা সেটী (জ্যোতিষ)—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম-বি-এ-এ ৬৬১
মুক্তি-বাঁধন (কবিতা)—শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ৭০৭
মুরলা (গল্প)—অধ্যাপক শ্রীসত্যভূষণ সেন এম-এ ২৭৩
মেঠো হাকিমের কড়চা (নক্সা)—শ্রীমুহ তমিম্‌ বন্দোবস্ত্‌ ৩৮৮, ৬ ৯
যাজপুর (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ ১৩১
যুদ্ধে বাঙ্গালী (আলোচনা)—ডাক্তার শ্রীনিবারণচন্দ্র মিত্র এম-বি [illegible]
রক্তের টান (গল্প)—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৭৫
রয়েল সোসাইটী (বিবরণ)—শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা ৮১৯
রাজগী ! (উপন্যাস)—ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ ডি-এল ২৯, ১৬৭, ৩২৯, ৪৯১, ৬৪৫, ৮০৭
রাজ্যশ্রী (সাহিত্য)—অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম-এ ১৭৪
লক্ষ্য অন্বেষণ (চিত্র)—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর ৮১২
লর্ড কার্জ্জন (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৭৯৭
লোটা (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৩৩
বরযাত্রী (গল্প)—শ্রীসুনীতি দেবী বি-এ ২৩৪
বলিভিয়া (বিবরণ)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৯৩১
বসে আছি তোমারি আশায় (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ৯৪৮
বাংলার পাট (কৃষি)—শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায় ২৯৭
বাঙ্গালার পাট (কৃষি)—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র ৪৫২
বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব ৫৭১
বাদ-প্রতিবাদ ১৩১, ৬৩৫
বাদানুবাদ ৭৭২, ৯৪৬
বার্টরাণ্ড রাসেল (চয়ন)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ১০৩
বার্লিন (ভ্রমণ-কাহিনী)—অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ ৩৭৮
বিজলী-বিকাশ (বিজ্ঞান)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এ-এম-এস-ডি ৯৪
বিদেশে বাঙ্গালী খেলোয়াড় দল ১৩৯

বেদের কথা (দর্শন)—অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ ১
বেলজিয়ম (বিবরণ)—শ্রীনরেন্দ্র দেব (২৯৫
বৈজ্ঞানিক আহার-বিচার (বিজ্ঞান)—শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়, বি-এস্‌সি ২০২
ব্যাণ্ডেল (কাহিনী)—কুমার শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় ৬৯১
ব্রজের বাঁশরী (কবিতা)—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম-এ, বি-সি-এস ৯০৭
শাহাজাদী বা-দা-বুমএর অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী (ব্যঙ্গচিত্র) শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ১০১
শিকার (গল্প)—শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ ৬৭১
শিবির-কাহিনী (সামরিক)—কর্পোরাল শ্রীমাখনলাল সমাদ্দার ১৭৭
শীয়েড়া লেয়েঁ। (বিবরণ)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৪১০
শেষ চেষ্টা (চিত্র)—শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ৮৪৩
শোক-সংবাদ ১৪৬, ৪৭২, ৬৩৩
শ্রীমান সত্যরঞ্জন দাস গুপ্ত ১৩৮
শ্রীযুক্ত সার ওঙ্কারমল জেঠিয়া কেট্টি ৩০১
শ্রীশ্রীজগন্নাথজী (কবিতা)—শ্রীকনকলতা ঘোষ ৩২৮
সংক্ষিপ্ত নব্য অলঙ্কার শাস্ত্র (রঙ্গ ও ব্যঙ্গ)—শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী ৩৭০
সঙ্গীত—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন ও শ্রীসাহানা দেবী ২৩২, ৪০৮, ৭৭১
সঙ্গীত—শ্রীসাহানা দেবী ৮৯৩
সঙ্গীত—স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায় ও শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন ৩৪
সজীব নায়ক (চিত্র)—শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ ১৪৮
সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক ? (মাতৃমঙ্গল) শ্রীরাধারাণী দত্ত ৪০৪
সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক ? (সমাজতত্ত্ব) শ্রীসুনীতি দেবী ৭৭২
সন্তরণ-প্রতিযোগিতা ১৩৭
সপ্তগ্রাম (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ৯১৭
সভ্যতা ও আর্থিক অবস্থা (অর্থনীতি)—সফিয়া খাতুন বি-এ ৮
সমাজ-বিজ্ঞান (বিজ্ঞান)—স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী ৪৪০
সাইকেলে কাশীযাত্রা ১৩৩
সাময়িকী ১৫৬, ৩১৯, ৪৭৬, ৬৩৭, ৭৯৯, ৯৫৩
সাহিত্য-সংবাদ ১৬০, ৩২০, ৪৮০, ৬৪০, ৮০০, ৯৬০
সোমনাথের মন্দির (কবিতা)—শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ২৩১
স্মরণে (কবিতা)—শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ ৭২৯
স্মৃতি-তর্পণ ৭৯৫
স্বপন (কবিতা)—শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা ১৬
স্বরলিপি—শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা ৬২৯
হস্তপদাদির বিকৃতি ও বৈচিত্র্য (চিকিৎসাশাস্ত্র) কাপ্তেন শ্রীসত্যকুমার রায় এম-বি ৫৪৬
হিন্দীভাষা ও কবি-সমাদর (সাহিত্য)—লেফ্‌টেন্যান্ট শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী ৭২৪
হিন্দুর বর্ত্তমান অবস্থা (সমাজতত্ত্ব)—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল ৭১৭

চিত্র-সূচি

পৌষ—১৩৩১

জরায়ু ... ১৯
জননেন্দ্রিয় ... ২০
স্বেচ্ছাসৈনিক প্রথম দল...যাত্রার পূর্ব্বে ... ৬৯
স্বেচ্ছাসৈনিক...আবেদন ... ৬৯
স্বেচ্ছা......পণ্ডিচারীতে ... ৭০
স্বর্গীয় মনোরঞ্জন দাস ... ৭০
শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, শ্রীযুক্ত হারাধন বক্সী ... ৭১
শ্রীযুক্ত অমিতাভ ঘোষ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ ... ৭১
শ্রীযুক্ত তারাপদ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন দত্ত ... ৭২
শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার ... ৭৩
শ্রীযুক্ত কানাইলাল ভট্টাচার্য্য ... ৭৩
তুল হইতে ভার্দ্দূন যাত্রার পূর্ব্বে ... ৭৪
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দে ... ৭৪
কামান লইয়া পরীক্ষা, বাঙ্গালী ও ফরাসী সৈনিক ... ৭৫
বাঙ্গালী ও ফরাসী সৈনিক ... ৭৫
গ্রাজুয়েট্ স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সেন ... ৭৬
সৈনিকদিগের মধ্যাহ্ন ভোজন ... ৭৬
সৈনিক স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সেন, যোগীন্দ্রনাথের মেডেল ৭৭
সংবাদপত্র পাঠ ... ৭৮
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কোপার ওভেন্স ... ৯৪
উইলপুটি ওভেন্স, উইলপুটি নিস্পেষণ যন্ত্র ... ৯৫
কয়লা আমদানীর ষ্টেসন, চার্জ্জ লরি ... ৯৬
দ্বার নিষ্কাষণ যন্ত্র, পুরাতন কোক পুসার ... ৯৭
ঘড়ির কল, তাপের যন্ত্র, বুষ্টার ষ্টেসন ... ৯৯
সেণ্ট্রিফিউগ্যাল ড্রাইয়ার, সুইচ হাউস ... ১০০
মাহেঞ্জোদারো স্তূপ ... ১১১
হরপ্পা স্তূপ ... ১১২
হরপ্পায় প্রাপ্ত বলয়, মাহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত কণ্ঠহার ... ১১৩
মাহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত মৃৎপাত্র ... ১১৪
মাহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত সিলমোহর ... ১১৪
চিত্রাঙ্কিত সিলমোহর ... ১১৫
মৃত্তিকা নির্ম্মিত মূর্ত্তি ... ১১৬
বৃষমূর্ত্তি অঙ্কিত সিলমোহর ... ১১৭
উৎসবে সমবেত মহারাজা, ভূটানের সম্রাট পরিবার ... ১১৯
মন্ত্রিসভ্য, লিঙজী ... ১২০
রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, বৌদ্ধ দেবরাজ...শিষ্যগণ... ১২১
রক্ষি-পরিবেষ্টিত মহারাজ ... ১২২
ভূটানের মুখোসপরা নাট্যসম্প্রদায় ... ১২২
সপারিষদ রাজা, ফেরীজোঙ দুর্গ ... ১২৩
রাজপ্রাসাদের বাদক সম্প্রদায় ... ১২৪
লামাদের নৃত্যগীত ও বাদ্য ... ১২৪
দেবরাজ ... ১২[illegible]
রাজবন্দনাকারিগণ ... ১২[illegible]
সাধারণ পোষাকে ভূটানের মহারাজা ... ১২৬
তালাও মঠের তাঙ্গো লামা ... ১২৭
ভূটান রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বার ... ১২[illegible]
রাজপ্রাসাদের পরিচারিকাগণ ... ১২৮

ভূটানের মানচিত্র, টঙ্‌শা মঠের লামারা ... ১৩০
শ্রীমান জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ১৩৭
শ্রীমান সত্যরঞ্জন দাসগুপ্ত ... ১৩৮
যাভা-বিজয়ী বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড় দল (১) ... ১৩৯
...রবি গাঙ্গুলী 'সুট' করে 'গোল' দিচ্ছেন ... ১৪০
বলাই চ্যাটার্জ্জি হেড করে...বল পাশ করে দিচ্ছেন ... ১৪০
গোলকিপার পূর্ণদাস...কর্ণার কচ্ছেন ... ১৪০
যাভা-বিজয়ী বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড় দল (২) ... ১৪১
৺গৌরহরি সেন ... ১৪৭
হিসাবের কল ... ১৫১
সাঁতারের বেশে, নূতন চশমা, দাভিঞ্চির কল্পিত বিমান... ১৫২
তারহীন বেতার, পাতালে বেতার, যমজ গ্রহ ... ১৫৩
গ্রহনির্দ্দেশক দূরবীণ, মাকড়সার জাল, বৈদ্যুতিক ক্ষুর ... ১৫৪
বেতার যন্ত্র, বেতার যন্ত্রের পার্শ্বদিক ... ১৫৫

বহুবর্ণ চিত্রসূচি

শিশিরকুমার ঘোষ (প্রচ্ছদপট)　মৃত্যু প্রতীক্ষায়
যশোদা জীবন　ওমর খৈয়াম　মুক্তির ডাক

মাঘ—১৩৩১

মিউনিকের এক দৃশ্য ... ১৮৬
ট্রাউস্‌লিট্‌স দুর্গ (ল্যাণ্ডস্ হুট) ... ১৮৭
নয় মার্কট্ পল্লী ... ১৮৮
হোফব্রয় হাউস্ বা বিয়ার ভবন ... ১৮৯
ফ্রাওয়েন কির্চ্চে মন্দির ... ১৯০
বাস্ত শিল্পী হিল্ডেব্রাণ্ডের গড়া ফোয়ারা ... ১৯১
'টোন'—শিল্পী রাইটার পরিবার ... ১৯২
প্রাকৃতিক চিকিৎসক চার্নাক ... ১৯৩
শিক্ষাগুরু কের্শেন ষ্টাইলার ... ১৯৪
ড্যয়চেস মুজেয়ুম ... ১৯৫
নমাজী সাহেবের সমাধি মন্দির ... ২২৬
তিরুপত্তি মন্দিরের মোহান্ত ও তাঁহার শিষ্য চতুষ্টয় ... ২২৭
কালনায় সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজীর আশ্রম ... ২২৮
সিদ্ধ হনুমান দাস বাবাজীর আশ্রম ... ২২৯
বৈঁচী মন্দির ... ২৫০
পাণ্ডুয়া মিনার ... ২৫১
পাণ্ডুয়া মসজিদের ধ্বংসাবশেষ (১) ... ২৫২
পাণ্ডুয়া মসজিদের ধ্বংসাবশেষ (২) ... ২৫৩
পাণ্ডুয়া বিজয়-স্তম্ভের প্রবেশদ্বার ... ২৫৪
পাণ্ডুয়া ফাত্ খাঁ সুরের মসজীদের শিলালিপি ... ২৫৫
পাণ্ডুয়ার "বাইশ দরজা" মসজিদ ... ২৫৬
পাণ্ডুয়া মসজিদের অভ্যন্তরস্থ কুলুঙ্গী ... ২৫৭
পাণ্ডুয়া মসজিদে বৌদ্ধ ঘণ্টা সংযুক্ত কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ ২৫৮
পাণ্ডুয়া মিনার, পেঁড়োর মন্দির ... ২৫৯
পাণ্ডুয়া মসজিদের অভ্যন্তর ... ২৬০
পাণ্ডুয়া কৌরিয়া বা মতী-মসজিদের শিলালিপি ... ২৬১
জাফর খাঁ গাজীর ত্রিবেণী মসজিদ ... ২৬২
...নন কমিষণ্ড অফিসারগণ ... ২৭৭
কোয়ার্টার গার্ডস ও শিবিরের অন্য প্রান্ত ... ২৭৮
শিবিরের এক প্রান্ত
মীর আরব মাদ্রাসা, বোখারার চৌরাস্তা ... ২৮৪
রেজিস্থান বা বোখারার বড়বাজার ... ২৮৫
পশুলোম ব্যবসায়ীদের বাজার ... ২৮৫
ক্যাকশীয় দম্পতী, সভ্যতার পথে ... ২৮৬
বোখারার তিনজন মোল্লা ... ২৮৬
বোখারার একটী প্রাচীন গলিপথ ... ২৮৭
আমীরের প্রাসাদ অভ্যন্তরস্থ কারাগার ... ২৮৭
আজেরবায়জানের কয়েকজন বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রীপুরুষ ... ২৮৮
জনৈক দরবেশ ... ২৮৮
বোখারার বিদ্যাপীঠ, বাকু-প্রবাসী একদল পারসিক ... ২৮৯
গণতন্ত্রবাদী শিক্ষিত তাতারী দল ... ২৯০
প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন-পরিষদের প্রথম অধিবেশন ... ২৯০
তাতার ব্যাপারী ... ২৯১
পাঠশালা ... ২৯২
বোখারার একটী পুরাতন সরাইখানা, মস্‌জেদের সম্মুখে ... ২৯৩
একজন ভিখারিণী ... ২৯৪
একদল উজ্‌বেগ, বোখারার মানচিত্র ... ২৯৫
ডাক্তার সুবোধ মিত্র এম-ডি ... ২৯৯
বার্লিনের রণজেন কন্‌গ্রেস ... ৩০০
শ্রীযুত সার ওঙ্কারমল জেঠিয়া কেটি ... ৩১০
জ্যান্ত জগন্নাথ ... ৩১০
নব জ্যোতিষ্কমণ্ডল, বৃক্ষের হ্রাসবৃদ্ধি ... ৩১১
নৈসর্গ-নিকেতন, নৈসর্গ-নিকেতনের বিশ্লেষণ মন্দির ... ৩১২
নৈসর্গিক নিকেতনে নিরূপিত হচ্ছে, বেতারের লিপিযন্ত্র... ৩১৩
সিনোপাস, অতীত যুগের শ্লথ, অতীত যুগের শূকর ... ৩১[illegible]
পেলিওসিওপস্, খড়্গাধারী ব্যাঘ্র, বিরাট টিকটিকি ... ৩১৫
প্রাগৈতিহাসিক যুগের পশু, আইরিশ হরিণ ... ৩১৬
টর্পিডো গাড়ীর পার্শ্বদৃশ্য ... ৩১৬
টর্পিডো গাড়ীর সম্মুখদৃশ্য ... ৩১৭
টর্পিডো গাড়ীর পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন ... ৩১৭
টর্পিডো গাড়ীর পিছনকার দৃশ্য, একচাকার গাড়ী ... ৩১৭
শিশির-শোভিত উর্ণনাভের একটি দৃশ্য ... ৩১৮
" " " ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ দৃশ্য ... ৩১৮

বহুবর্ণ চিত্রসূচি

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রচ্ছদপট)　ভারতী
নীলকান্তমণি　নীলাম্বরী　আলপনা

ফাল্গুন—১৩৩১

সমুদ্রতীর ... ৩৪৪
নিবিল হস্পিটাল ও মেডিক্যাল কলেজ ... ৩৪৫
রসহিলের উপরে মসজিদ ... ৩৪৬
ওয়ালটেয়ার ক্লব ... ৩৪৭
মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি ... ৩৪৮
বাজার ও ক্লক টাওয়ার ... ৩৪৯
স্যানড্যাল পয়েণ্ট ... ৩৫০
সমুদ্রতীর—জেটি ... ৩৫১
স্যানডাল পয়েণ্টের তীরের দৃশ্য ... ৩৫১
প্রধান রাজপথ

ট্রাউস্‌লিট্‌স দুর্গের ভিতরকার গির্জা ... ৩৮১
ম্যাডোনা, চিত্রশিল্পী লিবারমান ... ৩৮২
চিত্রশিল্পী টোমা ... ৩৮৩
বনের হরিণ ... ৩৮৪
ভোনমারের আঁকা ছবি ... ৩৮৫
ইয়ান্বের দল ... ৩৮৬
দাঁড় বাহী ... ৩৮৭
নূতন ধাত্রী ... ৪০৭
'শে' খেলা, মেন্দি মেয়েদের কবরী ... ৪১০
বুন্দু মেয়েদের সন্ধ্যাবন্দনা, মীনেশ্বরী মন্দিরে নৃত্যগীত ... ৪১১
মেন্দি পল্লীর কুটীর, নব দীক্ষিতা বুন্দু ... ৪১২
নুমোরী দেবতার বিগ্রহ ... ৪১২
বুন্দু মেয়েদের প্রাতঃ প্রণাম, দোলনায় নৃত্য, ... ৪১৩
মীনেশ্বরী দেবীর বিগ্রহ, মেন্দি নারীর কেশবেশ ... ৪১৪
সাঙ্‌টে বাদকের দল, ভূতশান্তির বেড়ী ... ৪১৬
বুন্দু বালারা, "বুন্দু" প্রেত্‌নী সম্প্রদায় ... ৪১৬
বুন্দু প্রেতনীদের মুখোস, মুখোসের পশ্চাৎদিক ... ৪১৭
নর্ত্তকীর বেশে, শেগুড়া বাদিনীর দল ... ৪১৮
"বিন" ভূত সম্প্রদায়, মেন্দি মেয়ে ... ৪১৯
মেন্দি সর্দ্দার, "পোরো" গুপ্ত সমিতি ... ৪২০
শিক্ষানবীশ বুন্দু মেয়েদের নৃত্য ... ৪২১
মেন্দি মেয়েদের নাচ ... ৪২২
লৌহ মুদ্রা প্রভৃতি ... ৪২৩
শিবির দৃশ্য, আশুতোষ কলেজ ... ৪৩৩
প্যারেডে আশুতোষ কলেজ, লক্ষ্যপরীক্ষা ও বেয়োনেট ফাইটিং ৪৩৪
শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু প্রভৃতি ... ৪৩৫
রান্নাঘর ... ৪৩৬
ক্যাপ্টেন হাইড ও অফিসারগণ ... ৪৩৭
"ডি" কোম্পানী...অফিসারগণ ... ৪৩৯
মৃত্যুবাণ ১, ২, ৩ ... ৪৬০
বিজ্ঞানে নারী, রাজনীতিতে নারী ... ৪৬১
ছায়াচিত্রে নূতনত্ব ১, ২, ৩, বিচিত্রবাহন ১ ... ৪৬২
বিচিত্রবাহন ২, ৩ নির্ব্বাক্ টেলিফোণ, খেলার মুখোস ... ৪৬৩
কারখানায় মুখোস, রণজেনে মুখোস, খনিতে মুখোস ... ৪৬৪
ভূগর্ভের শক্তি, রাসায়নিক স্বর্ণ ... ৪৬৫
ভূমিকম্প নির্দ্দেশক যন্ত্র, কোকো রুটি ... ৪৬৬
শ্রীমান্ সুহৃদকুমার রায় ... ৪৭১

বহুবর্ণ চিত্রসূচি

রাজকৃষ্ণ রায় (প্রচ্ছদপট)
সন্ধ্যা-প্রদীপ — গুণ্টানা
নীরব ভাষা — খুকুর দুঃখ

চৈত্র—১৩৩১

কোর্ট বিল্ডিং, কোর্ট বিল্ডিং হইতে একটী মনোরম দৃশ্য ... ৪৯৭
কোর্ট বিল্ডিং হইতে অপর একটী দৃশ্য ... ৪৯৮
সহরের মধ্যস্থিত লালদীঘি ও অন্দরকিল্লা রোড ... ৪৯৮
টেলিগ্রাফ বিল্ডিং, কর্ণফুলীর একটী দৃশ্য ... ৪৯৯
কর্ণফুলীর অপর একটী দৃশ্য, কর্ণফুলীর একটী দৃশ্য ... ৫০০
চট্টগ্রাম...সম্মুখ দৃশ্য, মিউনিসিপালিটীর...কোয়ার্টার ... ৫০১

কক্সবাজার খেয়াঘাট, সমুদ্র...রাজপথ ... ৫০৩
মহম্মদপুরের নক্সা ... ৫১৫
মহম্মদপুরের পথে ... ৫১৬
মহম্মপুর—রামসাগর ... ৫১৭
রামসাগরের দক্ষিণ পাড় ... ৫১৮
ব্যাঘ্র ধরিবার খোঁয়াড় ... ৫১৯
লক্ষ্মীনারায়ণের দোলমন্দির ... ৫২০
রামচন্দ্রের বাটীর সিংহদ্বার ... ৫২১
রামচন্দ্রের বাটীর ঠাকুরদিগের ঘর ... ৫২২
৺লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা ও ৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুর ... ৫২৩
৺দশভূজার ঘর ... ৫২৪
শ্রীগুরুসদয় দত্ত এম-এ, আই-সি-এস ... ৫২৯
গ্রামের পথে ... ৫৩৯
হস্তের অঙ্গুলীর বিকৃতি ... ৫৪৬
যুক্ত অঙ্গুলী ও বিকৃত পদ ... ৫৪৭
বক্রপদ ... ৫৪৮
ধনুকের মত পদ ... ৫৪৮
বক্র মেরুদণ্ড ... ৫৪৯
বিজয়ী মোহনবাগান ... ৫৫০
ফুটবল ম্যাচ ... ৫৫১
ভেল দিগ্‌দিগ্ ঢাল ও কাপ ... ৫৫৩
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পলশাই ... ৫৫৪
ট্রেড্‌স্......১৯০০ ... ৫৫৫
দোলনা ... ৫৫৬
ঘাটশিলা গিরিবর্ত্ম ... ৫৭২
ঘাটশিলার একটী প্রপাত ... ৫৭৩
সুবর্ণ রেখার......ডোঙ্গা ... ৫৭৪
সুবর্ণরেখার সাধারণ দৃশ্য ... ৫৭৫
ঘাটশিলার আর একটী প্রপাত ... ৫৭৬
সুবর্ণরেখা-তটে বালুকা-পাহাড় ... ৫৭৭
মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীশ্রীরঙ্কিনী দেবী ... ৫৭৭
সুবর্ণরেখা—ঘাটশিলা, সুবর্ণরেখার সান্ধ্যপ্রতিচ্ছবি ... ৫৭৮
বিধা পরবের নৃত্য ... ৫৭৯
লেস বোনার কৌশল, জেলেনী ... ৫৯৫
চাষারা ক্ষেতে কাজ করছে, মিছিলের অপর অংশ ... ৫৯৬
ফ্লেমিশ গোয়ালিনী, লেশ বোনা ... ৫৯৭
মুচী, ওয়ালুন্ রমণী ... ৫৯৮
মন্দিরে উপাসনা, গোয়ালার মেয়ে, ফ্লেমিশ জেলে ... ৫৯৯
বালক উপাসকদ্বয়, বেলজিয়মের চরকা, দুগ্ধ পরীক্ষা ... ৬০০
মিউজ নদীতে মাছ ধরা, কয়লার খনির মেয়ে মজুরনীরা ৬০১
বেলজিয়ান গাড়োয়ান, কুকুরের গাড়ী ... ৬০২
মিছিলের এক অংশ, পাঁজ তৈরী করা ... ৬০৩
পুণ্য শোণিতোৎসব ... ৬০৪
চাষা বউ সজি বেচ্‌ছে ! ... ৬০৫
ক্রীড়ারত বালকবালিকারা, ক্রুস বাহকের দল, ... ৬০৬
লেশ প্রস্তুতকারিণীগণ, মাঠে শন শুকানো ... ৬০৭
ব্রুজেস সহরের পোল, হাটের পথে ... ৬০৮
বেলজিয়মের মানচিত্র ... ৬[illegible]
মিশর যুবরাজের গাড়ী, জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকের গাড়ী ... ৬১৯
মার্কিন বৈজ্ঞানিকের গাড়ী, স্বপ্ন-সঞ্চার ... ৬২০
সূর্য্য কিরণ, জলের মাইকেল, প্রেমতাপ চিরুণী ... ৬২১

তুষার-মণ্ডিত Alaskaর একটী দৃশ্য, দেশভক্তের ব্রত ... ৬২২
দেশভক্তের ব্রত, স্মিথ......মানচিত্র, বাক্‌যন্ত্র ... ৬২৩
প্রাচীন ছবি, বর্ত্তমান কোডাক ... ৬২৪
আলোক চিত্রের জন্মকথা, ১৮৮৪...ক্যামেরা ... ৬২৪
বেতার ফটো ১, বেতার ফটো ২ ... ৬২৫
বেতার ফটো...আলোক-চিত্র গ্রহণ করতে হয় ... ৬২৫
বেতার ফটো...পরিণত,...একখানি আলোচ-চিত্র ... ৬২৬
বেতার ফটো...আলোক-চিত্র ... ৬২৬
চোর ধরা ক্যামেরা...দাঁড়িয়ে আছেন ... ৬২৭
চোর ধরা ক্যামেরা ১,...চোর ধরা ক্যামেরা ২... ... ৬২৭
৺কালীনাথ মিত্র ... ৬৩৩
যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ... ৬৩৪

বহুবর্ণ চিত্রসূচি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (প্রচ্ছদপট)
ঊষা — তন্ময়
বৈরাগ্য — অর্ঘ্য

বৈশাখ—১৩৩২

গো-শকটে মুমূর্ষু সান্তোনিও
মেলিনো সাঁকো (পাদোহ্বা) ... ৬৭৬
আন্তোনিয়ো গির্জ্জার ভিতরকার দৃশ্য ... ৬৭৭
সালোনে প্রাসাদ ও বাজার ... ৬৭৮
বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনা ... ৬৭৯
যুবক ইতালির প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা মাৎসিনি ... ৬৮০
জ্যোত্তের গির্জ্জা ... ৬৮১
দান্তে ... ৬৮২
পিয়াৎসা গারিবাল্‌দি ... ৬৮৩
আন্তোনিয়ো গির্জ্জা ... ৬৮৪
সেণ্ট আন্তোনিয়ো ... ৬৮৫
লেডী অফ্ দি রোজারির বেদী, ব্যাণ্ডেল ... ৬৮৬
ব্যাণ্ডেল কনভেণ্টের উচ্চ বেদী ... ৬৯২
হুগলির উত্তরাংশের মানচিত্র ... ৬৯৩
পর্ত্তুগীজ দুর্গের ভগ্নাবশেষ—হুগলী ... ৬৯৪
ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার দক্ষিণাংশ ... ৬৯৫
ব্যাণ্ডেল কনভেণ্ট—পূর্ব্বাংশ ... ৬৯৬
সপ্তগ্রাম মাধবী-কুঞ্জ ... ৬৯৭
জেস্থট কলেজের ঢীবী—সাওপালো উদ্যান ... ৬৯৮
ফকীরদ্দিনের সমাধিস্তম্ভ ... ৬৯৯
সপ্তগ্রাম—রঘুনাথ গোস্বামীর পাট ... ৭০০
ত্রিবেণী-গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গম ... ৭০১
মুক্তবেণী—ত্রিবেণী ... ৭০২
উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট ... ৭০৩
সপ্তগ্রাম মসজীদ ... ৭০৪
সরস্বতী-তীর ... ৭০৫
কানাইনগরের ৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের মন্দিরের নক্সা ... ৭০৬
বুড়া শিবের বটাচ্ছাদিত ভগ্নমন্দিরের পশ্চাৎভাগ ... ৭৩০
মহম্মদপুর—সুখসাগর ... ৭৩১
শ্রীমার দেবল ... ৭৩২

হরেকৃষ্ণপুরে কৃষ্ণসাগর ... ৭৩৫
মধুমতী-তীরে ... ৭৩৬
প্রাচীন ভুষণা পরগণার মানচিত্র ... ৭৩৭
নূতন টেলিফোণ ... ৭৪৮
বেতারে নিপুণতা, জড়-পদার্থ বিদ্যার উৎকর্ষতা ... ৭৪৯
চিন্তা-শক্তির পরীক্ষা, অঙ্কশাস্ত্রে নিপুণতা ... ৭৪৯
বুদ্ধির মাপকাটি ... ৭৪৯
কীটের ছল, পতঙ্গের ছলনা, প্রজাপতির কারচুপি ... ৭৫০
পতঙ্গের কারচুপি, জ্ঞানের আলোক ... ৭৫১
প্রাণীতত্ত্ব বিভাগে নারী ... ৭৫১
মরণের দ্বারে, গৌরীশৃঙ্গে অভিযান ... ৭৫২
দেহজাত বৈদ্যুতিক শক্তি, কৃত্রিম সৌরজগৎ ... ৭৫৩
চীনামাটীর সেতু ... ৭৫৩
বেতারে দিঙনির্ণয় ... ৭৫৪
বেতার ও মানুষ ... ৭৫৫
কারিন্থিয়ানের সুসজ্জিতা কৃষকবালা ... ৭৮৫
প্রাচীন পোষাকে ভিয়েনার সুন্দরী ... ৭৮৫
টাইরলের ক্ষেত্রপাল, 'সেলো' বাদক ... ৭৮৬
ভিয়েনার পুরাতন ফলের বাজার ... ৭৮৭
বোহেমীয়ার আপেলওয়ালী ... ৭৮৮
প্রাচীন টাইরলের বেশভূষা ... ৭৮৯
টাইরলের বাদ্যকরেরা ... ৭৯০
কৃষকদের ধর্ম্মমূলক গীতাভিনয়, কাঠুরিয়াদের কুটীর ... ৭৯১
ভিয়েনার ফেরিওয়ালী ... ৭৯২
বোঝা স্কন্ধে পার্ব্বত্য পথের যাত্রীরা ... ৭৯২
ভিয়েনার মজুরনীদ্বয় ... ৭৯৩
বর্ত্তমান অষ্ট্রিয়ার মানচিত্র ... ৭৯৪
৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৭৯৫
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাসভবন মোরাদাবাদ—রাঁচি ... ৭৯৬
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সাধনা-মন্দির—রাঁচি ... ৭৯৭

বহুবর্ণ চিত্রসূচি

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (প্রচ্ছদপট)
নাগ পঞ্চমী — তপোবনে
ওমর খৈয়াম — নির্ব্বাসিতা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩২

মাননীয় সার হিউম্যাক্ করসন কে-সি-আই, সি-এস-আই
চাণক্য সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ চার্লস রাসেল ৮০২
চাণক্য-সমিতির সদস্যগণ ৮০৩
লক্ষ্য অন্বেষণ ... ৮০৪
সার হাম্‌ফ্রে ডেভি, রয়েল সোসাইটী ... ৮১২
সার আইজাক নিউটন, মাইকেল ফ্যারাডে ... ৮২০
সার টমাস গ্রেসাম ... ৮২১
সার হান্স শ্লোয়ান, ফ্রান্সিস বেকন ... ৮২২
বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ... ৮২৩
[illegible] ... ৮২৪

ট্রাউস্‌লিট্‌স দুর্গের ভিতরকার গির্জা
ম্যাডোনা, চিত্রশিল্পী লিবারমান
চিত্রশিল্পী টোমা
বনের হরিণ
ভোনগারের আঁকা ছবি
ইয়াপের দল
দাঁড় বাহী
নূতন ধাত্রী
'শে' খেলা, মেন্দি মেয়েদের কবরী
বুন্দু মেয়েদের সন্ধ্যাবন্দনা, মীনেশ্বরী
মেন্দি পল্লীর কুটীর, নব দীক্ষিতা বুন্দু
নুয়োরী দেবতার বিগ্রহ
বুন্দু মেয়েদের প্রাতঃ প্রণাম, দোল্‌না
মীনেশ্বরী দেবীর বিগ্রহ, মেন্দি নারীর
সাঙ্‌টে বাদকের দল, ভূতশান্তির বে
বুন্দু বালারা, "বুন্দু" প্রেত্‌নী সম্প্রদায়
বুন্দু প্রেতনীদের মুখোস, মুখোসের প
নর্ত্তকীর বেশে, শেগুড়া বাদিনীর দল
"বিন" ভূত সম্প্রদায়, মেন্দি মেয়ে
মেন্দি সর্দ্দার, "পোরো" গুপ্ত সমিতি
শিক্ষানবীশ বুন্দু মেয়েদের নৃত্য
মেন্দি মেয়েদের নাচ
লৌহ মুদ্রা প্রভৃতি
শিবির দৃশ্য, আশুতোষ কলেজ
প্যারেডে আশুতোষ কলেজ, লক্ষ্যপরী
শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু প্রভৃতি
রান্নাঘর
ক্যাপ্টেন হাইড ও অফিসারগণ
"ডি" কোম্পানী...অফিসারগণ
মৃত্যুবাণ ১, ২, ৩
বিজ্ঞানে নারী, রাজনীতিতে নারী
ছায়াচিত্রে নূতনত্ব ১, ২, ৩, বিচিত্রব
বিচিত্রবাহন ২, ৩ নির্ব্বাক্‌ টেলিফো
কারখানায় মুখোস, রণক্ষেত্রে মুখোস
ভূগর্ভের শক্তি, রাসায়নিক স্বর্ণ
ভূমিকম্প নির্দ্দেশক যন্ত্র, কোকো রুটি
শ্রীমান্‌ সুহৃদকুমার রায়

বহুবর্ণ চিত্র

রাজকৃষ্ণ রায় (প্রচ্ছদপট)
সন্ধ্যা-প্রদীপ
নীরব ভাষা

চৈত্র—

কোর্ট বিল্ডিং, কোর্ট বিল্ডিং হইতে
কোর্ট বিল্ডিং হইতে অপর একটী
সহরের মধ্যস্থিত লালদীঘি ও অন্দ
টেলিগ্রাফ বিল্ডিং, কর্ণফুলীর একটী
কর্ণফুলীর অপর একটী দৃশ্য, কর্ণফু
চট্টগ্রাম...সম্মুখ দৃশ্য, মিউনিসিপালি
পাহাড়তলীর একটী দৃশ্য, ঐ, বি

আশা সোঁটা ... ৮২৮
প্রাচীন গ্রেসাম কলেজ ... ৮২৯
উইলিয়াম হার্ভে, জন ড্যালটন ... ৮৩০
সভাগৃহ, সার আইজাক......দূরবীক্ষণ ... ৮৩১
আচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসু, জন এভেলিন ... ৮৩২
দ্বিতীয় চার্লস ... ৮৩৩
চার্টার......পৃষ্ঠা, চার্টার পুস্তকের পৃষ্ঠা ... ৮৩৪
প্রধান পুস্তকাগার ... ৮৩৫
ডাক্তার চন্দ্রশেখর ডেঙ্কটাপ্পা রমণ ... ৮৩৬
শেষ চেষ্টা ... ৮৪৩
অন্তঃপুরিকা ... ৮৫৪
মাল্রাজের বন্দরে ... ৮৮৬
পথিপার্শ্বস্থ মন্দির, য়িলার স্কুল ... ৮৮৭
মিউজিয়াম, হাইকোর্ট ... ৮৮৮
সেণ্টমেরি গির্জ্জা ... ৮৮৯
পচপ্পা কলেজ ... ৮৯০
লা কলেজ ... ৮৯১
কর্ম্মক্ষেত্রে ফোর্ড সাহেব, শূন্যে ফোর্ড সাহেব ... ৯২৫
পৃথিবীতে ফোর্ড সাহেব, ফোর্ড সাহেব ... ৯২৫
মিডার সাহেবের সৌধোদ্যান, ক্যাট সাহেবের সৌধোদ্যান, ব্রাউনিং সাহেবের সৌধোদ্যান ... ৯২৬
জাহাজে বিমান, জলের উপরে ডুবজাহাজ, জলের ভিতরে ডুবজাহাজ ৯২৭
কর্কট চিকিৎসার যন্ত্র, চিত্তবৃত্তি নির্দ্দেশক যন্ত্র, চিত্ত বিক্ষেপের বৈচিত্র্য, আলোক-রেখা ... ৯২৮
নর্ম্মসজ্জায়, সমুদ্র প্রবেশের পথে ... ৯২৯
সমুদ্রের তলে, বায়ু ও খাদ্য সরবরাহের যন্ত্র, প্রাচীন যুগের স্তম্ভ ৯৩০

কুইচুয়া যুবতী, তরুণী জননী ...
ঘোড় শোয়ারের দল, পালকের বিচিত্র মুকুটধারী ঢুলির দল ...
বৃষ যুদ্ধ, বলিভিয়ান যুবক, কুইচুয়া রমণী ...
প্রাচীন ইন্‌কা দেবমূর্ত্তি, চোলো বালিকা ...
উৎসব বেশে সজ্জিত বাদ্যকর দল, ল্লামার পাল ...
রেড ইণ্ডিয়ানদে বিচিত্র বাসগৃহ, ক্ষেত্র কর্ষণ ...
মেলাক্ষেত্র, সূর্য্যতোরণ ...
রেড ইণ্ডিয়ান পরিবার, আয়মারা কাঠুরিয়া বালিকাত্রয় ...
ফাঁবীতলায়, পাসরিণী ...
ধর্ম্মোৎসবের মিছিল, কুইচুয়া যুবকবৃন্দ ...
ধীবরের দল, পটোশীয় অধিবাসীবৃন্দ ...
সন্তানবতী জননীর দল, নীড়েন দিয়ে মাটী খোঁড়া ...
বাল্‌শা তয়ী, কুইচুয়া সর্দ্দার ও তার পত্নীপুত্র ...
ইন্‌কাদের প্রাচীন বাসভবন ...
বলিভিয়ার মানচিত্র ...
মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর ...
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...
ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার ...
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ...
ডাক্তার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী ...

বহুবর্ণ চিত্র

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (প্রচ্ছদপট)
পূর্ণিমা — ঐ বুঝি বাঁশী বাজে......
বৌ-দেখা — বসন্তের রাণী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ

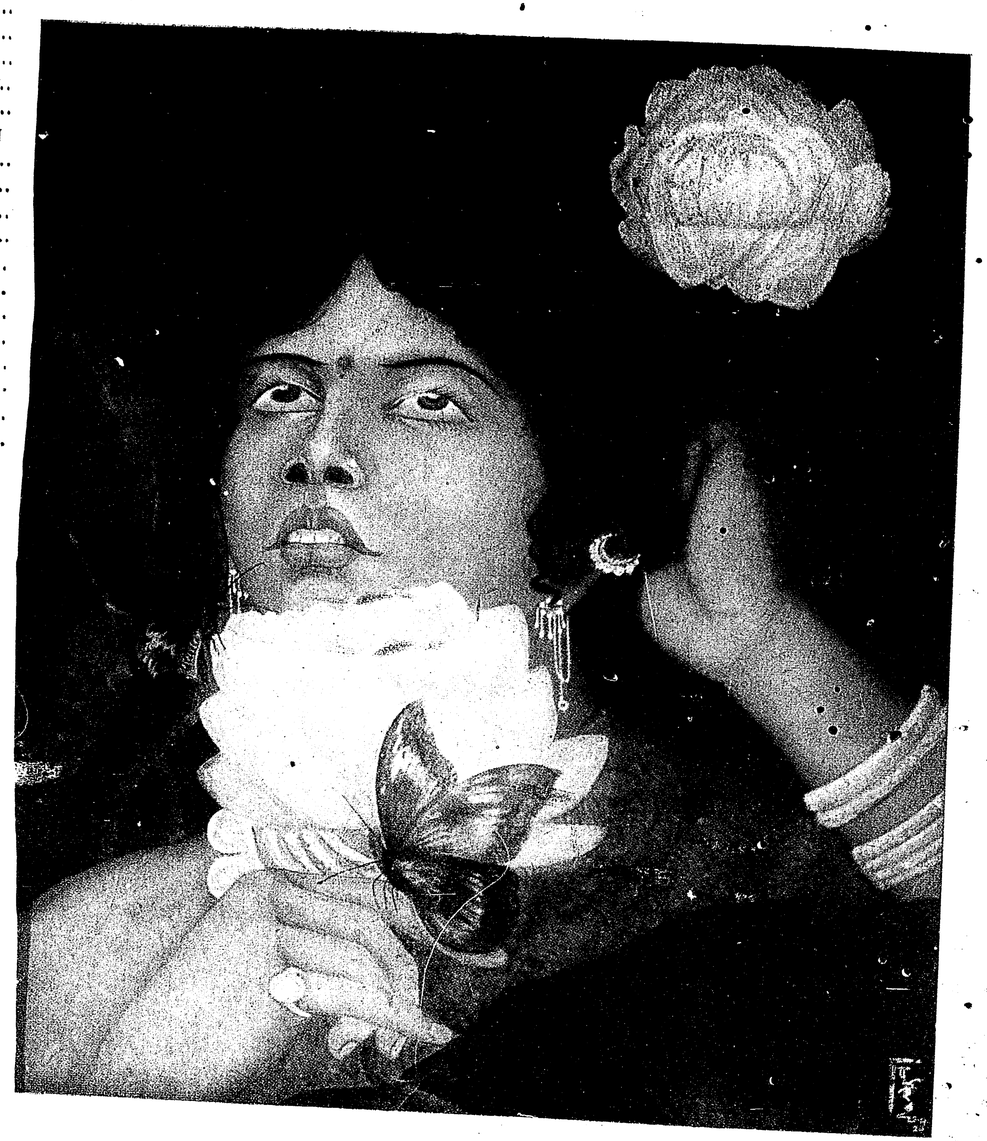

মৃত্যু-প্রতীক্ষায়

B. H. P. Works.

COLOURED ILLUSTRATION

ভারতবর্ষ

পৌষ, ১৩৩১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাদশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বেদের কথা

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

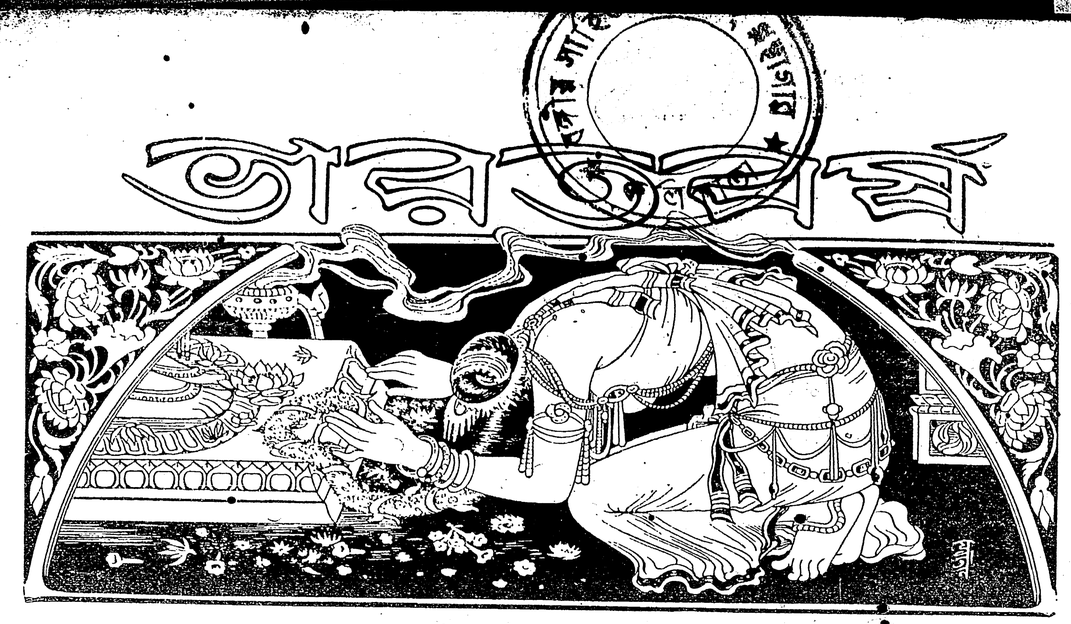

বেদে সত্যসত্যই কি খাঁটি Physics আছে? যদি থাকে, তবে তাহার কাছে ঘাড় নোয়াইতে বিজ্ঞানসেবী সভ্য-জগতের কোনই দ্বিধা থাকিবে না, পাদ্রি সাহেবেরা অথবা ব্যাকরণের পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন না কেন। ফল কথা, দুর্ভাগ্য ইহাই যে, পশ্চিমের যে সমস্ত পণ্ডিত বেদের আলোচনা-গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা শব্দাম্বুধি যতই অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করিতে পারুন না কেন, নিউটনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রকৃতি-রহস্য-পারাবারের কূলে দুই চারিখানা শামুক-ঝিনুকও কস্মিন্‌কালে কুড়াইতে যান না। মাথায় আবার হয় ত কতকগুলি Meta-physical dogmas বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। এই সব Divinityর ডাক্তার ও Literatureএর ডাক্তারেরা বেদ লইয়া খাটিয়াছেন বিস্তর; ফলে বেদের পুঁথি কয়খানা সুগ্রাহ্য হইয়াছে; কিন্তু বেদের দুর্ব্বোধ্যতা ব্যাধির তাঁহারা যে চিকিৎসা করিয়াছেন, তাহাতে গোবদ্যির চিকিৎসার কথাই মনে পড়ে। একে আনাড়ীর চিকিৎসা, তার উপরে আবার চিকিৎসা-বিভ্রাট। সুতরাং পুরাতনী বেদবিদ্যার নাকালের আর সীমা-পরিসীমা নাই। বড় বড় বৈজ্ঞানিকের মনীষা ও পরীক্ষা প্রবৃত্তি, এবং বড় বড় দার্শনিকের বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ-সামর্থ্য লইয়া তবে বেদের গায়ে হাত দিতে হয়। তোমার শব্দশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের চোখা চোখা বাণগুলা বেদের মর্ম্মস্থলে না বিঁধিয়া ঠিক্‌রাইয়া আসিবে, যেমন কিরাতরূপী মহাদেবের অঙ্গে ঠেকিয়া অর্জ্জুনের বাণগুলা ঠিক্‌রাইয়া আসিয়াছিল। যাস্ক ও সায়ণের শব্দশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য কম ছিল না; অনেক পূর্ব্বতন বেদ-ব্যাখ্যাতাদের উপদেশও তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছিলেন; তাঁহারা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা একরূপ অসাধ্য সাধন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু মানের গোলমাল অনেক যায়গাতেই মিটে নাই; যেখানে বা কোন রকমে মিটিয়াছেও, সেখানেও মানে শুনিয়া

মনে ঠিক তৃপ্তি হয় না—মনে হয়, কি যেন কি একটা ভিতরের রহস্য তাঁহারা ভাঙ্গিলেন না ; আমরা মন্দাধিকারী বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা মুড়িমুড়কি দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন ; অন্দরমহলের অমৃত ভোজে তাঁহারা আমাদিগকে পাতা পাতিতে দিলেন না। নব্যবিজ্ঞান অগ্রদূত হইয়া আমাদিগকে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িবার একটা ফন্দি করিয়া দিতেছেন ; এইজন্যই নব্যবিজ্ঞানের একটু আধটু খাতির করিতে বলিতেছি। আমার মনে হয়, সায়ণ প্রভৃতি সাধ করিয়াই ভিতরের রহস্য সব যায়গাতে ভাঙ্গেন নাই। বৈজ্ঞানিক রহস্যের কথা বলিতেছি না, আধ্যাত্মিক রহস্যের কথা বলিতেছি। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি ব্রাহ্মণেই দেখিতে পাই যে, শিষ্টেরা যজ্ঞ, সাম, উদ্‌গীথ প্রভৃতিকে লইয়া কত রকমে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ভাঙ্গিয়া তলাইয়া দেখিতেন। উপনিষদ্‌গুলি পড়িয়া দেখুন, বৈদিক কর্ম্ম-কলাপ ও অনুষ্ঠান রাশির মর্ম্ম টানিয়া বাহির করিতে তাঁহারা কতই না তৎপর! এক উদ্‌গীথ বা প্রণব, তাহাকে কত ভাবেই না ভাবিতে হইবে! পুরাণ প্রভৃতি পড়িয়াও মনে হয়, যে, মুনিরা ও ভাবুকেরা বেদের মোটা মোটা কথার ভিতর হইতে চরম অভিপ্রায়টি টানিয়া বাহির করিতে যত্নশীল ছিলেন। এই সব কারণে মনে হয়, গোড়া হইতেই বেদব্যাখ্যার সদর অন্দর দুইই ছিল। অথবা বেদবিদ্যা যেন সাতমহল একটা পুরী—দেউড়ির পর দেউড়ি পার হইয়া তবে ঠিক মাঝখানে গিয়া হাজির হওয়া যায়। যিনি বলেন, এ সব সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ব্যাখ্যান আগন্তুক, অর্থাৎ ঋষিদের অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না, ক্রমশঃ পরবর্ত্তীকালে বেদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তিনি সেই অতি-চালাক গুলিখোরের মত বেদের আড্ডায় হামেশা যাতায়াত করিলেও বেদের আগা মাথার কোনই খবর রাখেন না। গুলিখোর সওয়াল-জবাবে বলিল -- হাঁ, সে আড্ডায় আসত, বসত, গুলিটা আসটা খেত ; কিন্তু তার মাথা ছিল কি না দেখি নাই। সেই রকম বেদমন্ত্রে নানাস্থানে অগ্নিকে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাধার, সর্ব্বপ্রকার বস্তুরূপে শুনিতেছি, অথচ সেই সব কথার সঙ্গতি ও নিগূঢ় তাৎপর্য্য উড়াইয়া দিয়া বলিব—ও অগ্নি আগুণ ছাড়া আর কি, যাহাতে মন্তর আওড়াইয়া অকারণ ঘি ঢালা হইত! সোমরসের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন শুনিয়া মনে হয়, ইনি নিশ্চয়ই কেও-কেটা নহেন, জগতের মর্ম্মস্থানের কোনও চির-অধিবাসী, কিন্তু তবুও বুলি কপ্‌চাইতেছি, সোম লতার রস বই আর কিছুই নহে। দৃষ্টান্ত আর দিব কত—তোমার সরল ও মোটা ব্যাখ্যার মোহমুদ্গর স্বয়ং বেদই যে স্বহস্তে নানা যায়গাতে ব্যবহার করিয়াছেন! আমি বৈদ্যুতিক ব্যাখ্যা ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়া বেদার্থবস্তুকে বিপথে লইব কি, বেদার্থ-প্রকাশিকার চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিব কি, স্বয়ং বেদ যে নানা ছন্দে নানা ভঙ্গীতে বিদ্যুতের ছটা খেলাইতেছেন এবং অদিতি ও আত্মার রহস্য জল-অগ্নি প্রভৃতির ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া আমাদের বুদ্ধির দ্বারে তুলিয়া ধরিতেছেন। ইহাকে অস্বীকার করার কোনই উপায় দেখিতেছি না। যাহা হউক, আমার মুখের কথায় চিঁড়া ভিজিবে না, আমাকে ক্রমশঃ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আমার কেস্‌টাকে খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেবগণের মাতা অদিতি ঠাকুরুণের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিয়াছি। পরিচয় স্থাপন করিতে যাইয়া বেদের হেঁয়ালি নামক জিনিষটাকে আমরা জানিতে পারিলাম। বেদের শুধু দুটা চারিটা ঋক্ নহে, অনেক আদত সূক্তই ঐ রকম হেঁয়ালির ভাষায় লেখা দেখিতে পাই। বাইবেল, জেন্দ-অবস্তা প্রভৃতি অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই হেঁয়ালির নিয়মটা অনুসরণ করা হইয়াছে। বাইবেলে এই গুলিকে প্যারাবল্ বলে। প্রাচীনেরা এই সব সর্টহ্যাণ্ডে লিখিতেন এবং সম্প্রদায়ক্রমে তাঁহাদের দপ্তর চালাইয়া দিতেন। এই সব হেঁয়ালি শুনিলে সতর্ক ও সাবধান হইতে হয়, অসহিষ্ণু ও উপহাস-রসিক হইলে চলিবে না। অদিতি ও দক্ষকে লইয়া যে হেঁয়ালি, তাহার সমাধান করিতে যাইয়া আজ বিজ্ঞানের বড় একটা সহায়তা পাই নাই। ইহা একেবারে গোড়ার রহস্য কি না। আবার অনেক হেঁয়ালির সমাধানে বিজ্ঞানই আমাদের কাজে লাগিবে। আপাততঃ গোড়ায় গিয়া হাত দিতে পারিলেন না বলিয়া বিজ্ঞানের মনস্তাপের কোনই কারণ নাই। ভালর জন্যই হউক আর মন্দর জন্যই হউক, বিজ্ঞান এখনও পরদা দিয়া ঘেরিয়া জগতের হিসাব লইতেছেন, রিহার্সাল শুনিতেছেন ; এ কথা হেনরি বার্গসোঁ কেন, ম্যাক্ পোঁয়াকারে প্রভৃতি অন্তর্দৃষ্টি-

সম্পন্ন বিজ্ঞানাচার্য্যগণও স্বীকার করিয়া যাইতেছেন। দেশ লইয়া, কাল লইয়া, ঈথার লইয়া এবং শক্তি লইয়া বিজ্ঞান কারবার জুড়িয়া দিলেন এবং ময়দানবের মত একটা মায়াপুরী গড়িয়া তুলিলেন, কিন্তু একটিবার জিজ্ঞাসা করিলেন না যে, দেশ, কাল, ঈথার—এ সব সত্যসত্যই কি? বেদ বিশ্বকর্ম্মার ভুবন নির্ম্মাণ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—কিসের উপর দাঁড়াইয়া বিশ্বকর্ম্মা এই ভুবন ধারণ করিয়াছেন? তেমনি বিজ্ঞানেরও জিজ্ঞাসা করা উচিত হইতেছে—কিসের উপর দাঁড়াইয়া দেশ, কাল ও গতি তাঁহার মায়াপুরী গড়িয়া দিল? সকলের গোড়াটি কি? ইহাই অদিতি সম্পর্কীয় প্রশ্ন, এবং বিজ্ঞান এখনও এ প্রশ্ন তুলিতে সাহস না পাইলেও, বেদ ইহা তুলিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে ভাবিয়াছেন। বিজ্ঞানেরও বোধ হয় অচিরাৎ সে ভাবনা ভাবিতে হইবে। ইউক্লিডের জ্যামিতিখানাকে পত্তন করিয়া বিজ্ঞান সব গড়িয়া আসিতেছিল, কিন্তু সে বনিয়াদ বড়ই ঝুঁকিতেছে। বাহিরের দেশ, কাল, ঈথার বুঝি সব সুড়্ সুড়্ করিয়া ভিতরে আসিয়াই স্থির হয়! অর্থাৎ যেগুলাকে এত দিন বস্তু ভাবিয়া বিজ্ঞান নিশ্চিন্ত ছিল, সেগুলা সব Concept (ধারণা) মাত্র হইবার দাখিল হইয়াছে। তাহা হইলেই চিদ্রূপিনী মাকে আর ভুলিয়া থাকা চলিবে না। যে অনুভব বা Experienceই গোড়ায়, তাহার তত্ত্ব-তাল্লাস বিজ্ঞানকে লইতে হইবে। মায়ের কোলে উঠিতে পারিলেই বিজ্ঞানের বেদত্ব, আর বেদ ও রহস্যের গুহা অথবা শিব জটাকলাপ হইতে নামিয়া আসিয়া জাহ্নবী-ধারার মত আমাদের সাধারণ প্রত্যক্ষ-অনুমান, জ্ঞান-বিশ্বাস-গুলিকে নির্ম্মল করিতে পারিলেই, তাঁহারও বিজ্ঞানত্ব। আমরা এখন তাঁহার হেঁয়ালির মর্ম্ম বুঝিতেছি না, বুঝিলে বেদই বিজ্ঞান হইবেন। যাক্—তার ত এখনও দেরি দেখিতেছি।

এবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না বলিয়া তাহাই পাড়িয়া আপনাদিগকে গলদ্‌ঘর্ম্ম করিয়া তুলিয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধগুলার উদ্দেশ্য কিন্তু অন্যরূপ। আধিভৌতিক দৃষ্টিতেই আমরা প্রধানতঃ পথ দেখিয়া চলিব। তবে কোন্ মহাতীর্থ এ পথের অবসানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির-চূড়ার মত আমাদের সংশয়ক্লিষ্ট ধূলি-ধূসরিত মুখের পানে আশ্বাস ও অভয়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহাই একটিবার দেখিয়া লইবার জন্য পথের মাঝখানেই মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম। নহিলে যে "পথের ধূলায় অন্ধ" হইয়া আমাদিগকে অপরা-বিদ্যার খানাতেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। অদিতির মহামন্দির আমাদের পথ দেখাইলেন। দেখিলাম, ব্রহ্মে বা আত্মাতে গিয়াই নিখিল শ্রুতিরহস্যের পর্য্যবসান। আগামী বারে অগ্নি-পরীক্ষা। অদিতির ডাক শুনিয়াছি, সুতরাং বিজ্ঞানের দিক্ হইতে অগ্নিপরীক্ষা করিতে যাইয়া বোধ হয় লঙ্কাকাণ্ড করিয়া ফেলার আর ভয় রহিল না।

নবান্ন

শ্রীরামেন্দু দত্ত

হেম শস্যের আটি-বাঁধা শীষে হেমন্ত, হেম-অর্ঘ্য বয়,
পদ্মালয়ার সলিল সদ্ম চলিছে রচিয়া পদ্মচয়!
চন্দনা আজি নান্দী পঠিয়া বন্দিল কা'র চরণ তল!
ফুল-সুগন্ধে নন্দিতে অই নয়ন মেলিল চম্পাদল!
ধন-ধান্যের আশীষে ধন্য, সন্তান আজি হাস্য-মুখ,
গৃহে গৃহে তাই লাগে উৎসব জাগে প্রাণে প্রাণে প্রসাদ সুখ!
মর্ত্ত্যে আজিকে মূর্ত্তি ধরিয়া ত্রিলোক-পালিনী বর্ত্তমান,
চারি করে অই—ধৃত পঙ্কজ, শোভে অঙ্কুশ, অভয়, দান!
কুটীরে কুটীরে লুটায়ে আজিকে কমলার পদ-আলিম্পন,
কেমনে যে পায় মণি-কাঞ্চন জননী কৃপায় অকিঞ্চন!
সুনীল আকাশে আলোক-মালায় ঐ খেলে যায় মধুর হাসি,
জ্যোৎস্না সুধার উৎস খুলিয়া উৎসবে ঝরে অমিয়া রাশি!
নিঃস্ব যে আজি, দু'মুঠা শস্য উঠিছে কেমনে তাহার-ও ঘরে!
অতরু মরুর ঊষর বক্ষে লক্ষ্মীমায়ের চরণ পড়ে!
কোথা নিরন্ন, আছ বিষণ্ণ, এস এস আজ আঙিনা তলে,
অন্নদা মা'র অন্নের কুটে অবিরত পরিবেষণ চলে!
জলে গৃহে গৃহে দীপমালা আজি মঙ্গল-শাঁখ বাজিয়া উঠে!
তরুলতা যত ভোগ-লোভাতুর মেলিছে আপন পর্ণ-পুটে!
মাথায় লেগেছে ধান্যের কুটি সারা গায়ে মাখা মাঠের ধূলি,
বসেছে বাঁশের বাঁশীটি লইয়া, কৃষক, ধরার ভাবনা ভুলি'।
আজি নবান্নে নূতন ধান্যে পরমান্নের পূর্ণ থালা
বিতরিয়া দেন অন্নপূর্ণা সাজি' বদান্য পল্লী-বালা॥

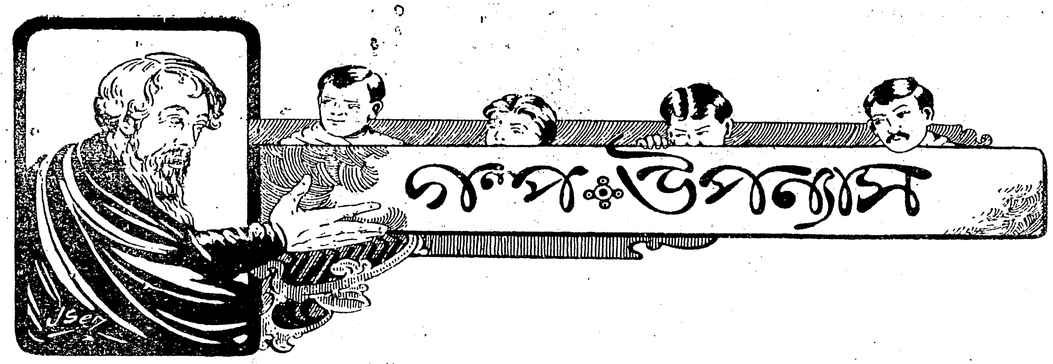

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৫)

সত্যই সকালের ট্রেণে মনীশ ও মৃন্ময় ও ঊষা আসিয়া পৌছিল। ঊষা পিতাকে জীবিত ভাবিয়াই আসিয়াছিল,—পিতা নাই শুনিয়া সে হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিবাহের পর চার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে সে পিতাকে আর দেখিতে পায় নাই।

মনীশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; মৃন্ময় বাহিরের বারাণ্ডায় একখানা চেয়ারে নীরবে বসিয়া রহিল। উমা খানিক আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর ঊষার হাত ধরিয়া উঠাইয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "কাঁদিস নে ঊষা, বাবা গিয়েছেন ভালই হয়েছে। আমি একটুও কাঁদি নি দেখছিস।"

ঊষা কাঁদিয়া বলিল, "তুমি কাঁদবে কি দিদি, তুমি তো বাবার কাছেই ছিলে, বাবার সব কাজই তুমি করতে পেয়েছ, আমি যে কিছুই করতে পারলুম না, একবার যে শেষ দেখাটাও দেখতে পেলুম না।"

উমা তাহাকে টানিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাহার এক বৎসরের ছেলেটীকে কোলে লইয়া মনীশের কাছে আসিল, "ঘরে চল মনীশ-দা, উঠোনেই দাঁড়িয়ে রইলে যে।" তাহার পর একটু হাসিয়া বলিল, "তোমরা দৃঢ়চিত্ত পুরুষ বলে অহঙ্কার কর, কিন্তু আমি দেখছি এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে গর্ব্ব করা। তোমরা যদি সত্যিই তাই হও—তবে দৃঢ়তা আনো তেমনি, সব উড়িয়ে দাও। তোমরা এমন করলে আমরা যাই কোথা?"

মনীশ বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে চাহিল, কোনও কথা কহিতে পারিল না।

উমা বলিল "মৃন্ময় কোথা মনীশ-দা?"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনীশ বলিল "বোধ হয় বাইরে।"

উমা বলিল, "তাকে দেখা শোনা করা তোমার কাজ মনীশদা,—আমি কিছু ঠিক করতে পারছি নে, কি করতে হবে এখন আমায়। আমার মাথারই মোটে ঠিক নেই। এর ওপরে ঠাকুরমার জন্যে ভারি ভাবনা হয়েছে। কাল হতে তিনি কেবলই অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন। তাঁকে এত বুঝাবার চেষ্টা করছি, কিছুতেই বুঝাতে পারছি নে। আমি আবার তাঁর কাছে চললুম মনীশদা, তুমি এ দিককার সব দেখ।"

উমাকে মনীশ যতই দেখিতেছিল, ততই যেন আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছিল। পিতার শ্রাদ্ধের দিন যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার পূর্ব্ব দৃঢ়তা ফিরিয়া আসিতে লাগিল, সে দিনরাত খাটিতে লাগিল।

মৃন্ময় মনীশকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল, "উইলের কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলে মনীশ?"

মনীশ বিরক্ত ভাবে মাথা নাড়িল "না।"

মুহূর্ত্তে কঠিন হইয়া গিয়া মৃন্ময় বলিল, "কিন্তু মনে করে দেখ মনীশ, আমি আসতে চাই নি, তুমিই আমায় নিয়ে এলে।"

মনীশ বলিল "বেশ মনে আছে মৃন্ময়, সে কথা আমি ভুলি নি। আমি ভেবেছিলুম, কাকা বেঁচে আছেন,—শেষ সময়টায় তাঁর মেয়ে জামাই সকলকে দেখানোর উদ্দেশ্যেই আমি তোমায় জোর করে নিয়ে এসেছি। উইলের কথা আমি বলব উমাকে, কিন্তু মাপ কর ভাই, শ্রাদ্ধটা আগে শেষ হতে দাও, তার পরে।"

মৃন্ময় বলিল, "শ্রাদ্ধ শেষ হলে তার পরে তুমি কথা তুলবে? আশ্চর্য্য কথা। যদি কথা তুলতে হয় তবে এখনই তোলা উচিত। বিধবা মেয়ে সম্পত্তির অধিকারিণী হতে পারে না; মাসে মাসে কিছু সাহায্য পেতে পারে, এইমাত্র তার দাবী। দৌহিত্র যখন রয়েছে, তখন আইনতঃ সেই বিষয়ের যথার্থ উত্তরাধিকারী, তা তো জানো?"

মনীশের মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। সে একটু থামিয়া বলিল, "তা আমি জানি, কিন্তু মৃত উইল করে গ্যাছেন—"

বাধা দিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মৃন্ময় বলিল, "সে উইল ন্যায়সঙ্গত নয়। তুমি আমায় কি বুঝাতে চাও মনীশ,—আমি ও-সব জানি। আমি বেশী দিন থাকতে পারছি নে, আজই কাজটা মিটে যায় যদি, আমি আজই চলে যাব। আমার হাতে অনেকগুলো রোগী আছে তা জানো।"

মনীশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমায় তুমি শাসাচ্ছ কি মৃন্ময়? আমি তার বাপের বন্ধুর ছেলে, এই মাত্র সম্পর্ক। এ নিয়ে তুমি আমায় কোনও কথা বলতে পার না। তোমার আত্মীয়া,—বরং তোমার জোর আছে,—আমার কথা বলবার অধিকার নেই। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি নিজেই বলতে পার। আমায় বলতে বলছ, আমি একবার কথাটা তাকে শুনিয়ে দেব এই মাত্র,—এর বেশী আর কিছু সাহায্য তুমি আমার কাছ হতে পাবার আশা কোরো না।"

সে সরিয়া গেল। মৃন্ময় আপনার মনে শুধু গর্জ্জন করিতে লাগিল। মনীশকে আর কোনও কথা বলার সাহস তাহার হইল না।

খোকাকে কোলে লইয়া উমা তখন আদর করিতেছিল, ঊষা নিকটে বসিয়া ছিল। স্বামীর নিকট হইতে বারম্বার সে খোঁচা খাইতেছিল, যেন উইলের কথাটা উমার কাছে তোলা হয়। ঊষার মনেও একটা বিরুদ্ধ মত জাগিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সাহস করিয়া সে কথা পাড়িতে পারে নাই।

আজ কথাটা বলিবার জন্য তাহার অন্তরটা ছটফট করিতেছিল; তাই সে একেবারেই বলিয়া বসিল, "কিন্তু ভাই দিদি, সব্বাই বলছে কাজটা মোটেই ভাল হচ্ছে না।"

উমা কথাটা বুঝিতে পারিল না, বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া বলিল, "কি কথা ঊষা?"

ঊষা নতমুখে বলিল, "এই বিষয়-সম্পত্তি—"

"ওঃ, কথাটা যখন তুললে ঊষা, ভালই হল। বলি সব শোন তবে।" উমা খোকাকে ঊষার কোলে দিয়া বসিয়া পড়িল, "বিষয় সম্পত্তি বাবা সব আমার নামে উইল করে দিয়ে গ্যাছেন, তাতে অনেক সাক্ষী আছে, তিনি—"

বাধা দিয়া সকল সঙ্কোচ দূর করিয়া ঊষা বলিল, "কিন্তু সব্বাই বলছে, এ কখনই আইনসঙ্গত নয়। বিধবা মেয়ে না কি সম্পত্তি পেতে পারে না, বিশেষ উত্তরাধিকারী দৌহিত্র যখন রয়েছে।"

উমা স্থির দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিল। ঊষা সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

উমা বলিল, "সব্বাইয়ের দোহাই দিয়ে তুই কি নিজের কথাটাও বলছিস নে ঊষা? তোর মনেও জাগছে—আমি তোর ছেলের ন্যায্য বিষয় বড্ড ফাঁকি দিয়ে নিয়েছি। অবশ্য এর মধ্যে প্রবঞ্চনা আছে বই কি—যেহেতু বাবা কোর্টে আমায় বিবাহিতা বলেছেন, বিধবা বলেন নি। যারা স্বাক্ষর করেছে, তারাও জেনে শুনে এই মিথ্যার স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছে। এটুকু মিথ্যার জন্যে বাবাকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ, বাবা শুধু আমার দিকে তাকিয়েই এ কাজ করেন নি। তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন তাঁর প্রজাদের দিকে, তাঁর গৃহ-দেবতার দিকে। আশ্রিতের জন্যে মিথ্যার আশ্রয় নিলে বিশেষ দোষ হয় না ভেবেই,

তিনি এই মিথ্যাটুকুর আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিষয়টা যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে তোমাদেরই, তা আমি অস্বীকার করছি নে। অনেক ভেবে চিন্তেই বাবা আমায় দিয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন, এতে ভাল ফল উৎপন্ন হবে; কারণ, আমার নিজের কিছুই খরচ নেই। আমি বিধবা, আমার একবেলা দুটো হবিষ্যান্ন, পরণে দুখানা কাপড়, এই হলেই মিটে গেল। তিনি আমায় তাঁর অর্থ ভোগের জন্যে ব্যয় কর্ত্তে বা সঞ্চয় করে রাখতে বলে যান নি, বলেছেন এর যথার্থ সদ্ব্যবহার করতে।"

ঊষা একটু উষ্ণ হইয়া বলিল, "এইটে যে তোমার বড় অন্যায় কথা হয়ে গেল দিদি; আমরা যদি পেতুম সব, —তুমি কি বলতে চাও, সবগুলো আমাদের ভোগ বিলাসেই ব্যয় হত, অথবা আমরা সঞ্চয় করেই রাখতুম?"

আহতা উমা ঊষার মুখপানে চাহিল। হায়, সে ঊষা কোথায় গেল, যাহাকে সে এই কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে, নিজে না খাইয়া যাহাকে খাওয়াইয়াছে। চার বৎসর আগে যে ঊষা এ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছিল, এ তো সে ঊষা নয়। হায় সংসার, হায় মানুষ, এত শীঘ্রই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায় তোমার?

উমার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ত্বরিতে সে চোখের জল শুখাইয়া লইল। তাহার পর ফিরিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "না হয় করতিস না। কিন্তু ঠাকুরসেবা তো হত না ঊষা। মৃন্ময় ঘোর নাস্তিক, সে ঠাকুর সেবার অর্থ কিছুই বোঝে না। আমাদের পিতৃ পিতামহের আমলের ঠাকুর কি শেষে পথের ধারে গড়াগড়ি যাবে ঊষা?"

তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়া উমা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

গোপনে পিতার কক্ষে গিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া সে আজ এই প্রথম হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া ডাকিল—"বাবা—বাবা গো।"

সংসার কি যথার্থই এমনি? এখানে যথার্থই কেহ কাহারও নয়। বাবা—স্নেহময় বাবা আমার, আমার মাথায় এ কি দারিদ্র দিয়া গেলে গো,—আমি যে আর পারি না, আমার বুক যে ফাটিয়া যায়। এ কি পৈশাচিক ভাব এ জগতে? বাবা, তোমার উমাকে তোমার কাছে ডাকিয়া লও, সংসারের নিষ্ঠুরতা সে আর সহিতে পারিতেছে না।

মনীশ কি কাজে বারাণ্ডা দিয়া যাইতেছিল। গৃহমধ্যে অস্ফুট রোদনের স্বর শুনিতে পাইয়া সে দরজা খুলিল। উমাকে গৃহতলে লুণ্ঠিতা দেখিয়া সে প্রথমটা কিছুই বলিতে পারিল না। সে যে সংসারের নিদারুণ নিষ্ঠুরতা দেখিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সান্ত্বনার আশায় কাঁদিবার জন্য পিতার এই শয়নকক্ষে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না; সে ভাবিল, পিতার জন্য কাঁদিতেই সে আসিয়াছে।

তাহার আর্ত্ত কণ্ঠ মনীশের বুকের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিতে লাগিল। তাহার দুইটী চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে ডাকিল "উমা—"

"মনীশ দা,"

উমা মুখ তুলিয়া চাহিল—দুই হাতের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া সে আরও কাঁদিতে লাগিল।

"কেঁদে কি করবে উমা,—যিনি গেছেন, তিনি তো আর ফিরবেন না। মৃতের জন্যে কান্না ভাল নয় তো, তা তুমি জানো উমা। এ ত তাঁর পরলোকগত আত্মাকে আবার মায়া-মোহপূর্ণ জগতে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস মাত্র। না উমা, তাঁকে শান্তি পেতে দাও, কেঁদ না।"

রুদ্ধ কণ্ঠে উমা বলিল, "আমি তো তার জন্যে কাঁদছিনে মনীশ দা। বাবা গ্যাছেন,—আমি এতদিন কাঁদিনি তো এমন করে। আমি তা জানি। আমি বাবাকে আর আকর্ষণ করব না। মনীশ দা, আমার বুকখানা আজ যে ভেঙ্গে গ্যাছে। আমি যে সংসারের কথা ভেবে, এর লোকদের নিষ্ঠুরতা দেখে কোন ক্রমে চো'খের জল রাখতে পারছিনে মনীশ দা।"

উমা আবার হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"আমার বুক একেবারে ভেঙ্গে গেল মনীশ দা,—আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়লুম যে আজ। আমার কি হল, মনীশ দা, আমার যে আর বাঁচতে ইচ্ছা করছে না। আজ ঊষা, আমার সেই ঊষা—দেখেছ তো তুমিও, সে আমার কি জিনিস,—সেও কি না আজ টাকার দাবী করছে,—সেও স্পষ্ট আজ আমায় জানিয়ে দিলে—অর্থের কাছে আর কেউ নয়। মনীশ দা, আমার বুক ভেঙ্গে গ্যাছে, আমি চুরমার হয়ে গেছি যে।"

মনীশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, "না, ভেঙ্গে গেলে তো চলবে না উমা। তুমি সংসারের মানুষ নও বলেই সংসার কি, তা জানতে পার নি। এখানে সব আছে উমা, এখানেই সব তুমি দেখতে পাবে। বনে হিংস্র জন্তু বাস করে; কিন্তু সংসারে তার চেয়ে বেশী হিংস্র মানুষ বাস করে। এখানে তুমি যাকে যত স্নেহ করবে, জেনো, সেই তোমায় দেবে শুধু বেদনা। যাকে ভালবাসবে—সে দেবে কঠিন উপেক্ষা—যাতে তোমায় একেবারেই চুরমার করে দিতে চাইবে। কিন্তু তাই বলে কি ভেঙ্গে চুরমারই হতে হবে? দেখতে হবে, আরও কতদূর যায়। একটু আঘাতেই যদি ভেঙ্গে পড়লে উমা, তবে তুমি শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হয়েছ কেন, এত জ্ঞানই বা পেয়েছ কেন?"

উমা উঠিয়া বসিল। বিশৃঙ্খল এলায়িত চুল গুলা চারিদিক হইতে গুটাইয়া বাঁধিল। নিতান্ত অসহায়ভাবে সে বলিল, "আমি কি করব মনীশ দা! তুমি আমার গুরুস্থানীয়, তোমার কাছ হতে আমি অনেক উপদেশ পেয়েছি। আজও উপদেশ দাও মনীশ দা, আমি তোমার পায়ের কাছে বসি, সেই ছোট বেলার মতই তোমার ওপরে আবার নির্ভর করি। বল—আমি এখন কি করব?"

মনীশ বলিল, "কি করবে? ওরা যাই বলুক, তুমি কাণ দিয়ো না। তোমার স্বর্গীয় পিতার কথা মনে কর, বুকে বল নিয়ে এস। তিনি সব ভেবে যা ঠিক করে দিয়ে গ্যাছেন, তা কখনই মিথ্যা হতে পারে না। নিজের দৃঢ়তার ওপরে নিজে নির্ভর করে দাঁড়াও। শুধু ঊষাই এ কথা বলে নি উমা, মৃন্ময়ও আমায় বলেছে তোমায় এ কথা বলবার জন্যে। আমি তাকে জবাব দিয়ে এসেছি, আমি পারব না। সম্ভব সেও তোমায় এ কথা বলবে। আমি আজ মহলে যাচ্ছি সকলকে খবর দেবার জন্যে, যে, কাকা মারা গ্যাছেন। কাল বোধ হয় ফিরব। এর মধ্যে যদি মৃন্ময় তোমায় কোনও কথা বলে, তা শুনো না। এখন তোমার ওপরেই সব নির্ভর করছে, এটা জেনে রেখো। উইল কখনই বার করে ওদের দেখিয়ো না। সকলে শ্রাদ্ধের দিনে আসবে, তখন আমি উইল বার করে সবাইকে দেখাব।"

উমা নীরবে তাহার পায়ের কাছে মাথা নোয়াইল, নীরবে তাহার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল।

মনীশ তাড়াতাড়ি করিয়া মহলে চলিয়া গেল। আর তিন দিন পরেই শ্রাদ্ধ। ইহার মধ্যে প্রজাদের খবর দেওয়া দেওয়া চাই—তাহাদের দেবতার মত জমীদার আর নাই।

মনীশ চলিয়া গেলে মৃন্ময় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে বাস্তবিকই তাহাকে একটু ভয় করিয়া চলিত। কারণ, সে জানিত, মনীশ যাহাই হউক না, সে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াইবে,—আর ইহাদের সে আপনার বলিয়াই জানে। উমার কাছে কোনও কথা বলিতে তাহার ভয় লাগিত না যদি সে একা থাকিত। মনীশ তাহার স্বপক্ষে দাঁড়াইতে, মৃন্ময় কিছু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

"শুনুন, আমি একটা কথা বলতে চাই—"

উমা তখন সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য পূজার গৃহে যাইতেছিল, মৃন্ময়ের কথা শুনিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। কি সে কথা—তাহা তাহার বেদনাপূর্ণ হৃদয়খানা শীঘ্রই বুঝিয়া লইল। তাহার চোখে-মুখে হৃদয়ের আর্ত্ত ভাবটা বেশ ফুটিয়া উঠিল। অন্তর হইতে কে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ও গো, না, আর আমায় কোনও কথা শুনাইয়ো না, আমি যথেষ্ট শুনিয়াছি। সংসারের এই সব আঘাত আমি যে আর সহ্য করিতে পারি না।"

কিন্তু অন্তরের দেবতা আর্ত্তনাদ করিলে কি হইবে? উমার বহিঃপ্রকৃতি যে মনুষ্য আবরণের মধ্যে, সেই হিসাবে তাহাকে এ কথা শুনিতেই হইবে যে। তাই সে যথাসাধ্য শান্তভাবে বলিল "কি কথা।"

মৃন্ময় জোর করিয়া বলিল "এই উইলখানার কথা। আপনি বুদ্ধিমতী,—জানছেন, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা দিয়েই তৈরি হয়েছে, সত্য এর ভিত্তি নয়। কাজেই এ টলমল করছে, দাঁড়াতে পারছে না। আপনি যদি সত্যর ওপরেই নির্ভর করতে না পারলেন, তবে আপনিই যে মিথ্যা হয়ে গেলেন। যথার্থ অধিকারীকে ফাঁকি দেওয়া—এ হৃদয়হীন বর্ব্বরেরই সাজে, আপনাতে সাজে না বলেই আপনাকে বলছি। এখনও সময় আছে, এখনও আপনি যা নিয়েছেন ফিরিয়ে দিতে পারেন।"

"উঃ!" উমার কণ্ঠ চিরিয়া এই একটা কথা মাত্র বাহির হইয়া পড়িল। না, আর তো সহ্য হয় না, এ ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতে উমা যে অক্ষম। পিতা, উমা

তোমার কথা রাখিতে সমর্থ হইল না, ন্যায্য যাহার জিনিস তাহাকেই সে ফিরাইয়া দিবে।

হাতের ফুল বেলপাতা পড়িয়া গেল, উমা দ্রুতপদে নিজের গৃহে চলিয়া গেল। অকম্পিত হস্তে বাক্স খুলিয়া পিতার আয়রণ-চেষ্ট খুলিয়া সেই সযত্ন-রক্ষিত উইলখানা বাহির করিয়া লইল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মৃন্ময় তখনও দাঁড়াইয়া আছে।

গর্ব্বপূর্ণ কণ্ঠে উমা বলিল, "এই নাও, আমার সকল দাবী আমি ছেড়ে দিচ্ছি। বাবা আমায় যা দিয়ে গেছলেন, আমি তা তোমাদেরই দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সত্য মিথ্যার কথা তুমি কি বলছ মৃন্ময়? আমার বাপের সঙ্গে তুমি ব্যবহার করনি, নইলে জানতে পারতে, তিনি নিজেই জীবন্ত সত্য ছিলেন। আমি আজ সেই সত্যের অমর্য্যাদা করলুম, মিথ্যার আশ্রয় নিলুম,—এ আমার কর্ম্মফল ভিন্ন আর কিছুই নয়। তোমাদের বাধা আমি আমারই হাত দিয়ে সরিয়ে দিলুম, এর জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ—তা আমি ঘৃণাজনক বলেই মনে করি।"

উইলখানা শতখণ্ডে পরিণত করিয়া সে তাহা মৃন্ময়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া, ধীরপদে পূজার গৃহে চলিয়া গেল। মৃন্ময় হাঁ করিয়া সেই গঠিত মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

সভ্যতা ও আর্থিক অবস্থা

সফিয়া খাতুন বি-এ

আজকাল যুবকদিগকে হিসাবী (Economic) কথার একটা অদ্ভুত কু-অর্থ করতে দেখি। যদি কাউকে কেউ বলে যে লোকটী বড় হিসাবী, তাহলে যুবকরা তার অর্থ করে নেন যে, লোকটা হিসাবী অর্থাৎ কৃপণ। অনেক সময় আমরা বলে থাকি "লোকটী খরচের বেলায় কিন্তু বড় হিসেব করে খরচ করে।" এ কথার অর্থ এই নয় যে, লোকটী টাকা পয়সা খরচ করতে চায় না। তার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, ঠিক তার উল্টা; তবে বাজে কাজে খরচ করে না। অনেক অর্থ-নৈতিকরা অর্থ-নীতিকে দুটা ভাগ করতে চেয়েছেন। তাঁদের কেহ কেহ বলছেন যে, একটা নিষ্কলঙ্ক অর্থনীতি (Pure-economy) আর একটী কলঙ্কিত অর্থনীতি (Vulgar)।

এই যে লোকটী বাজে কাজে টাকার শ্রাদ্ধ করে না, তাকে তাঁরা বলেন "পিওর ইকনমিক"। আর "সাইলকের" মত যারা শুধু টাকা জমিয়ে রাখে, খরচ করতে জানে না, এবং নিজেও খেতে জানে না, শুধু লোহার সিন্দুক টাকা দিয়া পূরছে—তাকে তাঁরা "ভাল্গার ইকনমিক" বলতে চান।

মানলাম, পণ্ডিতদের কথাই ঠিক। কিন্তু যে লোকটা টাকাকে জলের মত মনে করে ব্যয় করে,—নিজের ভোগ বিলাসের জন্য যেমন খরচ করে, পরের জন্যও তেমনি করে থাকে—তার অর্থনীতিকে আমি কি উপাধি দেব?

সংসারে ত এই তিন রকমেরই লোক সচরাচর দেখতে পাই। একজন খুবই টাকা উপার্জ্জন করছে, কিন্তু সে খরচ করতে জানে না, বা নিজেও খেতে জানে না। আর এক রকম লোক যেমনি উপার্জ্জন করতে জানে, তেমনি ব্যয়ও করে থাকে। কিন্তু তার খরচ করার কোন সংযম নেই। আর এক রকম লোক আছে, সে বেশ খরচ করতে জানে; কিন্তু সেটা খুব স্থির ধীর ও চঞ্চলতাশূন্য।

তাই মনে হয়, দুনিয়ায় "পিওর ইকনমি" বলে কোন একটা জিনিষ নেই। ওটা বুড়দের মনের এক বায়ু। তাঁরা আর্টের বেলায়ও ঠিক তেমনি "পিওর আর্ট" বলে চেঁচিয়ে থাকেন।

সোজা কথায় "ইকনমিক" অর্থ এই—ইকনমিক লোকটী বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে মানুষের হালে, আর দশজন লোক যেমনি চলে থাকে ঠিক তেমনি ভাবে, চলে থাকে। মানুষ সংসারে যে সব সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে আসে, অর্থাৎ বিশ্বপ্রভু আমাদের জন্য যে সব সুখ-সুবিধা উপভোগ করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন, তা যথাযথ ভাবে উপভোগ করে থাকে।

বিষয়টী আর একটু পরিষ্কার করেই বলিলে যেন ভাল হয়। অনেকে হয় ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, মানুষের হালে থাকার কথা যে লেখিকা বলছেন, সেই হালের standardটা কি? আর একজন হয় ত তার উত্তর দিবেন যে, যখনকার যে সভ্যতা দেশে এসে দেখা দেয়, ঠিক তার সঙ্গে মিশ খেয়ে চলার জন্য যা দরকার, সেটাই হচ্ছে তার Standard.

আবার একদল লোক হয় ত বলবেন, "যখন যে সভ্যতা আসবে, তাকেই যে বরণ করে নিতে হবে, তার মানে কি? সভ্যতার একটা মাপ কাটি থাকা দরকার।"

আমিও বলি তাই। হাঁ, সভ্যতার একটা মাপকাটি থাকা চাই বই কি। আমাদের মাপকাটি ঠিক নেই বলেই ত দেশের এত দুর্দ্দশা। মাপকাটি বলতে এই বলছি না যে, মান্ধাতার আমল হতে যে প্রথা চলে আসছে, তাই রক্ষা করতে হবে। আমি মাপকাটির কথা আর্থিক দিক হতে বলছি।

দেশের সভ্যতা যেন দেশের আর্থিক অবস্থা ডিঙ্গিয়ে না যায়। যে দেশের সভ্যতার সঙ্গে তার আর্থিক অবস্থার স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ আছে, সেখানে দুর্ভিক্ষ অনাটন প্রভৃতি খুব কমই দেখা যায়।

ঠাকুমাদের মুখে শুনেছি, তাদের বুড়রা না কি আট টাকা মাসিক বেতনে রাজ-সরকারে কাজ করেছেন। তাতে তাদের বেশ চলে যেত। তার মানে এই যে, তখনকার দিনে এই আটটা টাকা ছিল আটশত টাকার সমান। তখনকার দিনে ঐ আট টাকাই আটশত টাকার কাজ দিত। অনেকে হয় ত বলবেন তা হয় কি করে? এর উত্তরে আমি বলব, ঐ যে গোড়ায় ছিল সভ্যতা। তখনকার আট টাকা মূল্যের সভ্যতা আজ আমরা ৮ শত টাকা দিয়ে কিনছি, আর এক দিন হয় ত তাই-ই ৮ হাজার দিয়ে কিনব!

তার মানে সভ্যতা জিনিষটা জলের মত—যখন যে ভাবে রাখ সে ভাবেই থাকবে। ঘটিতে রাখ ঠিক ঘটিই হয়ে যাবে, আর একটা চৌবাচ্চায় রাখ, দেখবে, ঠিক চৌবাচ্চাই হয়ে গেছে। কিন্তু তার দ্রব্যগুণের কোন পরিবর্ত্তন হবে না।

সে রকম সভ্যতাকে তুমি মণি মাণিক্য হজরতাদি দ্বারা সাজিয়ে রাখ, বা শুধু শাঁকা সিন্দুরই দেও, তাতে তার সত্যটুকুর কোন পরিবর্ত্তন হবেনা—মেয়ে যা তাই থেকে যাবে। সে নিত্য নূতন ও নিত্য পুরাতন। তার (সভ্যতার) বাহ্যিক রূপটাই হচ্ছে দেশের আর্থিক অবস্থা এবং তার মাল মসলা হলেন দেশের Industry ও Science.

সোণারূপা মণি মাণিক্য না হলে যেমন নারীর রূপের ঝঙ্কার দেখাবার সুযোগ হয় না, সেরূপ দেশের সভ্যতাকে সাজিয়ে তুলতে হলে শ্রমশিল্প ও বিজ্ঞান না হলে চলে না।

তাই বলি ইণ্ডাষ্ট্রী ও সায়েন্সের যত প্রসার হবে, সভ্যতার মাপকাটিও তেমনি প্রসার করতে পারবে, তা নৈলে নয়। শুধু সভ্যতা নিয়ে ইংলণ্ড, আমেরিকা কি জাপান হওয়া যায় না। তা হতে পারবে সেদিন, যেদিন হতে ঘরে ঘরে জাপানী বা আমেরিকান ইণ্ডাষ্ট্রী দেখতে পাবে। এক ইণ্ডাষ্ট্রী দ্বারা দেশের অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। প্রথমতঃ বেকার সমস্যা। যে লোকগুলি বেকার বসে আছে, তাদের সমস্তই খরচের ঘরে ধরা হয়। ধরুন এই পৃথিবীটী একটী মহাজনের খাতা। তার মূল তহবিল হল সমস্ত মানব জাতিটা। ভগবান ঠাকুর এই মূল ধন নিয়ে ব্যবসা করতে বসেছেন। ইণ্ডাষ্ট্রী ও সায়েন্স হচ্ছে মাল পত্র (Goods)।

ভাবুন এখন, এই মানব জাতির শতকরা ৫০টী লোক যদি অচল টাকা হয়ে যায়, তাহলে ব্যবসাটা চলবে কি রকম করে শুনি?

জগৎটাকে আমরা এ রকমের একটা মহাজনের তহবিল বলে ভাবতে পারি না বলেই আমাদের জাতির ভেতর কোন একটা কর্ম্মের সাড়া নেই। কারণ, আমরা যে অদৃষ্টবাদী। "কপালে যা আছে তাই হবে", ভেবে সে আরাম কেদারায় শুয়ে থাকি। তাই হাজার হাজার লোক বেকার দেখেও আমাদের মনে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। মহাজনের ব্যবসাটা যে গোল্লায় যাবে, সে চিন্তা আমরা মোটেই করি না। আমরা ভাবি, ভগবান যখন জন্ম দিয়েছেন, তখন কি আর মেরে ফেলবেন। আরে বাপু সবটাই যে নিজেকে করে নিতে হয়। ভগবান আর তোমার মুখে তুলে দিবেন না। তিনি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, তোমাকেই সব করে নিতে হবে।

দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য। আমাদের দেশে আমদানি আছে, রপ্তানি আছে কি? আর যাও আছে, তা বিদেশীদের হাতে। আমাদের দেশ হতে চা, কাপি, তুলা, মসলা, পাট ও চামড়া—এই ত কয়টি জিনিষ রপ্তানি হয়ে থাকে। কিন্তু এর প্রত্যেকটিই সাহেবদের হাতে। তাই এসব নিয়ে তারা সুন্দর পুতুল খেলে থাকে। কাজেই সেটাও খরচের ঘরে। আমাদের দেশ হতে যে তুলা চার আনা সের দরে কিনে নিয়ে থাকে, আবার সেই তুলাই আমাদের কাছে ৬৷৷০ টাকা সের দরে বিক্রি করে থাকে। তারা যে শুধু ৬৷০ সোয়া ছয় টাকা লাভ নিয়েই ছেড়ে দেয়, তা নয়। মালের সঙ্গে তার দেশের বহু সহস্র শ্রমজীবীর অন্ন জলের সংস্থানও করে' তোমার জিনিষ তোমাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছে। সুচতুর জাপান এক পয়সার জিনিষ এক টাকা দরে বিক্রী করে আজ জগতের সঙ্গে পাল্লা দিতে লেগে গিয়েছে। এই যে এক পয়সার জিনিষ এক টাকায় বিক্রী করবার ক্ষমতা,' এটাই হচ্ছে শিল্প-চাতুর্য্যের চরম উন্নতি। পাঁচ টাকার কাজ যদি পাঁচ পয়সা দিয়ে করা যায়, তাহলে আমি পাঁচ টাকা খরচ করতে যাব কেন? আমাদের দেশে কত শত রকমের হস্ত-শিল্প, গৃহ-শিল্প ছিল, তা সবই আমাদের অবহেলার জন্য লোপ পেয়েছে। আজ আমরা জাপানী স্ক্রীন দরজায় টাঙ্গিয়ে জাপানী পাখায় হাওয়া খেয়ে বিবিয়ানা জাহির করি। এতে আমাদের একটুও লজ্জা হয় না। আমাদের অধঃপতনের এই-ই প্রধান কারণ। আমরা আমাদের দেশীয় শিল্পের উন্নতি করা ত দূরের কথা, তাকে যে বাঁচিয়ে রাখব, বা যে চেষ্টা করছে তাকে উৎসাহ দেব, তাও করি না। কিন্তু দেখ গিয়ে স্বাধীন দেশে—সেখানকার লোকেরা নিজের দেশী জিনিষ থাকতে প্রাণান্তেও বিদেশী জিনিষ কিনবে না। আর এই কলকাতাই দেখুন না কেন—সাহেবরা কোন দিনই বিলাতী জিনিষ ছাড়া অন্য কোন জিনিষ ক্রয় করে না। আমি আঙ্গোরায় দেখেছি, সেখানকার প্রবাসী ইংরেজরা, একটী তুর্কী দোকানে যে জিনিষটি আছে, সেই জিনিষই হয় ত দু' মাইল দূরের পথ হেঁটে, যেখানে লণ্ডনের তৈরী জিনিষ পাবে, সেখান হতে সেটা কিনে থাকে। তুর্কীরাও ঠিক তেমনি কাজ করে থাকে। বাজারে একটা নূতন জিনিষ বেরুলে, তা হাজার বেশী দর হলেও যদি জানে যে সেটা নিজ দেশের তৈরী—তাহলে বেশী মূল্য দিয়েও তা কিনে। আর ঠিক সেই জিনিষটিই যদি অতি অল্প মূল্যে বিদেশের তৈরী দেখতে পায় তা কিনে না। আর আমাদের দেশের অবস্থা কি? এই অসহযোগ আন্দোলনে খদ্দর কাপড় প্রচলনে কিছুদিন দেখা গেল, বিলাতী কাপড়ের দর একেবারে পড়ে গেছে। সাহেবরাও ছয় টাকা যোড়ার কাপড় তিন টাকা মূল্য করে দিল। আর যায় কোথা। বাঙ্গালী বাবুরা বিলাতী সস্তা দেখে আবার বিলাতী কাপড় কিনতে আরম্ভ করে দিলেন। একটু চিন্তাও করলেন না যে, যেদিন ইচ্ছা সে দিনই সাহেবরা আবার দর বাড়িয়ে দিতে পারে। লাভের মধ্যে এই হল যে দেশের একটা অতি প্রয়োজনীয় শিল্প চিরতরে লোপ পেতে লাগল। এরকম করে দেশের কত শিল্প যে আমরা নষ্ট করেছি, তা আর কত বলব। হয় ত অনেক শিল্পের নামও ভুলে গেছি। শিল্পগুলি বজায় রাখতে পারলে, শুধু যে কতকগুলি শ্রমজীবীর অন্নজলের ব্যবস্থা হয় তা নয়—দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারও বেড়ে থাকে: পূর্ব্বেই ত বলেছি যে আমাদের দেশে আমদানি হয়—রপ্তানি হয় না। ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের এক দিন ভেনিসের বণিকরা বড় সমাদর করত। এ সমস্ত শিল্প যদি আমরা বাঁচিয়ে রাখতাম, তাহলে আজ আমরা রপ্তানিও যথেষ্ট করতে পারতাম। আজ আমরাও ঠুনকো জিনিষ দিয়ে সাচ্চা মাল নিয়ে আসতে পারতাম।

অনেকে হয়ত এই পন্থাকে ভাল মনে করবেন না। কিন্তু জানেন কি, অর্থ-নৈতিকরা সব সময় "সত্যের" খুব কমই ধার ধারেন? অর্থ-নীতি সত্যকে যত না ভয় করে, সভ্যতাকে ভয় করে তার শত গুণে বেশী। কারণ সত্য জিনিষটা দৈব, আর সভ্যতা হচ্ছে মানবীয়। সত্যের সঙ্গে অর্থের কোন সম্বন্ধ নেই—পয়সার সম্বন্ধ এই সভ্যতার সঙ্গে। সত্যের কাছে মেকী মালের কোন মূল্য নেই। কিন্তু সভ্যতার কাছে তার যথেষ্ট সমাদর আছে।

ধরা যাক, আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার অবস্থা কি? এখন আমরা সভ্যতার যে স্তরে এসে পা দিয়েছি—সেখানে চাই শুধু টাকা আর টাকা। যার ধন আছে, তার গৌরবও আছে। যে যত দামি পোষাক লাগাতে পারবে, সেই তত বড় ভদ্র। কাজেই, তুমি গরীব, তোমাকে যদি ভদ্র হতে

হয়, তাহলে তোমার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে সে ভাবে যদি সাজাতে পার, তবে ত ভদ্র হবে। কিন্তু টাকা পাবে কোথায় শুনি। অথচ এদিকে বাহ্যিক জাঁক জমক না দেখালেও চলে না। এখন উপায়? দেশের সবাই ত আর রাজ নয় যে মণিমাণিক্য ব্যবহার করতে পারে। কাজেই, যারা ইকনমিষ্ট, তারা অমনি চিন্তা করতে বসে যাবে—"আচ্ছা, কম পয়সায় মণি মুক্তার মত কি কোন জিনিষ তৈরী করা যায় না? নিশ্চয়ই যাবে। দেখি, রাসায়নিক ভায়ারা কি বলেন।"

সেদিন এক ইকনমিক জুয়েলারীর বিজ্ঞাপনে দেখতে পেলাম যে, তারা এক রকম সোণার চুড়ী তৈরী করেছেন। তাতে তামার উপর সোনার পাত বসান। সত্যিকার সোণার চুড়ী বলেই মনে হয়। পরীক্ষা করবার জন্য এক যোড়া কিনলাম। হাতে দিয়ে খুব হাসতে লাগলাম। হাসি পেল এই জন্য যে, জুয়েলার মশাই সভ্যতার গালে বেশ জুতা মারতে শিখেছেন। এই ত চাই। কম পয়সায় দুশ টাকার বাবুগিরী করা যায়, এদিকে সভ্যতাও বুঝে নিলে যে, না বাঘের উপরও টাগ আছে।

বিলাতের সাহেবরা যখন ভারতীয় নীলের ব্যবসা একচেটে করে নিল, তখন জার্ম্মাণী ভাবলে "দাঁড়াও, তোমার চালাকী বের করছি। দেখি তোমার নীলের মত আমরা কিছু তৈরী করতে পারি কি না।"

কিছুদিন পরে দেখা গেল, জার্ম্মাণরা কি এক কৃত্রিম উপায়ে ভারতীয় নীলের চাইতেও ভাল নীল তৈরী করে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের মুখেও চুণকালি পড়ল। ভারতে নীলের চাষও বন্ধ হয়ে গেল! তাই বলছিলাম, সত্যের সঙ্গে অর্থ-নীতির কোন সম্বন্ধ নেই। ইকনমিষ্টদের সর্ব্বদাই লক্ষ্য থাকে, এক টাকা দিয়ে দশ টাকার কাজ কি করে করা যায়; এবং সেটা এমন বাহাদুরী নিয়ে করা চাই, যাতে কেহ কোন খুঁৎ ধরতে না পারে। এই চালাকী যে জাতির ভেতর বেশী, সে জাতি আজ অর্থে ধনকুবের। এবং এই পন্থাকেই বলে শিল্প চাতুর্য্য। এই শিল্প-চাতুর্য্য দিয়ে সভ্যতাকে কেনা গোলাম করা যায়।

সভ্যতা জিনিষটা এমন কিছু নয়। ওটাকে আমরা ইচ্ছা করলেই হাতের মুটয় আনতে পারি এবং একেবারে ন্যাংটী-ছাড়া করে ছেড়েও দিতে পারি। যতদিন সভ্যতা আমাদের হাতের মুটোয় ছিল—তত দিন দেশের লোক টাকা পয়সার জন্য বড় চিন্তা করে নাই। যেদিন হতে হাত-ছাড়া হয়েছে সেই দিন হতেই দেশবাসী হা অন্ন! হা টাকা! করছে। আমি আর এক জায়গায় বলেছিলাম যে, আমরা সাহেব সাজতে চাই—কিন্তু সাহেব সাজবার মত মাল মসলা আমাদের নেই।

তার মানে আমাদের সভ্যতা আমাদের হাত ছাড়া। তার একটা মাপ-কাটি নেই। সে দিন দিনই মাপকাটি ডিঙ্গিয়ে চলছে। এদিকে আর্থিক অবস্থা কিন্তু মাপকাটি পর্য্যন্তও পৌঁছাতে পারে নাই। এর পরিণাম ভাল নয়—এবং কোন দিনই ভাল হতে পারে না। গত মহা যুদ্ধের সময় বিলাতে আইন করে দেশের লোকের বাবুগিরী কমিয়েছিল। তার অর্থ এই যে, তখন বিলাতের সভ্যতা তারা আর্থিক অবস্থার মাপকাটি ডিঙ্গিয়ে চলছিল।

আমরা চাই ভারত আমেরিকা হউক, জাপান হউক ইংলণ্ড হউক—কিন্তু সেটা যেন শুধু থিয়েটার বায়স্কোপ ও মটর হাঁকানির দিকে না হয়। সে যেন তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্যে মূর্ত্তিময়ী হয়ে ফুটে উঠে। তবে দেশের কল্যাণ ও দশের কল্যাণ।

দ্বন্দ্ব

শ্রীমতী সরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

মিসেস রায় তখনো তাঁর লেখাপড়ার কাজের মধ্যে মগ্ন হইয়া ছিলেন। লীলা স্নান সারিয়া এবার কতকটা শান্ত ভাবে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। একটা বোলতা শরতের হাওয়ায় উৎফুল্ল হইয়া হয় ত একটা নূতন স্থান আবিষ্কারের আশায় ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার সন্ধান শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে বাহিরে আসিবার পথ হারাইয়া পর্দ্দার আশে পাশে বৃথাই ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিতেছিল। লীলা তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া সদয় চিত্তে পর্দ্দা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে বন্দিত্ব-মুক্ত করিল।

মিসেস রায় কাগজপত্র হইতে মুখ তুলিয়া লীলার দিকে চাহিলেন। তাহার পর কথঞ্চিৎ প্রসন্ন ভাবে বলিলেন, "এই যে! স্নান সেরে এলে? যা হোক—এখন তবু তোমার দিকে কতকটা চাওয়া যাচ্ছে। ঐ চৌকিখানা টেনে নিয়ে বোসো—অনেক কথা আছে। এখন তুমি বড় হয়েছ—পরিবারের সমস্ত সুখ-দুঃখের ভাগ এখন আর সকলের মত তোমারও নেওয়া উচিত। আমরা সকলেই সেটা তোমার কাছে আশা করি।"

সচরাচর মিসেস রায় এ রকম নরম সুরে কথা বলিতেন না। আজ মায়ের কথার স্বরে একটা কি অজ্ঞাত আশঙ্কার আভাষে লীলার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে শঙ্কিত মুখে একটা চৌকী টানিয়া লইয়া বসিয়া, নিঃশব্দে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া, কথাটা শুনিবার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মিসেস রায় কলমটার কালি ঝাড়িয়া লইয়া কলমদানির উপর তুলিয়া রাখিলেন। তার পর লীলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আজ সকালে চা খাবার পরে বীণা অরুণের একটা চিঠি পেলে। তাতে বম্বের হাসপাতাল থেকে অরুণ লিখছে—ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে একটা কামান ফেটে গিয়ে, সেই শক লেগে তার দুটি চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছে!"

"অরুণ অন্ধ? উঃ! মা!" অতর্কিত দুঃসংবাদে লীলা প্রথমটা চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। তার পর দেখিতে দেখিতে তাহার বড়-বড় কালো চোখ ছাপাইয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল।

মিসেস রায় কিছুক্ষণ বিষণ্ণ মুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চিরদিনের ধারণা ছিল, লীলা অত্যন্ত হৃদয়হীনা, কঠিন-প্রকৃতি—রমণীজনসুলভ মায়া-দয়া বা স্নেহ তাহার মধ্যে লেশমাত্র নাই। আজ অরুণের দুঃখে তাহাকে বুক ফাটিয়া কাঁদিতে দেখিয়া, তাঁহার মন লীলার প্রতি অনেকটা কোমল হইয়া আসিল। তিনি নিজেও রুমালে চোখ মুছিয়া বলিলেন, এখন বুঝতে পারছো—এ আঘাতটা বীণার কি রকম সাংঘাতিক লেগেছে! সে তার পর থেকে আর ঘর থেকে বেরোয় নি। আমার ত সকাল থেকে কেবলি চোখে জল আসছে। আমার এত দিনের এত সাধ, এত আশা—সবই এই দুর্ঘটনায় একবারে নষ্ট হয়ে গেল।

লীলা কোন দিন অরুণকে দেখে নাই। বীণার ঘরে তাহার প্রিয়দর্শন চিত্র দেখিয়াই সে তাহাকে বন্ধুর মত ভালবাসিয়াছিল। সুরূপ কান্ত মূর্ত্তি! শুধু রূপ নয়, তাহার মনের ঐশ্বর্য্যও মনোহর! যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অরুণ বীণাকে যে সব পত্র লিখিত, তাহার মধ্য দিয়া লীলা তার সরল উন্নত ও মার্জ্জিত হৃদয়ের পরিচয় পাইত! সেই দারুণ মৃত্যু-বিভীষিকাময় স্থানে অহরহ সংহারের তাণ্ডব লীলার মধ্যে বাস করিয়াও সে মুহূর্ত্তের জন্য স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ হারায় নাই। কি প্রাণের প্রাচুর্য্যে ও প্রতিভায় পূর্ণ তাহার হৃদয়! বীণার প্রতিই বা কি তার জ্বলন্ত ভালবাসা! তাহার পত্রে কখনো কোন উচ্ছ্বাসের লেশমাত্র থাকিত না; তবু সেই সব পত্রের ছত্রে-ছত্রে তাহার সংযত হৃদয়ের কি অকৃত্রিম অনুরাগ ফুটিয়া উঠিত! সেই অরুণ! একাধারে সৈনিক, সাহিত্যিক, কবি,—আজ তাহার সব শেষ,— আজ তাহার নবীন চির-সুন্দর নয়নের উপর চির-অন্ধকারের গাঢ় যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে!

জীবনের সমস্ত আশা, আনন্দ উৎসাহ—সব ব্যর্থ, সব বিফল! লীলা কোন কথা বলিতে পারিল না,—অরুণের এই ভীষণ পরিণামের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া শুধু উচ্ছ্বসিত ব্যথিত হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

মিসেস রায়ও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, আজ কেবল আমার সেই তিন মাসের আগেকার কথাই মনে হচ্ছে। কিরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে,—যখন এখানে কিরণের কাছে বেড়াতে এলো,—সারা সহরটায় যেন একটা বিষম সাড়া পড়ে গেল। যেমন চমৎকার রূপ তার, তেমনি শিক্ষা, তেমনি ভদ্র নম্র প্রকৃতি! অত বড় লক্ষপতির ঘরের ছেলে—তা তার কি অমায়িক স্বভাব! খেলায়, গানে, বাজনায়, শিকারে সমস্ত সহরটা যেন মাতিয়ে রেখেছিল! তুমি ত দেখ নি তাকে? বুঝতে পারবে না, সে কি ছেলেই ছিল! কত লোকে তাকে পাবার কত চেষ্টাই করলে। সে কিন্তু যে দিন থেকে বীণাকে দেখলে, তার পর থেকে আর কারো দিকে ফিরে চাইলে না। আহা! বাছা কি ভালই বেসেছিল বীণাকে! যখন তারা দুজনে পাশাপাশি বসে থাকতো, দেখে দেখে বুক আমার আনন্দে তৃপ্তিতে ভরে উঠ্‌তো, মনে হতো,— যেমন ঘর আলো করা মেয়ে, তেমনি সুন্দর জামাই হয়েছে! কুক্ষণে এই যুদ্ধ বাধলো, কুক্ষণে ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালি সৈন্য দল পাঠালে। আমার ভাগ্যে তাতেই সব শেষ হয়ে গেল!

কথা শেষ করিয়া মিসেস রায় আর্দ্র চক্ষু দুটি রুমালে মুছিলেন। "তাই তোমায় সকাল থেকে খুঁজ্‌ছিলুম। এখন বীণাকে একটু শান্ত করা দরকার। আর এখন আমার চেয়ে তোমারি তার কাছে থাকা, তাকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত। কি আঘাতটাই যে পেয়েছে সে! এখন কি করে যে সে সামলে সুস্থ হয়ে উঠবে, আমি শুধু তাই ভাবছি সকাল থেকে!" লীলা তখনি চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আমি এখনি তার কাছে যাচ্ছি মা!

সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই, মিসেস রায় একটু ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, একটু দাঁড়াও! একটা কথা তোমাকে বলে দিই! বীণাকে বোলো, তাড়াতাড়ি অরুণের চিঠির উত্তর দেবার কোন দরকার নেই। দু'এক দিন পরে, ভাল করে ভেবে, বুঝে দেখে উত্তর দিলেই চলবে। আমার কথাটা বুঝেছ ত? অর্থাৎ আমি চাই না যে, বীণা অরুণকে এমন কোন কথা লেখে, যাতে সে কোন আশা রাখতে পারে। কারণ, এ ঘটনার পর আর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ হতে পারে না।

চলিতে চলিতে লীলা এ কথা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ পরে সমস্ত ব্যাপারটা তাহার একরূপ বোধগম্য হইল। মা অরুণের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখিতে চান না,—বীণাকে নিজে সে কথাটা বলিতে কুণ্ঠা বোধ হওয়ায়, তাহাকে দিয়া কথাটা বলাতে চান।

লীলা কথাটা বুঝিয়া মনে মনে অত্যন্ত বেদনা বোধ করিল। যে হতভাগ্য ভাগ্য কর্ত্তৃক এমন নিপীড়িত হইতেছে, মানুষেও তাহাকে এমনি করিয়া বিড়ম্বিত করিবে? এত বড় দুঃখের দিনে প্রিয়জনের নিকট হইতে সে কি এতটুকু স্নেহের স্পর্শ, দুটো সান্ত্বনার কথা শুনিতে পাইবে না?

তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পরদুঃখকাতর হৃদয় কিছুতে এ মীমাংসা মানিয়া লইতে পারিল না। সে অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে মিনতির স্বরে বলিল, সেটা কি ভাল কাজ হবে মা? আজ তার বড় দুঃখের, বড় হতাশার দিন—আজ একমাত্র তোমাদের কাছ ছাড়া সে কোথাও একটু শান্তি পাবে না। তারও মা তুমি,—এত দিন তাকে এত স্নেহ করেছ, এত ভালবেসেছ—আজ তাকে তুমি ফেলে দেবে কি করে? বীণাই বা কি করে এ কথা তাকে জানাবে? এ কাজটা যে বড় অন্যায় হবে মা! মিসেস রায় এ কথায় বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। তিনি উদাসীন ভাবে বলিলেন, সে এখন আর হয় না লীলা! আজ যদি বীণা মনের আবেগে এ রকম একটা জীবনব্যাপী ত্যাগ করতে রাজি হয়, তাহলে সে সেটা বিষম ভুল করবে, আর স্মৃত্যিই সে কোন দিন জীবনে সুখী হতে পারবে না। আর অরুণের এ দুর্ঘটনায় আমি যে কত আঘাত পেয়েছি—সে অন্তর্যামী যদি কেউ থাকেন, ত তিনিই বুঝবেন। কিন্তু তা হলেও আমি মা—আমাকে নিজের সন্তানের ভাল-মন্দ ত আগে দেখতে হবে? সাধ করে একটা দুর্দ্দৈব কে ডেকে আনতে চায়? আমি খুব জানি—এ বিবাহ হলে বীণার সারা জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

এ কথায় লীলার মন শান্ত হইল না। সত্যকার মা যে, সে কি কেবল নিজের সন্তানের ভালমন্দই দেখিবে?

আর কাহারও দিকে দেখিবার তাহার অবসর নাই? অরুণও ত এক দিন মা বলিয়া স্নেহের দাবী জানাইয়া, কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল? আর বীণার সম্বন্ধেই বা এত ভাবনা কেন? মানুষের জীবনে স্নেহ, ভালবাসা, কর্ত্তব্য-জ্ঞান কিছুরি কি দরকার নাই? শুধু নিজের সুখই সব চেয়ে বড়? দুদিন আগে যখন তাহার স্বাস্থ্য, রূপ, শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন ত বীণা তাহাকে ভালবাসিয়াছিল!

সে বলিল, কিন্তু ধর, যদি ওদের বিয়ের পর এ ব্যাপারটা ঘটতো, তখন তোমরা কি করতে? তখন তো তাকে এমন অসঙ্কোচে তফাৎ করে দিতে পারতে না?

মিসেস রায়ের মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। মেয়েটার কি সকল সময় সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার! সহজ দিকটা ও কিছুতেই বুঝিবে না বলিয়া যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া আছে! নিজের বোনটার কথা ভাবিয়া দেখ—তা না,—যাহাকে কস্মিনকালে চোখেও দেখে নাই, তাহার জন্য যত রাজ্যের দরদ উথলিয়া উঠিল! কি বিপদেই যে তিনি পড়িয়াছেন।

প্রকাশ্যে তিনি অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন—না! তা পারতুম না! তখন যত বড়ই দুঃখ হোক, বীণার মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া, আর কোন উপায় থাকত না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে রকম কিছুই হয় নি—একটা মুখের কথা হয়েছিল মাত্র। সে রকম কথা কত লোকের সঙ্গে হয়, কত লোকের সঙ্গে ভেঙ্গে যায়—কাজেই সেটাকে বড় করে তোলবার কোন দরকার নেই। বিশেষ এ প্রস্তাব আমি নিজে করি নি, অরুণই বীণাকে এ কথা জানিয়েছে। তার বড় উদার মহৎ প্রকৃতি। সে কি কখনো এ অবস্থায় আর একটা তরুণ জীবনকে এই রকম নিরানন্দ দাসত্বের জীবনে টেনে আনতে পারে? সে তার নিজের দিক থেকেই এ বিবাহ ভঙ্গের প্রস্তাব করেছে।

—"তাকে ত এ কথা বলতেই হবে। সে জানে, এ ঘটনার পর আর আগের মত সে বীণাকে নিতে পারে না। তাই সে এ ক্ষেত্রে যা বলা উচিত—তাই বলেছে। সেটা তার মহত্ত্ব। কিন্তু সে বলেছে বলেই কি তার সম্বন্ধে তোমাদের সব কর্ত্তব্য ফুরিয়ে গেল? এখন বীণার উচিত বলা—যে, সে কখনো তাকে ত্যাগ করতে পারে না। যদি বীণা সত্যই তাকে ভালবেসে থাকে, তা হলে এ ছাড়া আর সে কি বলতে পারে, আমি ত তা বুঝতে পারি না। এখন শুধু বীণাই তার মনের অগাধ ভালবাসা দিয়ে তাকে শান্তি ও সুখ দিতে পারে, তার সমস্ত হতাশা ও বেদনা মুছিয়ে দিতে পারে। এ তো আর কারু কাজ নয়!"

মিসেস রায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ভাবে বলিলেন, তুমি এ বিষয়টা শুধু একটা সেন্টিমেণ্টের দিক দিয়ে দেখছো, বিচার করে দেখছো না। জীবনটা অত্যন্ত বাস্তব পদার্থ, ভাবের আবেগ দু দশ দিন চলতে পারে। তার পর যখন সে ভাব ফুরিয়ে যাবে, তখন জীবনকে ঠেকাবে কি দিয়ে? তোমরা ছেলেমানুষ, সংসার সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই তোমাদের, শুধু কতকগুলো পুঁথিগত কথা আওড়াতে খুব শিখেছ! তলিয়ে কোন কথা বুঝলে কি এ প্রস্তাব করতে পারতে? এ বিবাহ হলে বীণাকে যাবজ্জীবনের মত ধাত্রী ও বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে। অরুণ এখন সম্পূর্ণ অসহায়, সব সময়ই স্ত্রীর উপর নির্ভর করে থাকা ছাড়া তার আর উপায় নেই। এখন বোঝ—এই সারা জীবন বন্দিত্ব স্বীকার করে নেওয়া কি সহজ কথা? বিশেষ বীণার মত মেয়ে, যে জীবনে কোন দিন কোন দুঃখ কষ্টের লেশমাত্র জানে না, কোন কিছু সহ্য করতে যে মোটেই অভ্যস্ত নয়, চিরদিন আদরে ও আমোদ প্রমোদের মধ্যে যে মানুষ হয়েছে, তার কি ওই রকম জীবন কোন দিন সহ্য হবে? এ ভাবে থাকতে হলে মরে যাবে যে সে!

মিসেস রায় চৌকি হইতে উঠিয়া চঞ্চল ভাবে ঘরের ভিতর পায়চারী করিতে লাগিলেন। লীলাও আর কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দুই একবার ঘুরিয়া আসিয়া মিসেস রায় বলিলেন, আর কেনই বা সে ইচ্ছে করে এই দুঃখের জীবন মাথায় তুলে নেবে! তার মত মেয়ে—যে রূপে গুণে অতুলনীয়, সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন সে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তার সামনে খোলা রয়েছে,—সে স্বচ্ছন্দে যে কোন যোগ্য পাত্রকে বিবাহ করে সুখী হতে পারে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুইই তার অনুকূল! সে কোন্ দুঃখে সাধ করে এ রকম জন্মব্যাপী দুঃখকে বরণ করে নিতে যাবে? তুমি যাও তার কাছে, তার কাছে কাছে একটু থেকো—আর আমি

যে কথাগুলো বল্লুম—সে গুলো দরকার হলে বুঝিয়ে বোলো তা। তোমাদের এ সব ভাবুকতা দূরে ফেলে তার সমস্ত অবস্থা বুঝে দেখা উচিত, ও অরুণের চিঠির সেই মত উত্তরও দেওয়া উচিত। বিশেষ এ প্রস্তাব অরুণের কাছ থেকেই আসছে, এতে আমাদের পক্ষে সঙ্কোচ করবার কোন কারণ নেই।

লীলা বুঝিল, মাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা বৃথা, তিনি কিছুতেই তাঁহার সঙ্কল্প ছাড়িবেন না। আর কোন তর্ক করিলে কেবল একটা মনান্তরের সৃষ্টি হইবে মাত্র।

সে আর কোন কথা না বলিয়া শুষ্ক হৃদয়ে বীণার সন্ধানে চলিয়া গেল।

৪

মিঃ রায়ের দুই কন্যা সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ গুণ ও প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছিল। বীণার রূপ মার মত অতুল, সে নিতান্ত চপল লঘু প্রকৃতি। লীলার চেহারায় এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল না, মোটের উপর সে সুশ্রী। সে পিতার উন্নত চিন্তাশীল হৃদয় ও জ্ঞানের অধিকারিণী হইয়াছিল।

কিশোর বয়স হইতেই বীণা সমাজের একটি উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। সমাজের সমস্ত আদবকায়দা, চলাফেরা, হাসিগল্প, কোথায় কতটা এবং কাহার সঙ্গেই কি কি পরিমাণ চালাইতে হইবে, এ সবে সে বিশেষ অভ্যস্ত। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ, সংযত শোভন ভদ্রতা, কণ্ঠস্বরের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও কৃত্রিম হাবভাবে বিমুগ্ধ তরুণের দল অন্ধ উপাসকের ন্যায় সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুগত জনের মত ফিরিত। সেও নিজের মোহিনী শক্তির প্রভাব তাহাদের উপর বিস্তার করিয়া সর্ব্বক্ষণ তাহাদিগকে নিজের চারি পাশে পতঙ্গের মত আকৃষ্ট করিয়া রাখিত। সে কাহাকেও ভালবাসিত না, জয়ের আনন্দেই সে বিভোর।

বীণার উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় রূপের আভায় সকলেরই দৃষ্টি ঝলসিত। কাজেই বেচারা লীলা দিদির আওতায় একেবারে মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। তাহার দিকে সহজে কাহারও দৃষ্টি পড়িত না, সেও প্রাণপণে এই সব অকিঞ্চিৎকর সঙ্গ ও নির্লজ্জ চাটুবাদ এড়াইয়া চলিত। বীণার কৃত্রিম হাব ভাব, সর্ব্বদা পুরুষের মনোরঞ্জনের সযত্ন প্রয়াস দেখিয়া বিষম বিতৃষ্ণায় তাহার হৃদয় বিমুখ হইয়া গিয়াছিল। মিসেস রায় বীণার মত কন্যার গর্ব্বে আত্মহারা। লীলাকেও তিনি নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এখানে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। যত দিন যাইতে লাগিল, লীলার হৃদয়ের জ্ঞানস্পৃহা ততই বাড়িতে লাগিল। কলেজের পাঠ্য বিষয়ের সীমার মধ্যে সে আর নিজেকে বদ্ধ রাখিতে পারিত না। জগতে যাহা কিছু জানিবার আছে, সে সবই সে জানিতে চায়। সে তাহার সমস্ত অবসর বিবিধ বিষয়ের শিক্ষা ও পাঠের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিল। তাহার মত তরুণীর এইরূপ অদম্য জ্ঞান লাভের চেষ্টা ও পাঠানুরাগ দেখিয়া কলেজের জ্ঞানবৃদ্ধ প্রফেসরগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

সুদীর্ঘ আট বৎসরের সাধনার ফলে সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিত হৃদয় লইয়া লণ্ডন হইতে বাড়ী ফিরিয়া লীলা দেখিল, সংসারে মা ও বীণার সঙ্গে তাহার কোনখানে যোগ নাই, সে মার কথামত কোনরূপে চলিতে পারে না। যে সব অসার বিষয়ের আলোচনায় তাঁহাদের সময় কাটে, যে সব তুচ্ছ আমোদ প্রমোদে তাঁহাদের চিত্ত বিনোদন হয়, লীলা কিছুতে সে সব সংস্পর্শে আসিতে পারে না। অথচ তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে মা বিরক্ত হন, অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও মার সঙ্গে তাহার তর্কাতর্কি বাধিয়া যায়। লীলা ক্ষুব্ধ হইল, বেদনা পাইল, কিন্তু প্রতীকারের কোন উপায় দেখিল না।

পক্ষান্তরে মিসেস রায়ও দীর্ঘকাল পরে তাহাকে ফিরিয়া পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। সর্ব্বক্ষণ যেন সে তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য পণ করিয়া বসিয়া আছে! তাহার স্বাধীন মত, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, সংস্কারশূন্য উন্নত মনের পরিচয় তিনি পাইলেন না, এবং তাহার গুণ গ্রহণ করিবার মত শক্তিও তাঁহার ছিল না। তিনি বুঝিলেন, সে অত্যন্ত অবাধ্য ও একগুঁয়ে এবং জেদী। প্রতি পদে, প্রতি কথায়, সকল কার্য্যেই তাহার সহিত তাঁহার মতভেদ আরম্ভ হইল। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই সে তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল।

মিঃ রায় জানিতেন, তাঁহার এই তেজস্বিনী দুর্ব্বোধ

মেয়েটিকে কেহ বুঝিবে না। তিনি তাঁহার হৃদয়ের অগাধ স্নেহে ও আদরে অনাদৃতা বালিকাকে বুকে টানিয়া লইলেন। পিতার স্নেহের আশ্রয়ে লীলা আপনার ক্ষুব্ধ হৃদয়ের সমস্ত বেদনা ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিয়া কেবল একটিমাত্র সংবাদে লীলা সুখী হইয়াছিল। সেটি বীণার সঙ্গে অরুণের বিবাহ সংবাদ। সে সংবাদপত্রে এই তরুণ যুবকের কত সাহস, কত বীরত্বের কাহিনী পড়িয়াছিল। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ, বা পরিচয়ের আগেই সে তাহাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত ভালবাসিয়াছিল।

অনেক সময় সে অরুণের কথা মনে মনে ভাবিত। বীণা কি তাহাকে সম্পূর্ণ সুখী করিতে পারিবে? সে যেরূপ চঞ্চল ও লঘুপ্রকৃতি, অরুণের মত উন্নতচিত্ত যুবকের রুচি ও মন বুঝিয়া চলিতে পারিবে ত? আজ অরুণ তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু শুধু রূপের মোহ কত দিন স্থায়ী হইবে, যদি তাহার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ না থাকে?

এই ভাবে দিন কাটিতেছিল। লীলার বাড়ী ফি... তিন মাস পরে এক দিন অতর্কিত বজ্রাঘাতের ন্যায় অরুণের দুর্ভাগ্যের সংবাদ এই পরিবারের সকলকে মুহ্যমান ও স্তব্ধ করিয়া দিল।

ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে লেফ্‌টেন্যাণ্ট ঘোষাল সাহসের সহিত নিজ সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সহসা নিকটে একটি কামান ফাটিয়া যাওয়ায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। হাসপাতালে চিকিৎসা হইবার সময়ও অরুণের মনের বলের লাঘব হয় নাই। তখনো তাঁর বিশ্বাস ছিল, তিনি আবার সুস্থ হইয়া উঠিবেন। কিন্তু প্রায় একমাস চিকিৎসার ... ডাক্তারদের সমবেত পরামর্শে স্থির হইল, মাথায় "... আক্রান্ত হইয়াছে, লেফ্‌টেন্যাণ্ট জী... আর দৃষ্টি ফিরিয়া পাইবেন না। (ক্রমশঃ)

স্বপন

শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা

(আমার) খোকার গায়ের গন্ধ কেন শিয়রে আজ পাই?
নয়ন জুড়ে ঘুমের ঘোরে এসেছিল খোকন ওরে?—
আমি কারে রে শুধাই?

অলস আঁখির দুটি পাতে ধরিয়ে ছিল কোমল হাতে
তার গন্ধ মাখা তাই,
বিছানাতে চরণ আঁকা বালিসে তার হাঁটুর চাপা,
ওগো তার চিহ্ন আমায়
লুকাতে পারে নাই।

খোকন কিরে আমায় ছেড়ে রইতে পারে অনেক দূরে
দুষ্ট ছেলে ঘুমে পেলে
আমার বুকে আসে তাই।
ভোরের শীতল বায়ুর সম খোকার গায়ের পরশ মম
সে পরশ যে মর্ম্মে মর্ম্মে
জানতে আমি পাই।
খোকন তাই স্বপন হ'য়ে চোখে মুখে চুমা খেয়ে
শিয়রে তার গন্ধ রেখে আমার জানিয়ে গেছে
ওগো আমি দূরে নাই।

নির্য্যাতিতার কাহিনী

শ্রীরাধারাণী দত্ত

স্বামি! প্রিয়তম!...নারীর দেবতা!...আমার হৃদয়-রাজ!
উঃ, বড় জ্বালা! ভীষণ আগুন জ্বলিছে বুকের মাঝ!
তুঁষের আগুন এ অনল চেয়ে ঢের সুশীতল মানি;
বড় যন্ত্রণা! যায় বুঝি প্রাণ!...সারা দেহ দহে গ্লানি!
ওগো তুমি এস—একবার কাছে—জীবনের দুখ-হারী,
তোমার অভয়-কর-পরশনে এ জ্বালা জুড়াতে পারি!
ওই মুখ আর ওরি ছাঁচে গড়া কচি মুখ দুইখানি,
বৈতরণীর তীর হ'তে মোরে ফিরায়ে এনেছে টানি।
ওগো প্রাণ-প্রিয়, জীবনারাধ্য একবার এস কাছে,
বুকের মাণিক খোকা খুকী মোর নিয়ে এস কোথা আছে?
এ শরীর যেন প্রাণহীন জড় শব সম মনে হয়,
ঘৃণাকুঞ্চিত অন্তর মোর, সারা দেহ পূতিময়;
মর্ম্মকোষে যে শতেক নাগিনী দংশিছে ক্রূরফণা,
শান্তি-ওষধি-প্রলেপ তোমারি চরণ-ধূলির কণা!
মণি আর টুনু দুটি যাদু মোর, ঘুমিয়ে কি তারা আছে?
মা বলিয়া ছুটে কেন গো এখনও ঝাঁপায়ে এল না কাছে?
মণিরে আমার এনে দাও ওগো, চুমা দিই তার মুখে,—
টুণুরাণী কোথা—দাও এনে দাও একবার নিই বুকে।
মরে যাই যাট্! বাছারা আমার কত না পেয়েছে দুখ,
মায়ের অভাবে কত না কেঁদেছে, বিষাদ-মলিন মুখ।

* * * * *

এস, কাছে এস, দূরে কেন অত? কেন গো আনত শিরে?
এখনও কেন গো বিবর্ণ মুখ? পেয়েছ' তো মোরে ফিরে!
আমার বিরহ-বেদনা তুমি যে সহিতে পার না কভু;
মৃত্যুর ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়ে তাই মরিতে পারিনি প্রভু!
মরণের কালো যবনিকা-আড়ে চলে গেলে যে গো জানি
মণি ও টুনুরে পাব না কো আর, পাব না ও পা দু'খানি।
সপ্ত-স্বরগ-শ্রেষ্ঠ আমার ও দুটি চরণ-তল
ছেলে দু'টি ফেলে গোলোকেও গেলে শান্তি পাব না পল!
এই ত আমার প্রথম প্রভাত, এই ত জীবন সুরু,
কল্পনা তুলি কত সাধ আশা আঁকিতেছে লঘু গুরু!
...উঃ! বড় তৃষা এক ফোঁটা জল দাও গো, শুষ্ক তালু,
বুকের মাঝারে মরু-দহনের জ্বলিছে তপ্ত বালু।

* * * *

ও কি কথা? ওগো, ও কি কথা কও—কোথায় যাইব আমি?
করিতেছ মোরে পরীক্ষা এ কি? মার্জ্জনা কর স্বামী!
ভগ্ন চূর্ণ বুকের পাঁজর সহন ক্ষমতা নাই,
বড় দুর্ব্বল, বড় অসহায়, তব আশ্রয় চাই।
আমি যে কী তাহা জান না কি তুমি? জীবন আছ' যে ছেয়ে,
তুমি চিরদিন জানো বেশী ভালো আমারে আমার চেয়ে।
স্বেচ্ছায় আমি যাইনি বিপথে, মনে প্রাণে আমি সতী,
তব বাহু-পাশ ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, সে তো সবই জানো পতি!
অস্ত্র-গভীর ক্ষত-মুখে আর হেনো না তীক্ষ্ণ বাণ,
ব্যথা অপমান যাতনা সরমে ভাঙিয়া পড়িছে প্রাণ।
—সমাজ-ত্যক্তা পতিতা হয়েছি? ওগো স্বামী, বলো তবে,
পত্নী তোমার কোন্ আশ্রয়ে কার কাছে আজি রবে?
কুল গেছে মোর? নহি কুলবধূ? অকূলে ভাসিতে হবে?
পতিতা পরশে জাতি-নাশ—তাই গৃহে আর নাহি লবে?
সংসারে মোর দেনা-পাওনার চুকে গেছে সব দাবী?
পথে নেমে আজ খুঁজে নিতে হবে হারানো ঘরের চাবি?
হিন্দু গৃহের বধূ যে গো আমি, রক্ষক তুমি তার,
দেব ব্রাহ্মণ অগ্নি সমীপে ভর্ত্তা হ'য়েছো যার।
অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী এই বলে নিলে যারে,
মৃত্যুও যেই মিলন-গ্রন্থি টুটিবারে নাহি পারে;
আজি সে তোমার কেহ নয়? ওগো, সম্ভবপর এ কি?
মোর আঁখি পরে আঁখি মিলাইয়া একবার চাহ দেখি!
তব পুত্রের জননী যে আমি, মণি ও টুনুর মা—
গৃহের একটি কোণেও কি আজ ঠাঁই মোর মিলিবে না?

* * * *

এত অনুনয়, এত ক্রন্দনে, গলিল না তবু প্রাণ?
না না থাক্! মোর ঘুচিয়াছে ভ্রম, চাহি না করুণাদান।
পুরুষের দয়া কৃপা যে ঘৃণ্য আজিকে আমার কাছে—
দিলেও লব না তোমাদের দান, ওতে মহা পাপ আছে!
দুর্ব্বলা এক অসহায়া নারী ধর্ষিতা আজি হায়,
পুরুষ পশুর পাশব পীড়নে জীবন্মৃতেরই প্রায়,
তারে কি না আজ পঙ্গু সমাজ শাস্তি দিবার তরে
নির্ব্বাসনের দণ্ড তুলেছে উদ্যত দুই করে!
অনলে কি নাই দাহিকা শক্তি, মেঘে কি বজ্র নাই,
ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায়-অন্যায়, পুড়ে কি হয়েছে ছাই?
বিনা অপরাধে আমারেই আজ দিতেছ দণ্ড সবে!
দণ্ড ন্যায়তঃ প্রাপ্য কাদের?—সে কথা কে আজি কবে?
পশুর কবল হইতে নিজের ধর্ম্মপত্নী যেই
পুরুষ হইয়া রক্ষিতে নারে, ধিক্কার তারে দেই!
ধর্ম্ম সমাজ লোক সমক্ষে রক্ষণ ভার নিয়া
রক্ষিতে নারে পত্নী যাহারা নিজ হাতে আগুলিয়া;
তাহারা কি নহে অপরাধী বেশী? তাদের কি সাজা নাই?
আমিই কেবল ঘৃণ্য সবার! আমাকেই দূর ছাই?
জাতি ও সমাজ-চ্যুতা করিতেছ, গৃহে আর নাহি লবে!
মোর অপরাধ তাহাদের চেয়ে গুরুতর কি গো তবে?
স্বেচ্ছায় আমি বিপথে যাই নি লালসা-বৃত্তি নিয়া,
স্বেচ্ছায় আমি আসি নি এ দেহ পশুর কবলে দিয়া,
স্বেচ্ছায় আমি স্বামী-পুত্রের করি নি ত' হেঁট মুখ
পুরুষেই মোরে জোর ক'রে আজ দিয়েছে চরম দুখ!
শত অবৈধ পাপেও পুরুষ নহে পাপী অনাচারী!
হায়, তাহাদেরই খোস্-খেয়ালের খেলনা কি শুধু নারী?
শুধু আমাদেরই সমুখে রুদ্ধ হিন্দু-সমাজ-দ্বার?
মৃত্যু অথবা নরক ব্যতীত পাবো না কি পথ আর?

নারী-জীবনের বিশেষত্ব

ডাক্তার শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়

স্থির-চিত্তে নারীদেহ পরীক্ষা করিলে বুঝা যায় যে, অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে গর্ভ-ধারণ, সন্তান-প্রসব ও সন্তান-পালনই নারীজীবনের বিশেষ ধর্ম্ম। সন্তানের রক্ষার্থই ভগবান একাধারে নারীহৃদয়ে—বুকভরা স্নেহ, প্রাণভরা ভালবাসা ও অপার্থিব আত্মত্যাগ—পূর্ণভাবে ঢালিয়া রাখিয়াছেন। সন্তানের সুখেই মায়ের সুখ, সন্তানের দুঃখেই মায়ের দুঃখ, একমাত্র সন্তানের মঙ্গল-কামনাতেই মা নিজের নিজত্বটুকু পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলেন। ছেলেই ধ্যান, ছেলেই জ্ঞান, ছেলেই যাঁর সর্ব্বস্ব—যে ছেলের কল্যাণের জন্য তিনি অম্লানবদনে প্রাণ দিতেও কাতর হন না,—হায়, কাল বশে সেই ছেলে এমন মাকেও অনাদর করে! ইহার অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? চিত্তের মলিনতার জন্য আমরা ভুলিয়া যাই—মাতৃঋণ পরিশোধ হবার নয়।

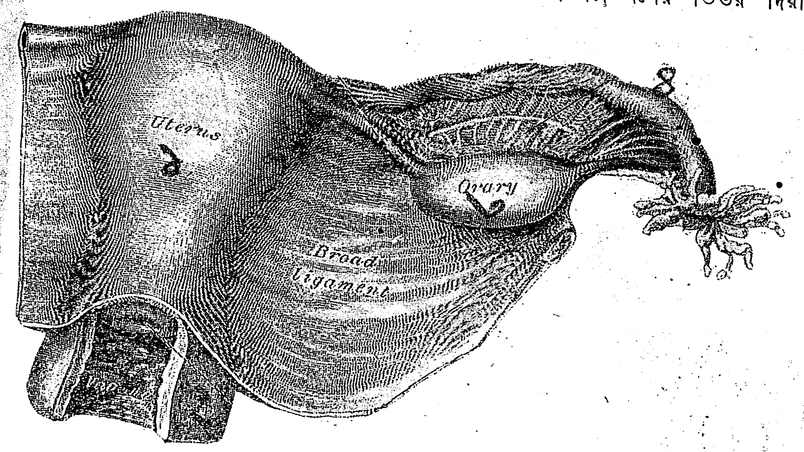

১। জরায়ু 'নাড়ী'। ২। জরায়ুর মুখ। ৩। ডিম্বকোষ—ওভারী।
৪। ডিম্ববাহী নল—টিউব। ৫। প্রস্রাব-পথ।

জননেন্দ্রিয়

স্ত্রীলোকের সন্তান উৎপাদনের প্রধান যন্ত্র,—জরায়ু ও ডিম্বকোষ। এই সকল যন্ত্র উদরের নিম্নদেশে অবস্থিত; তন্মধ্যে জরায়ু (Uterus) মধ্যস্থলে এবং ডিম্বকোষ (Ovary) দুইটী জরায়ুর দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে আছে। প্রত্যেক ডিম্বকোষ হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত একটী সরু নল থাকে, তাহাকে ডিম্ববাহী নল (Fallopian tube) বলে।

জরায়ুর সম্মুখে মূত্রাশয় (Bladder) এবং পশ্চাতে মলনালী (Rectum) অবস্থিত। এ জন্য জরায়ু পশ্চাৎভাগে বাঁকিয়ে গেলে মলনালীর উপর চাপ পড়িয়া কোমরে ব্যথা হয় এবং মল ত্যাগের কষ্ট হয়। জরায়ু সম্মুখদিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িলে মূত্রাশয়ের উপর চাপ পড়ে এবং ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা হয়।

প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই ডিম্বকোষে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব থাকে। যেমন কোন কোন গাছের ফল পাকিলে ফাটিয়া যায়, তেমনি যখন যে ডিম্বটী পরিপুষ্ট (পক্ক) হয়, তাহার আবরণ আপনা হইতেই ফাটিয়া যায় এবং পক্ক ডিম্বটী নলের ভিতর দিয়া জরায়ুতে আসে। তথায় পুরুষের বীজের (শুক্রের কণার) সহিত সাক্ষাৎ হইলে, উভয়ে মিলিত হইয়া সন্তানের অঙ্কুর সৃষ্টি হয়। এই অঙ্কুরের আকার একটী সরিষা প্রমাণ। প্রথম অবস্থাতে ইহাতে হাত, পা, মুখ, চোখের কোন চিহ্নই থাকে না। ক্রমে ক্রমে যেমন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যায়, ঐ সরিষা-প্রমাণ অঙ্কুর হইতে সন্তানের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি গঠিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। সন্তান যেমন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, জরায়ুর আকারও সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়। পোয়াতি অবস্থায় প্রথমে তিন মাস পর্য্যন্ত জরায়ু কোমরের হাড়ের (pelvis) ভিতর থাকে। চতুর্থ মাস হইতে তলপেটে নাড়ীর নীচে ক্রমশঃ উঠিতে থাকে ও পেট

বড় হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ণ গর্ভাবস্থায় জরায়ু বক্ষস্থলের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত পহুঁছে।

সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের ১২ বৎসর বয়স হইতে ৪০।৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—এই সময়ের মধ্যে জননেন্দ্রিয়ে (জরায়ু, ডিম্বকোষ ইত্যাদি) প্রতি মাসে ৩।৪ দিন অত্যধিক রক্তের সঞ্চার হয়; এবং ঐ সময় জরায়ুর মধ্য হইতে রক্ত নিঃসরণ হইয়া সেই রক্ত বাহিরে আসে। ইহাকেই মাসিক ঋতু বা Mens কহে।

স্বাভাবিক ঋতু

আমাদের দেশে সাধারণতঃ ১২ বৎসর বয়সে প্রথম ঋতু আরম্ভ হয়। শারীরিক স্বাস্থ্য ভাল হইলে ১২ বৎসরের পূর্ব্বে এবং খারাপ হইলে ইহার পরেও ঋতু আরম্ভ হইতে দেখা যায়। এই মাসিক রক্তস্রাব ৩ দিন হইতে ৫ দিন পর্য্যন্ত থাকে। ইহাই স্বাভাবিক ঋতু। ইহার কম বেশী হইলেই অস্বাভাবিক বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার রঙ কতকটা স্বাভাবিক রক্তের ন্যায়। ইহাতে কোনরূপ দুর্গন্ধ বা রক্তের চাপ থাকে না; এবং পরিমাণ সকল স্ত্রীলোকের পক্ষে সমান নহে। যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩।৪ বারের বেশী বা দুই বারের কম কপ্‌নি (diaper) বদলাইতে হয়, তাহা হইলে স্রাব অস্বাভাবিক পরিমাণে হইতেছে বলিয়া জানিতে হইবে। এই সময় পেটে বিশেষ কোনরূপ যন্ত্রণা থাকে না। তবে অনেক স্ত্রীলোকই তলপেট ও কোমরে আড়ষ্টভাব অনুভব করেন। জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্রে রক্তাধিক্য হওয়ার জন্যই এই আড়ষ্ট ভাব বা ভার-ভার ভাব অনুভূত হয়। অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই ২৮ বা ৩০ দিন অন্তর ঋতু হয়; কিন্তু কখন কখন ২১ বা ৩৫ দিন অন্তরও ঋতু হইতে দেখা যায়। গর্ভাবস্থায় স্বভাবতঃই ঋতু বন্ধ থাকে। এই অবস্থা, এবং যত দিন শিশু মাতৃস্তন্য খায় সেই সময় ভিন্ন অন্য সময়ে ঋতু বন্ধ থাকিলে, তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া বুঝিতে হইবে। এ দেশে ৪৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যেই প্রায় সকল স্ত্রীলোকের ঋতু একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। যদি ৪৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ঋতু বন্ধ হয়, কিম্বা ৫০ বৎসর বয়সের পরেও ঋতু বন্ধ না হয়—তাহা হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। কারণ, কয়েকটী রোগের জন্য এইরূপ ঘটা সম্ভব; এবং সে সকল রোগের অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন।

অস্বাভাবিক ঋতু

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির মধ্যে যে কোনটী দেখা দিলেই ঋতু অস্বাভাবিক বলিয়া জানিতে হইবে, এবং প্রতিবিধানের জন্য যত সত্বর সম্ভব চিকিৎসকের সাহায্য লইতে হইবে; কারণ, বিলম্বে কঠিন রোগ জন্মিতে পারে—

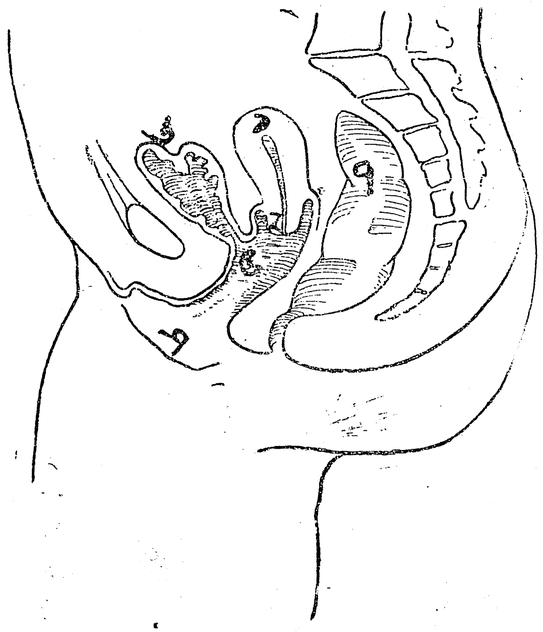

১। জরায়ু, ২। জরায়ুর মুখ, ৫। প্রসব-পথ।
৬। মূত্রস্থলী, ৭। মলনালী, ৮। প্রসবদ্বার।

১। অত্যধিক বা অত্যল্প রক্তস্রাব।
২। সাত দিনের বেশী রক্ত থাকা।
৩। জমাট রক্ত (চাপ) নিঃসরণ।
৪। দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব।
৫। তলপেট বা কোমরে যন্ত্রণা।
৬। জ্বর।
৭। মাসে একাধিকবার ঋতু হওয়া।

অর্থাৎ এক ঋতু শেষ হইয়া ১০।১৫ দিনের মধ্যে পুনরায় ঋতুস্রাব। কিন্তু যদি মাসের ১লা তারিখে ঋতু হইয়া পুনরায় সেই মাসের সংক্রান্তির দিন আবার ঋতু হয়, তাহা হইলে সেটী অস্বাভাবিক বলিয়া ধরা হইবে না।

ঋতুকালীন নিয়ম পালন।—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋতুকালে জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্রে অত্যধিক রক্তসঞ্চার হয়। এই সময় প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই নিয়ম অবহেলা করায়, অনেক স্ত্রীলোককেই যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে দেখিয়াছি।—

১। কোনরূপ পরিশ্রমের কাজ করিবে না।

অধিক লোকের জন্য রন্ধন করা, নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে পরিবেশন করা, জলের কলসী বা বাল্‌তী, বিছানা ও ট্রাঙ্ক ইত্যাদি ভারি জিনিষ তোলা বা তুলিবার চেষ্টা করা একান্ত নিষিদ্ধ। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তলপেট ও কোমরে যন্ত্রণা হইয়া অত্যধিক রক্তস্রাব হইতে পারে; এবং সময়ে বন্ধ না হইয়া রক্ত অনেক দিন থাকিতে পারে।

২। তলপেটে ঠাণ্ডা লাগাইবে না। গরম কাপড় ব্যবহার করিবে। ফ্লানেল কিম্বা উলের কাপড় দিয়া পেট সর্ব্বদা জড়াইয়া রাখিলেই ভাল হয়। স্নান করা বা সাবান মাখা নিষেধ। ঋতুকালে ভিজা কাপড়ে থাকিলে কিম্বা অন্য কোন কারণে পেটে ঠাণ্ডা লাগাইলে হঠাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া তলপেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে পারে; এবং জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্র ফুলিয়া (Inflammation) জ্বর হইতে পারে। এই নিয়ম অগ্রাহ্য করায় অনেক স্ত্রীলোকই তলপেটে ব্যথা, কষ্টরজঃ শ্বেতস্রাব (Leucorrhœa, লিউকোরিয়া) প্রভৃতি রোগ ভোগ করেন।

৩। স্থানান্তরে গমন করিবে না। রেলপথে কিম্বা গাড়ী চড়িয়া আত্মীয়ের বাড়ী যাওয়া, ঠাকুর দর্শন বা যাত্রা থিয়েটার দেখিতে যাওয়া নিষেধ। এই নিয়ম অবহেলা করিলে জরায়ু স্থানচ্যুত হইতে পারে এবং প্রথম নিয়ম লঙ্ঘনের যে সকল কুফল লিখিত হইল, সেই সকলও ঘটিতে পারে।

৪। যে কয়দিন রক্তস্রাব বন্ধ না হয়, পৃথক শয্যায় শয়ন করিবে। স্বামী-সঙ্গ নিষেধ।

৫। স্রাবের জন্য ময়লা ন্যাকড়া ব্যবহার করিবে না। বোরিক তুলা (Boric cotton) ব্যবহার করাই যুক্তি-সঙ্গত। অভাবে, ধোয়া পরিষ্কার ন্যাকড়া ব্যবহার করিবে। কোন কোন স্ত্রীলোক স্পঞ্জ (Sponge) ব্যবহার করেন। একই স্পঞ্জ এক বারের বেশী ব্যবহার করা উচিত নয়; স্পঞ্জের ভিতর যে রক্ত প্রবেশ করে, তাহা পরিষ্কার করা কঠিন। সেই রক্ত পচিয়া স্পঞ্জ বিষাক্ত হইয়া যায়। সেই বিষাক্ত স্পঞ্জ ব্যবহার করিলে নানারূপ রোগ জন্মিতে পারে।

তুলা বা ন্যাকড়া প্রসবদ্বারের ভিতর রাখিবে না। কারণ, দেখিয়াছি, কোন কোন সময় ঐ সকল জিনিষ বাহির করিতে না পারায় ভিতরেই থাকিয়া যায়, এবং তথায় পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া নানারূপ রোগ জন্মায়। প্রসবের পর যেরূপভাবে 'কপ্‌নি' ব্যবহার করা হয়, ঋতু-স্রাবের জন্যও সেইরূপ কপ্‌নী ব্যবহার করিবে।

৬। রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত 'ঋতুস্নান' করিবে না। কারণ, জরায়ুর রক্তাধিক্য না কমিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয় না। এমন অবস্থায় স্নান করিয়া পেটে ঠাণ্ডা লাগাইলে কি ঘটিতে পারে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দেখিয়াছি, অনেক স্ত্রীলোকই স্রাব বন্ধ হৌক বা নাই হৌক, ঋতুর চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া থাকেন। ইহা সম্পূর্ণ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

আয়ুর্ব্বেদের 'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থে রজঃস্বলা স্ত্রীর জন্য এই নিয়ম লেখা আছে;—"রজঃস্বলা স্ত্রী রজঃনিঃসরণ দিবস হইতে ৩ দিন হিংসা করিবে না, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে; কুশাসনে শয়ন করিবে; পতিকেও দর্শন করিবে না। হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। অশ্রুপাত, নখচ্ছেদ, অভ্যঙ্গ, অনুলেপন, নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন, স্নান, দিবানিদ্রা, প্রধাবন, হাস্য, বহুভাষণ, পরিশ্রম, অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণ, ভূমিখনন ও প্রবল বাত সেবন—এইগুলি পরিবর্জ্জন করিবে।"

এই ঋষিবাক্য অমান্য করিলে সঙ্গে সঙ্গেই হৌক বা কিছু দিন পরেই হৌক বিষময় ফল ভুগিতেই হইবে,—ইহা স্থির নিশ্চয়।

ঋতুকালীন অস্বাভাবিক লক্ষণ ও তৎপ্রতিকার

১। তলপেট বা কোমরে যন্ত্রণা।—সর্ব্বদা শুইয়া থাকিবে; এমন কি যন্ত্রণা অধিক হইলে মলমূত্র ত্যাগও বিছানায় শুইয়া করা কর্ত্তব্য। বোতল কিম্বা রবারের ব্যাগে গরমজল পুরিয়া পেটে সেঁক দিবে। যদি রক্তস্রাব অধিক হয় বা জ্বর থাকে, তাহা হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। চিকিৎসক পাওয়া না গেলে যন্ত্রণা নিবারণের জন্য—একটী ট্যাবলেট্ 'নানালা' ((Tablet Nanala)

য়্যাসপিরিণ (Aspirin) কিম্বা য়্যান্টিক্যামনিয়া (Anti-kamnia) সেবন করিবে। ইহাতে যন্ত্রণার আশু লাঘব হইতে পারে। এই ঔষধ খাওয়ার পর ২ ঘণ্টার মধ্যে যদি যন্ত্রণা কিছুই না কমে, তাহা হইলে পুনরায় আর একটী খাইবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩।৪ বারের অধিক এই সকল ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ। য়্যাস্‌পিরিন নামক ঔষধ বিশ্বস্ত কোম্পানীর তৈয়ারি না হইলে ব্যবহার করিবে না। 'বাজে মার্কা' ঔষধ খাইলে অত্যন্ত ঘাম ও বুক ধড়ফড়ানি হইতে দেখা যায়। অধিক মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহার করিলে হৃদযন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং কোন কোন সময়ে মৃত্যু ঘটে। 'বারোজ্‌ ওয়েল্‌কাম' (Barroughs Welcome), পার্ক ডেভিস্‌ (Parke Davis) কিম্বা মার্ক (Merck) প্রভৃতি কোম্পানীর ঔষধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

২। পেট ব্যথার সহিত জ্বর বা খুব অল্প স্রাব। তলপেটে তিষির কিম্বা গমের ভূষির পুলটীস্‌ দিবে। অথবা য়্যান্টিথার্ম্মিন (Anti-thermin) য়্যান্টিফ্লোজিষটিন্‌ (Anti-phlogistine) কিম্বা থার্ম্মোফিউজ্‌ (Thermo-fuse) নামক মলম তলপেটে লাগাইয়া তুলা কিম্বা ফ্লানেল দিয়া পেট বাঁধিয়া রাখিবে। ২৪ ঘণ্টার পর ঐ মলম তুলিয়া তলপেট গরমজলে ধুইয়া পুনরায় মলম বাঁধিবে।

৩। অধিক রক্তস্রাব। বিছানা হইতে মোটেই উঠিবে না। চায়ের চামচের এক চামচ (১ ড্রাম) চুণের জল কিম্বা ক্যালসিয়াম ল্যাক্‌টেট্‌ ট্যাবলয়েড (Calcium Lactate Tabloid) দুইটী করিয়া দিবসে ৩বার খাইবে। তাহাতেও যদি রক্ত বন্ধ না হয় এবং ডাক্তারের সাহায্য একান্তই পাওয়া না যায়—বোরিক তুলা বা গজ (Boric cotton or Gauze) ফুটন্ত জলে ভিজাইয়া নিঙ্‌ড়াইয়া লইবে এবং তাহা প্রসব-পথের ভিতর ঠাসিয়া দিতে হইবে। নিজে ইহা পারিবে না; ধাত্রী কিম্বা অন্য কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা করাইয়া লইবে। হাত উত্তম রূপে ধুইয়া প্রসব-দ্বারের ভিতর যতদূর আঙ্গুল যাইবে, বাম হাতের তর্জ্জনী ও মধ্যমা ততদূর প্রবেশ করাইয়া ডানহাতের তর্জ্জনীর দ্বারা সাহস পূর্ব্বক ততদূর ঐ তুলা বা গজ উত্তম রূপে ঠাসিয়া দিতে হইবে; আল্‌গা ভাবে দিলে রক্ত বন্ধ হইবে না। ২৪ ঘণ্টা পরে ঐ তুলা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। যদি তখনও রক্তস্রাব বেশী থাকে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার নূতন তুলা সেই ভাবে ব্যবহার করিবে। তুলায় সূতা বাঁধিয়া রাখিলে বাহির করার সুবিধা হয়। গজ পাওয়া না গেলে সূতা বাঁধিয়া কতকগুলি তুলার বল (প্ল্যাগ, plug) তৈয়ার করিয়া লইবে। প্রত্যেক প্ল্যাগের সহিত ৫।৬ আঙ্গুল পরিমাণ সূতা থাকিবে। যখন এই বল ভিতরে দেওয়া হইবে, সূতাগুলি বাহিরে ঝুলিবে। যে কয়টী বল ভিতরে দেওয়া হইল, তাহার হিসাব রাখিবে। তাহা হইলে ভুল-ক্রমে কোন তুলা ভিতরে থাকিয়া যাইবে না। বাহিরের সূতা ধরিয়া টানিলে তুলা সহজে বাহির করা যায়।

অস্বাভাবিক স্রাব

১।—ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময় রক্তস্রাব হইলেই তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া জানিতে হইবে। সে স্রাব যতই অল্প বা অধিক হোক না কেন, তাহা কখনই গোপন রাখা উচিত নয়। যত শীঘ্র সম্ভব উপযুক্ত স্ত্রীরোগ-চিকিৎসক দ্বারা জরায়ু পরীক্ষা করাইয়া রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। বিলম্বে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। জরায়ুর ক্যান্‌সার (cancer) নামক যে উৎকট ব্যাধি আছে, তাহার প্রথম লক্ষণ—মলমূত্রত্যাগ কালে বেগ দিলে বা সঙ্গমের সময় অল্প রক্তস্রাব। এই রোগের আরম্ভকালে অল্প অল্প রক্তস্রাব কিম্বা জলস্রাব ভিন্ন অন্য কোন উপসর্গ বা জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না। এই জন্য প্রথম অবস্থাতে এই রোগ উপেক্ষিত হয়। স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃই হো'ক বা রোগের পরিণাম না জানার জন্যই হো'ক—বা ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করাবার ভয়েই হো'ক—অধিকাংশ স্ত্রীলোকই এই লক্ষণ অন্যের নিকট, এমন কি নিজ স্বামীর নিকট পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন না। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া যখন রোগ চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া পড়ে, তখন পেটে, কোমরে বা উরুতে যন্ত্রণা আরম্ভ হয়; রক্তস্রাব বাড়িতে থাকে, স্রাবে দুর্গন্ধ হয়। এমন কি যে-ঘরে সেই রোগী থাকে, দুর্গন্ধের জন্য কখন কখন অন্যে সে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না। জীবন্তেই রোগীর নরক-ভোগ হয়। এই সকল লক্ষণ ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি পা যে, অতি লজ্জাশীলা স্ত্রীলোকও তখন পুরুষ-ডাক্তার দ্বার পরীক্ষা করাইতে কোন প্রকার আপত্তি করেন না; এম

কি অস্ত্র-চিকিৎসার দ্বারাও যদি সম্ভব হয়, আরোগ্য লাভ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয়, এইরূপ অবস্থায় রোগীর সকরুণ কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও সুনিপুণ চিকিৎসক রোগ আরোগ্য করিবার কোন উপায় করিতে পারেন না। অধুনা 'রেডিয়াম' (radium) নামক ধাতু-প্রয়োগে ক্যান্‌সার রোগের যে চিকিৎসা করা হয়, তাহাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফলবতী হয় না। যন্ত্রণায় ও রক্তক্ষয়ে রোগী ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই রোগের আরম্ভকালই চিকিৎসার উপযুক্ত সময়। সময়ে সুচিকিৎসা হইলে রোগ নিঃসন্দেহ আরোগ্য হইয়া যায়। কিছুদূর অগ্রসর হইলে আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব প্রত্যেক স্ত্রীলোকের নিকট সানুনয় নিবেদন এই—ভগবান না করুন, যদি কখনও কাহারও উপরিলিখিত লক্ষণ (অসময়ে রক্তস্রাব) দেখা দেয়, তাহা যতই সামান্য হউক না কেন, কালবিলম্ব না করিয়া সুবিজ্ঞ স্ত্রীরোগ-চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইবেন। ইহাতে লজ্জা করিবার কোন কারণ নাই—কোন পাপও নাই। বরং সময়ে চিকিৎসা না করাইয়া দেহ নষ্ট করিলে পাপ হইবে। যদি কেহ বলেন—"বিনা চিকিৎসায় প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইব না," তাহার উত্তর এই—ভগবানের দেওয়া দেহ স্বেচ্ছায় নষ্ট করিবার কাহারও অধিকার নাই। যোগ্য চিকিৎসক রোগীকে মাতৃজ্ঞান করে।

সাধারণতঃ ২৫ বৎসর বয়সের পর এবং ৫০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ক্যান্‌সার রোগ বেশীর ভাগ হইতে দেখা যায়; কিন্তু কখন কখন ইহার পরে কিম্বা পূর্ব্বেও এই রোগ আরম্ভ হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এদেশে ৪৫ বৎসর বয়স হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—এই সময়ের মধ্যে ঋতু একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। যদি কোন স্ত্রীলোকের এইরূপ ঋতু বন্ধ হওয়ার পরও প্রসবপথ হইতে পুনরায় রক্ত বা অন্য কোন প্রকার স্রাব হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে উপযুক্ত ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হইবে। প্রায়ই দেখা যায়, এরূপ ক্ষেত্রে ক্যান্‌সার রোগ জন্মিয়াছে।

শ্বেতস্রাব বা শ্বেতপ্রদর

(লিউকোরিয়া—Leucorrhœa)

কোন কোন স্ত্রীলোকের জরায়ু বা প্রসব-পথ হইতে তুষের মত সাদা, কিম্বা পূঁয ও শ্লেষ্মা, বা জলের ন্যায় স্রাব হইতে দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় এরূপ স্রাব হওয়া উচিত নয়। এই স্রাবের কারণ :—

(১) মেহ (গণোরিয়া, Gonorrhœa)

(২) ঋতুকালে তলপেটে ঠাণ্ডা লাগান বা অন্য কোন কারণে জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ (Inflammation)

(৩) গর্ভস্রাব বা প্রসবের পর জরায়ু দূষিত হওয়া।

(৫) জরায়ু, জরায়ুর মুখ বা প্রসব-পথে ক্যান্‌সার, গরমীর ঘা, 'আব' (টিউমার, tumour) বা অন্য কোন রোগ হওয়া।

(৫) পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, কালাজ্বর, অজীর্ণ, আমাশয় ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়া।

শ্বেতপ্রদরের চিকিৎসা

(১) উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া কারণ স্থির করিতে হইবে, নচেৎ আন্দাজে চিকিৎসা করান উচিত নয়। কারণ, যদি কোন কঠিন রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সময়ে ধরা না পড়িলে শেষে পস্তাইতে হইবে। রোগ স্থির করিয়া চিকিৎসক যে ব্যবস্থা করিবেন সেইমত চলিবে।

(২) প্রসব-পথ ডুস দ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কার রাখিতে হইবে। ডুসের জলের সহিত নিম্নলিখিত ঔষধগুলির যে কোন একটী ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(ক) ১/২ সের গরম জলে চায়ের চামচের ৪ চামচ (৪ ড্রাম) ফিটকারি (alum) বা জিঙ্ক-সালফেট (zinc-sulphate) বা সোডা বাইকার্ব্ব (Soda Bicarb)।

(খ) পটাস্‌ পারমাঙ্গানস্‌ (Pot. Permanganas)

(৩) সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার জন্য টনিক ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে—যথা, ইলিক্‌সির ভাইটো-গ্লিসিরোফস্‌ (Elixir Vito-gylcerophos), হিমাটো সারসা-প্যারিলা উইথ্‌ গোল্ড (Hæmato sarsa-parilla with gold), ফেলোজ সিরাপ (Fellow's Syrup) ইত্যাদি। এই সকল ঔষধ ছোট চামচের এক চামচ (এক ড্রাম) এক ছটাক জলের সহিত মিশাইয়া আহারান্তে দিবসে দুইবার খাইতে হয়। (ক্রমশঃ)

পতিতার কথা

শ্রীহরিপদ মহলানবীশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সমাজের ছোট খাট অত্যাচারের ফলেও যে কখন কখন মেয়েরা পাপের স্রোতে ভাসিয়া পড়ে, তাহার দৃষ্টান্তও দুর্লভ নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম, পশ্চিম বঙ্গের কোন এক জেলাবাসী রাঢ়ী শ্রেণীর এক বৃদ্ধ দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণ সঙ্গতি অভাবে কিছুতেই কন্যা দুইটির বিবাহ দিতে না পারিয়া ভগ্ন হৃদয়ে দেহত্যাগ করেন। অতঃপর সেই দুই কুলীন কুমারী কলিকাতায় আসিয়া হিন্দুত্বের ধ্বজা অর্থাৎ কৌলিন্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছিল। সপ্ততিপর বৃদ্ধ কিশোরী পত্নীর পাণি-পীড়ন করিয়া নূতন সংসার পাতাইতে না পাতাইতে, বৃদ্ধের নয়নমণি, বৃদ্ধকে উদ্বৃত্ত জীবনকালটুকু শোকে, দুঃখে ও অপমানে কাটাইবার অবাধ অবসর করিয়া দিয়া, প্রতিবেশী ইয়ারবাজ ছোকরাটির সহিত অন্তর্ধান করিয়াছে, এরূপ দৃশ্যও নিতান্তই বিরল নহে। কিন্তু আমাদের সনাতন সমাজ হুঁকা বন্ধ, শাপিত বন্ধ প্রভৃতি গুরুতর সামাজিক তথ্যের গবেষণায় এত নিবিষ্ট আছেন যে, এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার মত সময় তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে না।

গণিকাবৃত্তি সম্প্রসারণের মূলে সমাজের দায়িত্ব নিতান্ত লঘু না হইলেও, আরও এমন অনেক কারণে নারীরা এই ঘৃণিত পাপে লিপ্ত হয়, যাহার প্রতিকার সমাজের সাধ্যায়ত্ত নহে। পতিতা-সমস্যা লইয়া যাঁহারা বিন্দুমাত্রও মাথা ঘামাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বড় বড় সহরে অনেক নীচাশয় পুরুষ ও নারী লাঞ্ছিত নারীত্বের দোকান-দারি করিয়া থাকে। ইহারা ছলে বলে কলে কৌশলে কতকগুলি রমণীকে করতলগত করে, এবং তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, তাহাদিগেরই স্বাস্থ্য ও মনুষ্যত্ব বিক্রয়লব্ধ অর্থে আত্মোদর পূরণ করে। শরীরে সামর্থ্য থাকুক না থাকুক, ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, মনিবের অলঙ্ঘনীয় আদেশে ক্রীতদাসীদিগকে লম্পটের কামানলে নিজেদের আহুতি দিতে অনুক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হয়। ফলে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অচিরেই তাহারা যৌবনশ্রী হারাইয়া ফেলে, এবং পরিত্যক্ত হইয়া অর্দ্ধমৃতবৎ জীবন যাপন করে। সাধারণতঃ ব্যবসায়ে নূতন ব্রতিনী কুলত্যাগিনীরাই আশ্রয়ান্তরাভাবে এই হিংস্র জন্তুর কবলে পতিত হয়। এই সকল শৌণ্ডিক ব্যবসায়িদিগের অনুচরেরা শিকারের অন্বেষণে ঝি চাকরের ছদ্মবেশে অবাধে সমাজের বুকে বিচরণ করিয়া থাকে। কত শত শিশু ও বালিকা যে ইহাদের পাপ হস্তের খেলনায় ভুলিয়া, মাতৃ-অঙ্ক শূন্য করিয়া শৌণ্ডিকালয়ে স্থানলাভ করিয়াছে, শ্বশুর গৃহে অনাদৃতা লাঞ্ছিতা কত সরলা কিশোরী যে ইহাদের প্ররোচনায়, হীরা জহরৎ, গাড়ী ঘোড়া ও অনন্ত প্রেম-সুধার লালসায় গৃহত্যাগ করিয়া নরককুণ্ডে আশ্রয় লইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সত্য কি মিথ্যা নির্ণয় করিবার উপায় নাই, কিন্তু এমনও শুনা গিয়াছে যে, বদ্‌মায়েস গাড়োয়ান আরোহিনীকে গন্তব্য স্থানে না পৌঁছাইয়া, সোজাসুজি গণিকা-পল্লীতে লইয়া গিয়া রাক্ষস রাক্ষসীর হাতে তুলিয়া দিয়াছে।

বড় বড় সহরে কল কারখানা বিস্তারের ফলে যে সকল অবশ্যম্ভাবী অনর্থ সমাজে প্রসার লাভ করে, ব্যভিচার তাহার কোনটার অপেক্ষা কম আশঙ্কাজনক নহে। সাধারণতঃ যে শ্রেণীর লোক কলকারখানায় মজুরি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদের নিকট উচ্চ ভাব, উচ্চ চিন্তা, আশা করা দুরাশা বই আর কিছু নহে। তাহার উপর অধিক সংখ্যক পুরুষ ও অল্প সংখ্যক নারী, অনর্গল অশ্লীল অশ্রাব্য গালাগালির সহিত, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া, সন্ধ্যাকালে তাড়ির দোকানে হল্লা করিয়া, নীতিশাস্ত্রটা অমনি নেহাৎ হাল্‌কা করিয়া

ফেলে। তার পর বিভোর হইয়া টলিতে টলিতে কবুতরের খোপের মত কুঠুরীতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা যে ঘোর দুর্নীতির স্রোত বহাইয়া থাকে, তাহা স্মরণ করিলে বিশ্ব-বিশ্রুত অজজাতিরও গণ্ডদেশ বোধ হয় লজ্জা-রাগ-রক্তিম হইয়া উঠে। শুনিয়াছি, কুলী সর্দ্দারণীকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া কোন কোন তথাকথিত ভদ্র কেরাণী বা অন্য উপরওয়ালারাও সময় সময় প্রিয়দর্শনা নারী-মজুরের সদ্ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করেন না! কলকারখানার অনেক শ্রমিকারাই যে নিশাকালে বারবণিতা, তাহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ধনিক বা মালিকদিগের এই সব অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হয় না; কারণ, শ্রমিকদিগের নৈতিক অবস্থার সহিত তাঁহাদের যাথ্যাসিক ডিভিডেণ্ডের কোনই সম্বন্ধ নাই।

মানব-হৃদয়ের অন্তর্নিহিত পাশববৃত্তিও যে সময় সময় নারীর অধোগতির কারণ হয়, তাহাও খুবই সত্য। চৌর্য্যাপরাধে যত লোক দণ্ডিত হয়, তাহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকিতে পারে এবং আছে, যাহারা কেবল উপায়ান্তর না পাইয়া জঠরজ্বালা নিবৃত্তির জন্য চুরি করে। কিন্তু এমন লোকও ত যথেষ্ট আছে, যাহারা সৎপথে থাকিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারিলেও, কেবল চুরির খাতিরেই পরস্বাপহরণ করে। গণিকাবৃত্তি যাহারা অবলম্বন করে, তাহাদের অনেকেই দশচক্রে ভগবান ভূত হইলেও, এমন কতক পাপীয়সীও আছে, যাহারা কেবল পশুভাব-প্রণোদিত হইয়াই কুলের বাহির হয়। এমন দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে যে, দেবপ্রতিম পতি, সোণার চাঁদ সন্তান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সংসার পরিত্যাগ করিয়া কলঙ্কিনী কলঙ্ক-সায়রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে এতই কম যে, ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। এইরূপ স্থলে প্রতীকারের ক্ষমতা মানুষের নাই; সুতরাং ঐ সকল কুলটাদিগের উদ্দেশে আফ্‌শোষ করা, এবং পরজন্মে যেন তাহাদের সুমতি হয় তাহাই প্রার্থনা করা ব্যতীত আমাদের আর কিছু করিবার থাকে না।

পতিতার উদ্ধারকল্পে আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন প্রযত্ন করা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। কিন্তু ব্যাপারটা যতই চক্ষুলজ্জার (delicate) হউক না কেন, আমাদের প্রসুপ্ত সমাজের এ বিষয়ে অচিরে চৈতন্যোন্মেষ হওয়া আবশ্যক। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নৈতিক শৈথিল্যের বাস্তব বা কাল্পনিক ইতিহাস অতিরঞ্জিত করিয়া, আমাদের বিশুদ্ধ চরিত্রের বড়াই করিলে চলিবে না। বাংলা দেশের বড় সহর কলিকাতা, ঢাকা, এবং জিলাগুলির সদর ষ্টেশনের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; গণ্ডগ্রামের হাট বাজারের অনেক-গুলিতে পর্য্যন্ত পতিতা-পল্লী দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাংলা দেশের অর্দ্ধাধিক অধিবাসী অহিন্দু হইলেও, পতিতাদিগের প্রায় সকলেই হিন্দু-নামধারিণী, এবং হিন্দুর আচার ব্যবহার পুরাপুরি না হইলেও আংশিকভাবে পালন করিয়া থাকে। সুতরাং উহারা যে হিন্দু-সমাজেরই পিঞ্জরমুক্ত পোষাপাখী, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন গুরুতর হেতু নাই। হিন্দুর এই ঘোর কলঙ্ক হিন্দুকেই দূর করিতে হইবে। গণিকাবৃত্তির ফলে আমাদের সমাজের সুনামই যদি কেবল কলঙ্কিত হইত, এই দুর্নীতি যদি সমাজের জীবনীশক্তির হানিকর না হইত, তবে না হয়, যে দুর্ভাগ্য আত্মীয়স্বজনের মুখে চূণকালি দিয়া হতভাগিনীরা গৃহত্যাগ করে, নিশ্চিন্ত মনে তাহাদের কুৎসাচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া তামসিক আনন্দে কাল কাটাইতাম। কিন্তু সমাজ হইতে যত দূরেই পড়িয়া থাকুক না কেন, উহারা যে সমাজের বায়ু বিষাক্ত করিতেছে, এই অতিবড় সত্যটী, যাহারা জাগিয়া না ঘুমায়, তাহাদেরই দৃষ্টিগোচর হইবে। পনর আনা সতী-সাধ্বী পতিপ্রাণা গৃহস্থ বধুর ক্ষুন্নার অন্ন মিলে না, লজ্জা নিবারণের বসন জোটে না; কিন্তু কুহক-বিদ্যায় পটিয়সী হইলে, নৃত্য ও সঙ্গীতে একটু দখল থাকিলে, বা দৈহিক লাবণ্যের কণামাত্র আভা থাকিলে, পতিতার প্রাসাদোপম গৃহ, রাজনন্দিনীর ঐশ্বর্য্যস্পর্দ্ধী বসন ভূষণ এবং তদনুযায়ী যান বাহনের অভাব হয় না, যদিও গৃহত্যাগ করিবার সময় এক বস্ত্র সম্বল করিয়াই ইহাদিগকে আসিতে হয়। কোন্ আশ্চর্য্য প্রদীপের ভৌতিক ক্ষমতা-বলে ইহাদের অতুল বৈভব দেখিতে দেখিতে গজাইয়া উঠে? এ সবই ত আমাদের অমানুষ ভালমানুষেরা সরবরাহ করিয়া থাকেন। প্রকাশ্যে বারবিলাসিনী সেবা করিয়া যাহারা মার্কা-মারা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা কত? অথচ সংখ্যাতীত নিষ্কর্ম্মা মক্ষিরাণীই ত উৎকট

বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতেছে। বাস্তবিক সমাজের একটা বিরাট অংশ চোরাগোপ্তা ভাবে নৈতিক হিসাবে কতদূর যে অধঃপতিত, তাহা ভাবিতেও লজ্জায় লাল হইতে হয়—আতঙ্কে শিহরিতে হয়। স্কুলের কিশোর ও কলেজের নবীন যুবা হইতে আরম্ভ করিয়া ধবলকেশ যষ্টিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত তাবৎ বয়সের শিক্ষিত ও নিরক্ষর, নিঃস্ব ও সঙ্গতিসম্পন্ন কত পুরুষই না কুহকিনীর কুহক-জালে আবদ্ধ হইতেছে। অধিক দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই কপর্দ্দকশূন্য হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বৃশ্চিকদংশন যাতনায় অধীর হইতেছে বা ব্যভিচারের অপরিহার্য্য ফল উপদংশাদি অশ্লীল মারাত্মকব্যাধি স্বকীয় দেহে আহ্বান করিয়া প্রথমে পত্নী এবং পরে ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের মধ্যে সংক্রামিত করিতেছে। সমাজের এই করুণ ও অশ্লীল দৃশ্য আর বর্ণনা না করিলেও চলিবে।

সমগ্র বঙ্গদেশে যে বহু সহস্র বারবণিতা আছে, তাহাদিগকে সমাজবৃক্ষের জীবন-রসশোষক পরগাছা ব্যতীত আর কি নামে অভিহিত করিব? ইহাদের দ্বারা সমাজের সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে; কিন্তু এই সর্ব্বনাশও সমাজকে কত উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে হইতেছে! আমাদের দেশে পেশাদারি ভিক্ষুকের সংখ্যা অবশ্যই কম নহে, কিন্তু বারবিলাসিনীদিগের পাছে সমাজের যে অপব্যয় হয়, তাহার তুলনায় ভিক্ষোপযোগী কুপোষ্য পালনে সমাজের অতি অল্পই অপচয় হইয়া থাকে। আমাদের মত দরিদ্র সমাজের এতগুলি স্বার্থ বিষবৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালিতে ব্যয়িত হওয়া বড় আশার কথা নহে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, মনুষ্যত্বহীন বারনারী-পদলেহীর অপটু দেহ ও পাপিষ্ঠ মন হইতে দেশ কতটুকু সেবার আশা করিতে পারে? সভ্যতার বহির্ভূত যাহারা, মানুষের আকারে পশুর প্রকৃতি যাহাদের, তাহাদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। বাকী বেশ্যাবিলাসী, রোদনবল, বিহ্বলচিত্ত, নারীভাবাপন্ন, লক্ষ্মীছাড়া পুরুষগুলিই বা কি? উহারা তবলা বাজাইতে পারে, টপ্পা গাইতে পারে, বাইজীর নৃত্যের নির্লজ্জ অনুকরণ করিতে পারে, চেষ্টা করিলে কেহ কেহ বা দুই এক কলি কবিতাও লিখিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু দেশ আজ যে ভীমকর্ম্মা নরশার্দ্দূলকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছে, ইহারা কদাচ সেই আহ্বানে উত্তর দিবে না। এমন কি নিরীহ ভালমানুষটির মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতাও ইহাদের নাই। তাহারা অপদার্থ নির্লজ্জ জীবন যাপন করিবে, এবং তাহাদেরই মত এক দল কিম্ভূতাকার জীবের সৃষ্টি করিয়া সংসারের ভার বাড়াইবে।

অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, শিক্ষার অভাবে নারী-জাতি পাপের ব্যবসা অবলম্বন করে; সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার হইলে দেশে বারবণিতার সংখ্যাও হ্রাস পাইবে। কিন্তু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ব্যভিচার যে অন্যায়, গণিকাবৃত্তি যে পাপ, এই সহজ সরল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিতে কি কোন কিতাবী শিক্ষার প্রয়োজন হয়? নিরক্ষর রমণীরাও কি ব্যভিচার গর্হিত বলিয়া মনে করে না? দেশের নারী-জাতির মধ্যে শিক্ষার একান্ত অভাব বলিয়া, যে সকল বিপথগামিনী নারী পাপ পথ অবলম্বন করে, তাহাদের মধ্যে হয় ত নিরক্ষরের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু লেখাপড়া জানা পুরুষের মধ্যে যেমন অসচ্চরিত্রের অভাব হয় না, তেমনি অসৎপথে যাইবার নিমিত্ত লেখাপড়া জানা নারীরও অভাব হয় না। যে উচ্চাঙ্গের গরীয়সী শিক্ষার আলোকে নর নারীর মনের সমস্ত কালিমা দূর হইয়া যায়, তাহা লাভ করা কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গণিকাবৃত্তিধারিণী যে জননী ও তনয়া একটি অসহায়া সধবা যুবতীকে অপহরণ করিয়া তাহাদেরই অনুগ্রহভাজন কোন গুণ্ডা কর্ত্তৃক তাহার প্রতি পাশবিক উৎপীড়ন করাইবার অপরাধে অভিযুক্তা ও দণ্ডিতা হইয়াছিল, খবরের কাগজ পড়িয়াছিলাম, তাহারা জনৈক খ্যাত-নামা স্বর্গগত সাহিত্যিকের পত্নী ও কন্যা, এবং তাহারা নিজেরাও নাকি উচ্চশিক্ষিতা। এই দুইটি রমণীরত্নই যে উহাদের জাতীয়া শিক্ষিতা বারনারীর একমাত্র উদাহরণ তাহা নহে; অমন শিক্ষিতা বারবণিতার এ দেশে অভাব নাই। আমাদের দেশে সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কেবল বারবণিতারাই জিয়াইয়া রাখিয়াছে। লিখন-পঠনক্ষম না হইলে,—কোন কোন স্থলে লিখন-পঠনে দস্তুর মত অভিজ্ঞ না হইলে, এই দুইটি সুকুমার কলায় পারদর্শিতা লাভ করা যায়, এমন নহে। হইতে পারে কুলের বাহির হইয়া আসিবার পরে উহাদের অনেকে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া থাকে, হইতে পারে উহাদের কেহ কেহ বারনারীরই গর্ভজাত, মায়ের

গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া উহাদিগকে লেখাপড়া শিখায়। কিন্তু সকলের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না।

এই সৃষ্টিছাড়া সমাজের বিচিত্র নিয়ম কানুনের এমনই দুর্জ্ঞেয় রহস্য যে, কখন্ কোন্ বিচার-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া, কোন্ মামলার কিরূপ নিষ্পত্তি করে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র। কোন্ মনোবৃত্তির প্রভাবে সমাজ-পতিরা বিভ্রান্তা স্খলিত-চরণা রমণীদিগকে উদ্দাম পাপ-জীবনে পাঠাইয়া দেন, তাহা না হয় বুঝিলাম। কিন্তু সেই পাপীয়সী পতিতার সহ-দুষ্কর্ম্মীরা—বেশ্যাগমন করিয়া কেন সমাজে পতিত হয় না, তাহার যুক্তিসঙ্গত উত্তর কে দিবে? এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কন্যার পাণি-গ্রহণ করিলে পতিত হন, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ যে কোন জাতীয়া এমন কি মুসলমানী বারবণিতার সংসর্গ করিলেও তাঁহার জাতি-চ্যুতি হয় না কেন? অর্থলোভী গোস্বামী মহাশয়েরা মন্ত্রদানোপলক্ষে পাতকীর সংস্রবে আসিলেও সমাজে তাঁহাদের সম্ভ্রমহানি হয় না কেন, ইহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন কে করিবে? কোন্ ত্রিকালদর্শী মহাঋষিরচিত শাস্ত্রের অনুমোদনে ঢাকা অঞ্চলে ঝুলননাত্রা উপলক্ষে এবং বঙ্গ-দেশের সর্ব্বত্র দুর্গাপূজা প্রভৃতি ধর্ম্মোৎসবে, বিবাহ, অন্নারম্ভ প্রভৃতি সামাজিক উৎসবে যুবাবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে পুরুষেরা, বিভিন্ন বয়সের পুরমহিলারা এবং উপাধিধারী টোলের পণ্ডিতেরা ভদ্র লোকের গৃহে সুরাবিলাসিনী বাইজীর অঙ্গভঙ্গিমোল্লাসিত নৃত্যগীতে পরম তৃপ্তির সহিত চিত্ত বিনোদন করেন, অথবা কবিওয়ালী ঢপওয়ালীর গান শুনিয়া বাহবা দিয়া থাকেন, তাহা বুঝিতে পারে, কাহার সাধ্য? যখন কোন নারী বয়সের দোষে ভুল করিয়া বসিল বা অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে আততায়ীর হস্তে লাঞ্ছিতা হইল, তখন যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়া তাহাকে ধ্বংসের পথে পাঠান হইল। তার পর শয়তানি কারসাজিতে যখন সে পুরাপুরি ওস্তাদ বনিল, তখন সমাজ তাহাকে অর্থ ও উৎসাহ দিয়া দুর্নীতি প্রচারে তাহার আনুকূল্য করিতে থাকিল। ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত বিচার-মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠাই বটে। আত্মহত্যার এক অদ্ভুত সংস্করণ।

আমাদের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া যদিও হতভাগিনীরা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে, তাই বলিয়া, সঙ্গে সঙ্গে যে তাহারা দয়া মায়া স্নেহ প্রভৃতি নারীসুলভ চিরন্তন কোমল হৃদয়বৃত্তিগুলিও বিসর্জ্জন দেয় তাহা নহে। শরৎ বাবুর কল্পিতা পিয়ারী বাইজীর ক্ষুধিত মাতৃত্ব যে অফুরন্ত বাৎসল্যে সপত্নী-পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল, তাহা নিছক ঔপন্যাসিকের কল্পনা না-ও হইতে পারে। 'বাবু'র বিপত্তিকালে কোন কোন বারবণিতা যে ছার অর্থালঙ্কার ত দূরের কথা নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাও অনেকের জানা থাকিতে পারে। রাজ-নৈতিক আন্দোলনের সময় দেখিয়াছি, দেশের সম্বন্ধে, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলেও, এটা যে আমাদের দেশের ভালর জন্যই একটা কিছু, তাহাই বুঝিয়া লইয়া, গণিকারাও কোথাও কোথাও হুজুকে মাতিয়াছিল। তাহাদের হুজুকটা নির্জ্জলা হুজুক ছাড়া আর কিছু না-ও হইতে পারে; কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনা হইতেও তাহাদের চরিত্রের একটা দিক বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। গণিকাদিগের কেহ কেহ সারা জীবনের পাপের ধন মৃত্যুকালে লোক-সেবায় দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, তাহাও শুনিয়াছি। ছবিতে দেখিয়াছি জনৈক বর্ষীয়সী পতিতা রমণী কি গভীর ভক্তিভরেই না হরিনামের মালা জপিতেছেন। গলিত-খর-নখর-দন্ত বিড়াল-তপস্বী বলিয়া যাহার খুসী ইঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে পারে, ইঁহার ভক্তি-প্রীতি-দীপ্তি-ময়ী মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া আমার কিন্তু যে কোন উপাসনারতা পিতমহীর কথাই মনে পড়ে। শুনিয়াছি গৃহস্থ-ঘরের পিসীমা দিদিমার মত গণিকারাও তীর্থ-ধর্ম্ম করিয়া থাকে। মানিলাম, সকলে হয় ত অকৃত্রিম ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত না-ও করিতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ ত করে। সুযোগ পাইলে, অধিকার থাকিলেও এই শ্রেণীর গণিকাদের অন্ততঃ কেহ কেহ যে সমাজে প্রত্যাগমন করিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? গোপন অন্তরে আমরা যতই স্তূপীকৃত পাপরাশি বহন করিয়া বেড়াই না কেন, আমরা নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ; কারণ আমাদের অন্তরটা পরখ্ করিয়া দেখিবার মত এক্স-রে (X-ray) আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ওদের নিস্তার নাই। আজকাল আর যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন না, সুতরাং মেরী মাগ্‌ডালিনীর উদ্ধার সাধন হয় না; সন্ন্যাসী উপগুপ্তও আর নাই, সুতরাং মথুরার সেই বারনারীরও পরিত্রাতা কেউ নাই। আমরা

কিন্তু ভুল-ভ্রান্তির অপরাধে স্ত্রী পুরুষের নিমিত্ত চিরকালই এইরূপ বিচার-বৈষম্যের ব্যবস্থা করি নাই। প্রাচীন ভারতের যে পাঁচটি রমণীর নাম প্রাতঃকালে স্মরণ করিলে মহাপাতক নাশ হয় বলিয়া আমাদের পণ্ডিতেরা ফতোয়া দিয়াছেন, আধুনিক ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য তাঁদের হইলে, কেহ আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া সমাজের বাহিরে কলুষ-পল্লীতে অবস্থান করিতেন, কেহ বা আমরণ ধোপা-নাপিত-বন্ধ হইয়া একঘরে হইয়া থাকিতেন। মৃত্যুর পর পাতিত্যের ভয়ে কেহ তাঁহাদের শবও স্পর্শ করিত না। প্রাতঃকালে তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করা ত দূরের কথা, দৈবাৎ শ্রুতি-গোচর হওয়া মাত্র "রাম রাম" করিয়া আমরা তর্জ্জনীর সাহায্যে কর্ণরন্ধ্র রুদ্ধ করিতাম!

আগত রোগের প্রশমন চেষ্টা অপেক্ষা অনাগত ব্যাধির আক্রমণ সম্ভাবনাটা দূর করাই অধিক বুদ্ধিমত্তার কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক ব্যাপারের ন্যায় পতিতা-সমস্যার মত দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াও আমরা এই সত্যটা ভুলিয়া যাই। সুতরাং দেখিতে পাই, কোন কোন অতিরিক্ত উৎসাহী সমাজ-শোধক, পতিতা বিদ্বেষে অসহিষ্ণু হইয়া, সমাজের এই আবিলতা দূরীকরণ মানসে, পতিতার বিরুদ্ধে কঠোর রাজবিধি প্রণয়নের পক্ষপাতী। প্রতিহিংসা-মূলক আইনে যদি পতিতা ও পাতিত্য-সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত, তাহা হইলে ভাবনার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আইন করিয়া কি কোন দিন দুষ্কৃতি-স্রোতের গতি রোধ করা যায়? জাল জুয়াচুরি, নরহত্যা প্রভৃতি পাপের বিরুদ্ধে কত না কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া দুষ্কৃতেরা কি অন্যায় অনুষ্ঠানে বিরত হয়? এক দিকে সমাজদণ্ড এবং অপর দিকে রাজদণ্ড, দুইদিক হইতে এই দুইটির প্রচণ্ড দণ্ডাঘাতে বারবণিতাদিগের মাথার খুলি চূর্ণ করিয়া দিতে চাহিলে, পরোক্ষভাবে, জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত তাহাদিগকে গোপনে আরও অধিক অন্যায়াচরণে উৎসাহ দিয়া, সমাজের প্রভূত অকল্যাণই সাধন করা হইবে। সুতরাং পতিকাদিগের বিরুদ্ধে কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে, সৎপথে প্রত্যাগমনেচ্ছু বারবণিতাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত সমাজ বা সরকার হইতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। দুর্নীতির উচ্ছেদ কল্পে কঠোর রাজবিধি শক্তি সামর্থ্য অনুসারে যাহাই করুক না কেন, উহা কেবল গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিবার মতই হইবে। কারণ, পতিতার সৃষ্টি-স্থায়িত্ব এবং সংখ্যা-বৃদ্ধি অনেকটা সমাজেরই হাত। যত দিন না সমাজ এ বিষয়ে অবহিত হইবে, যত দিন না সমাজ বুঝিবে, ঘুণে ধরা জীর্ণ রীতি-নীতি গুলিকেও মরণ কামড়ে কামড়াইয়া ধরা এক্ষেত্রে অন্ততঃ আত্মহত্যারই সামিল, তত দিন এই অনর্থ উৎপাটিত হইবে না। দুর্নীতি উচ্ছেদের মহান্ সঙ্কল্প লইয়া, বর্ত্তমান পতিতাদিগকে পীড়ন করিবার প্রয়োজন যতটা, ভবিষ্যতে আর কেহ যাহাতে এই ঘৃণিত পাপের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে না পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা, তদপেক্ষা অনেক বেশী আবশ্যক। তাহা করিতে হইলেই সবার আগে তাক পড়িবে সমাজের,—পুলিশ বিভাগের নহে।

পরিশেষে ষ্টেড্ সাহেবের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলিতেছি—'যত দিন মানুষের মনে অবৈধ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার স্পৃহা জাগরূক থাকিবে, যত দিন মানুষ পরদারগমনও অগম্যাগমনের মতই মহাপাতক বলিয়া জ্ঞান না করিবে, তত দিন সমাজ-দেহের এই পচ্যমান ক্ষত একেবারে নিরাময় হইবে না। কিন্তু সমাজ একটু উদার মত অবলম্বন করিলে পতিতা-সমস্যা বহু পরিমাণে সরল হইতে পারে। সমাজ যখন ততটুকু উদারতা, ততটুকু মনুষ্যত্ব দেখাইতে কার্পণ্য করিতেছেন, তখন পাপ-স্রোতও খরবেগে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। প্রতীকারের উপায় হাতের কাছে থাকিতেও তাহা ব্যবহার না করিলে কাহার প্রতি দোষারোপ করিব?*

* এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর, লাটসাহেবের সভাপতিত্বে Calcutta Vigilance Associationএর তরফ হইতে যে সভা আহূত হইয়াছিল, সেই সংবাদ পাইয়াছি। এই Associationএর উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।—লেখক

যশোদা-জীবন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মহম্মদ আবদার রহমান চঘ্‌তাই

B. H. P. Works.

রাজগী !

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(১৩)

সত্য সত্যই নরকে ডুবিলাম। কেহই আমাকে ঠেকাইতে পারিল না। মা সাবিত্রীকে লইয়া আসিলেন। মা কান্নাকাটি করিলেন, সাবিত্রী শাসন করিল, ধর্ম্মের ভয় দেখাইল, সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা দেখাইল, আমাকে দেশে লইয়া যাইতে চাহিল, আমি অটল অচল হইয়া রহিলাম।

মায়ের কাছে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস হইল না ; কেবল মুখ বুজিয়া মাথা নীচু করিয়া সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব অসহযোগের জোরে তাঁহার সব চেষ্টা ব্যর্থ করিলাম।

সাবিত্রী যখন বেশীরকম উৎপাত আরম্ভ করিল, তখন আমি তাহাকে বলিলাম, "থাম, থাম। সার দিয়ে বীজ বুনে' গাছ দেখে মূর্চ্ছা গেলে চলবে কেন? তোমরা যে কোমর বেঁধে আমার ভাল ক'রতে লেগেছিলে, এই তো বেশ দিব্যি ভাল ক'রেছ। আনন্দ কর! রাগারাগি কেন? নরেন বাবু আমায় মানুষ ক'রে তুলেছিলেন প্রায়, সে তোমাদের সইলো না। আমার ভালর জন্য তাঁর হাত থেকে আমায় বের করে নিলে, দরখাস্ত করে আমার নাবালগী বাড়িয়ে নিলে, আমার ভাল ক'রবে বলে'। এখনো কি মনে হ'চ্ছে না যে খুব ভাল ক'রেছ? এখন আমায় রেহাই দেও পেত্নী ঠাকরুণ, আর ভালোয় কাজ নেই, এখন আমার কাঁধ থেকে নামো।"

সে গর্জ্জিয়া উঠিল, আমাকে তীব্রভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল। গলা ছাড়িয়া সে পাড়ার লোক জানাইয়া আমাকে গাল দিতে লাগিল। আমার মাথায় খুন চাপিয়া গেল। আমি বলিলাম, "বেরোও এখান থেকে, বেরোও বলছি।"

"ঈস! ভারি তেজ দেখছি! সাবিত্রী বামণী সে মেয়ে নয় যে, তোমার চোখ রাঙানিতে ডরাবে। উঠছো যে বড়! চুপ করে' বসে আমার কথা শোন, নইলে ভাল হ'বে না বলছি। আজ তোমার কোথাও বেরোন হ'বে না, আজ রাত্রেই বাড়ী যেতে হ'বে।"

"বটে? তোমার হুকুম না কি?"

"আমার হুকুম। জান আমি তোমার সহধর্ম্মিণী—তোমার ধর্ম্মাধর্ম্মের জন্য আমি দায়ী।"

"ঢের ঢের ধর্ম্ম দেখেছি, তুমি এখন বেরোও।"

গর্জ্জিয়া সাবিত্রী বলিল, "ফের! আমাকে কি তোমার ঝি পেয়েছ না বিধু পেয়েছ যে বেরোও বেরোও করছো। মুখ সামলে কথা কয়ো' বলছি।"

আমি এই তিরস্কারে ক্রোধে অন্ধ হইলাম। ধাঁ করিয়া উঠিয়া প্রবল মুষ্টিতে এক হাতে সাবিত্রীর হাত ও আর এক হাতে তার গলা ধরিয়া, তাহাকে হিড় হিড় করিয়া ঠেলিয়া ঘর হইতে বাহিরে লইয়া, খুব জোরে একটা ধাক্কা দিলাম। ধাক্কার চোট সামলাইতে না পারিয়া সে সামনে সিঁড়ির উপর গিয়া পড়িল ও সিঁড়ি দিয়া গড়াইতে গড়াইতে অনেকটা দূর পড়িয়া গেল। তার নাক দিয়া রক্ত ছুটিল। চারিদিক হইতে সবাই আসিয়া তাহাকে ধরিয়া উঠাইল।

আমি ঘরে ফিরিয়া দুয়ার বন্ধ করিলাম। আমার মনটা ভারি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সাবিত্রীর উপর এতটা বল প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না ; আর তাহাকে কোনও রকম আঘাত করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। রাগের মাথায় আমি যাহা করিয়া ফেলিলাম, রাগের ঝোঁক থাকিতে থাকিতেই বুঝিলাম যে, সেটা ভয়ানক অপকর্ম্ম। শক্তিমান পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলা যে কতটা নীচতা ও কাপুরুষতার কাজ, সে কথা নরেন বাবুর শিক্ষায় আমার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। কাজেই তীব্র অনুশোচনায় আমার প্রাণ জর্জ্জরিত হইল।

আমি আমার দুয়ারে খিল দিয়া দুই হাতের ভিতর মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিলাম।

আমি ভাবিলাম, কোথা হইতে কোথায় নামিয়া আসিয়াছি আমি। দুই বৎসর আগে নরেন্দ্র বাবু আমাকে

তাঁহার সমাদরের যোগ্য মনে করিয়াছিলেন, তাঁর কাছে আমি গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করিবার উৎসাহ পাইয়াছিলাম। আর আজ এই দুই বৎসরের মধ্যে আমি পানাসক্ত হীনাচারী লম্পট হইয়া পড়িয়াছি। বিধুকে পাপে ও বিলাসে ডুবাইয়া তাহাকে একরকম নিরাশ্রয় রাখিয়া আমার ঔরসজাত পুত্রের সহিত পরিত্যাগ করিয়াছি; পাপাচারের সীমা রাখি নাই। আর আজ আমি স্ত্রীকে মারিয়াছি। বস্, আর কোন পদ বাকী রহিল। সাবিত্রীকে লিখিয়াছিলাম, দ্রুতপদে নরকে যাত্রা করিয়াছি—সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

আমার প্রত্যেকটি অপকার্য্য বিষমাখা ছুঁচের মত বুকের ভিতর অবিরত ঘা দিতে লাগিল। বুকটা ফাটিয়া যাইতে চাহিল। অনেকক্ষণ থাকিয়া থাকিয়া শেষে আমি বালিসে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মাথা ঝাড়িয়া উঠিলাম। দেয়ালের গা আলমারী খুলিলাম। যেখানে আমার হুইস্কীর বোতল থাকিত, সেখানে তাহা নাই। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, সাবিত্রী কোনও ফাঁকে সেটা সরাইয়াছে। আমি মদের জন্য একটা প্রচণ্ড তৃষ্ণা অনুভব করিতেছিলাম। সামনে হুইস্কির বোতল না পাইয়া একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলাম।

কোনও রকম হৈ চৈ না করিয়া আমি কাপড় চোপড় বদলাইয়া বাহির হইয়া গেলাম। সদর দরজার কাছেই দেখা হইল দেওয়ানজীর সঙ্গে। আমি বলিলাম, "দেওয়ানজী, আমার সঙ্গে একটু বেড়াতে যাবেন চলুন।"

বৃদ্ধকে লইয়া আমি রাস্তায় একখানা গাড়ী ডাকিয়া চড়িলাম। গাড়ীর ভিতর বসিয়া তাহাকে বুঝাইলাম যে, আমার নাবালকী প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এখন আর আমাকে খুন না করিয়া কোনও মতেই সম্পত্তির দখল ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমাকে খুন করিবার কোনও প্রকার মতলব তাঁদের আছে কি না।

দেওয়ানজী ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, এ কি রকম কথা ব'লছেন।"

দেওয়ানজী এবার আমাকে "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমার সম্পত্তি পাইতে আর কয়েকমাস মাত্র দেরী আছে। তার পর তাঁর চাকরী থাকা না থাকা আমার হাত। কিন্তু আমার দেশে গিয়া রাজগী করিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। আমি স্থির করিয়াছি, কলিকাতায়ই বাস করিব। দেওয়ানজী যদি এখন আমার কথা শোনেন, তবে ভবিষ্যতেও ঠিক এখনকার মতই কর্ত্তৃত্বভার পাইয়া থাকিবেন।

দেওয়ানজী এ সব কথা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; এবং স্বীকার করিলেন যে, মনোহর সার কাছে সব দেনা তিনি শোধ করিয়া দিবেন; এবং আমি যখন যে টাকা চাহিব, কোনও সোর গোল না করিয়া তাহা দিবেন।

বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আমি দেওয়ানজীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া গাড়ী ছুটাইয়া চলিলাম। আমার মনের ভিতর প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছিল। দারুণ বেদনায় আমার হৃদয় অবসন্ন ও পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। এই কথা ভাবিয়া আমার মনটা একদম ভাঙ্গিয়া পড়িল যে, আমি একেবারে অধঃপাতে গিয়াছি। কি ছিলাম আমি, নরেন বাবুর কাছে কি সব উচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াছিলাম, কত মহৎ কামনা আমার হৃদয় মাতাইয়া তুলিয়াছিল। আজ কোথায় সে সব? সব ভাসিয়া গিয়াছে।

এখনকার জীবনের কথা ভাবিতে আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। কি করি আমি? সকাল বেলায় দশটার সময় ঘুম হইতে উঠি। তার পর চা খাইয়া পড়িয়া থাকি। উঠিয়া স্নান করিয়া দুটি খাই। তার পর আবার ঘুম। বৈকালে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া খাই দাই। তার পর বাহির হইয়া যাই। রাত্রে কখন কি অবস্থায় বাড়ী ফিরি, কোনও দিনই তা' জানিতে পারি না। কি ক্লান্তিকর আলস্য! ভাবিতে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল। এমনি করিয়াই কি দীর্ঘ জীবন কাটাইব? জীবন লইয়া কি এর চেয়ে বেশী ভাল কিছুই করিব না কোনও দিন?

এ কথা আগে ভাবিলে হয় ত আমার ফিরিবার পথ ছিল, হয় তো আমি তাহা হইলে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া নূতন করিয়া জীবন গড়িতে পারিতাম। কিন্তু এখন আমার মনে হইল সেটা অসম্ভব। আমার নিজের উপর আমার কোনও শক্তি নাই, কোনও রূপে আমি আপনাকে এই জীবন হইতে টানিয়া তুলিতে পারি না। এখন এ সব

কথা ধ্যান করা কেবল অনুশোচনায় ডুবিয়া যাওয়া বই অন্য ফল প্রসব করিতে পারে না। এই তো এত অনুতাপ আমার হইতেছে; তবু আমি চলিয়াছি ঠিক সেই নরকেরই দিকে, যাহা আমাকে এত নীচে নামাইয়া আনিয়াছে। আমার সমস্ত শরীর তীব্র ভাবে সুরার কামনা করিয়া আমাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। আমার আর আশা নাই। কাজেই মদে ডুবিয়া থাকা ছাড়া আমার আর অন্য গতি নাই। এ পৃথিবীতে কত লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন যেমন বৃথাই বহিয়া যাইতেছে, আমারও জীবন সেই ব্যর্থ জীবন-স্তূপের ভিতর মিলাইয়া যাইবে, কেহ তাহা খুঁজিয়া পাইবে না।

আমি গাড়োয়ানকে জোরে চালাইতে বলিলাম। বিলম্বে আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। বুকের ভিতরের এ বৃশ্চিক জ্বালা নিবারণের জন্য আমি ক্ষেপিয়া উঠিলাম।

গন্তব্য স্থানে আসিয়া আমি গাড়ী বিদায় দিলাম। এ বাড়ী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি এক যায়গায় বেশী দিন আটকাইয়া থাকিতে পারি না। প্রথম পরিচয়ের ঝোঁক কাটিয়া গেলেই আমার মন ভয়ানক হাঁপাইয়া উঠে। তাই আমি চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই। এই অপরিচিত গৃহেই আজ ঢুকিয়া পড়িলাম।

(১৪)

পরের দিন সকালে আমার যে ঘরে নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে অতি জঘন্য একটা ঘর। এ ঘরে আমি রাত্রে আসি নাই, তাহা মনে হইল। একটা অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে একতালার ঘর, তার রাস্তার দিকে একটা ছোট্ট জানালা আছে। সেই জানালার পাশে একখানা খাট পাতা। বিছানাপত্র ভাল নয়, তবু ঘরের যা কিছু সম্পদ সেই বিছানায়। আর সমস্তই দারুণ দৈন্যে ভরা।

আমার শিয়রের কাছে যে বসিয়া বাতাস করিতেছিল তাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। দীন শীর্ণকায় মলিন সে—কিন্তু আমার দেখিয়া চিনিতে একটুকুও দেরী হইল না—সে বিধু।

বিধুর চেহারা ভয়ানক খারাপ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে তার হাড় গিজ্ গিজ্ করিতেছে, গায়ের রং ময়লা হইয়া গিয়াছে, শরীরে ব্যাধির লক্ষণ স্পষ্ট। সে শিয়রে বসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

আমি লাফাইয়া উঠিয়া বলিলাম, "বিধু!"

বিধু পাখা ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ভয়ানক কাঁদিল, কিছুই বলিতে পারিল না। আমি আড়ষ্ট, স্তব্ধ, অবাক্ হইয়া গেলাম। সেই সুন্দর বিধুর এই মূর্ত্তি দেখিয়া আমি এতটা বিমূঢ় হইয়া গেলাম যে, তার প্রেতাত্মা দেখিলে এর চেয়ে বেশী বিস্মিত হইতাম না।

অনেকক্ষণ পরে বিধু বলিল, "এখন শরীর ভাল বোধ ক'রছো কি? গাড়ী একখানা ডেকে আনবো! বাড়ী যাবে?"

আমি বলিলাম "র'স্, যাব। কিন্তু আগে একটু বুঝে নেই ব্যাপারখানা। আমি কি তোর এখানেই এসেছিলাম রাত্রে?"

"পোড়া কপাল আমার! এখানে কেন আসতে যাবে? গিয়েছিলে দোতলায়। সেখানে অনেকগুলো মদ খেয়ে কি একটা হল্লা ক'য়েছিলে, কতকগুলো মিন্সে মিলে তোমায় মার ধর করে সিঁড়ির উপর ফেলে দিয়ে গেল। সোরগোল শুনে ওপরে গিয়ে দেখি, তুমি সিঁড়ির ওপর মদে বিভোর হ'য়ে পড়ে আছ। আমি তোমায় নিয়ে এলাম এই ঘরে।"

আমি গম্ভীর হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। কোনও কথা বলিতে পারিলাম না। কেবল মনের ভিতর আকাশ পাতাল তোলপাড় করিতে লাগিলাম।

খানিক পরে বিধু আমার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুমুখে বলিল, "রাজাবাবু, তোমার পায় ধরি, তুমি ভাল হও। তুমি বড়লোক, রাজা, দেশের মধ্যে তুমি মান্যি গণ্যি, তোমার কি ভাল দেখায় এমনি মেয়ে-মানুষের বাড়ীতে মাতাল হ'য়ে পড়ে ছোটলোকের হাতে মার খাওয়া। তোমার দশা দেখলে আমার বুক ফেটে যায়। আমার ইচ্ছা করে আগুনে পুড়ে মরতে। আমিই তো তোমাকে অধর্ম্মে টেনে এনেছিলাম। আমাকে দয়া কর রাজাবাবু, তুমি ভাল হও। তোমার এ দশা দেখলে আমার বাঁচতে ইচ্ছা হয় না।"

আমি একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলাম। এই বুদ্ধিহীনা নারীর প্রগাঢ় ভালবাসার কথা ভাবিয়া আমার

চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। একটি দিনের তরেও সে আমার হিত ভিন্ন অহিত চিন্তা করে নাই, আমায় সদুপদেশ ছাড়া কুপরামর্শ দেয় নাই, আমিই তাকে পাপের পথে প্রথম দীক্ষা দিয়াছি, অথচ সে সব দোষ অনায়াসে নিজের ঘাড়ে টানিয়া লইয়া, এখনো আমারমঙ্গল ধ্যান করিতেছে। তার যে অবস্থা, তাতে তার জীবনের আর কোনও আশা নাই। আমারই জন্য তার এ দশা; কিন্তু সে জন্য তার অভিযোগ অনুযোগ কিছুই নাই। সে শুধু আমার পায় ধরিয়া সাধিতেছে, "তুমি ভাল হও।"

একটা অনির্ব্বচনীয় আলোকে আমার হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠিল। বিধুর এ কাতর, ক্রন্দনে অন্তর বিচলিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, এখনো আমার আশা আছে। আমার সম্পদ আছে, পদ-মর্য্যাদা আছে, বিদ্যাও আছে, বয়সও আছে! সমস্ত জীবন আমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, আমি আমার পদ ও সম্মানের যোগ্য কেন না হইতে পারিব?

আমি উঠিলাম। নূতন উৎসাহ, নূতন প্রতিজ্ঞা লইয়া উঠিয়া বলিলাম, "আচ্ছা বিধু, তোর কথাই রাখবো। আমি ভাল হ'ব। এখন আসি।"

দুয়ারের কাছে যাইতেই আমার অন্তরাত্মা যেন হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, আমি দারুণ হৃদয়-হীন স্বার্থপর! বিধুর উপর অত্যাচার ও অবিচার করিয়া তার বিনিময়ে পাইয়াছি স্নেহ ও সেবা,—আর, তার চেয়েও বেশী, পাইলাম নবজীবন। কিন্তু একটিবার তার কথাটা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করিলাম না।

ফিরিলাম। বিধুর কাছে তার সব কথা খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম যে, আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবার অল্প দিন পরেই বিপিন উধাও হইয়া যায়। তখন বিধুকে বাধ্য হইয়া রীতিমত বেশ্যাবৃত্তি করিতে হইল। তা' ছাড়া তো পেট চলে না। তার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল,—কি লজ্জা! কি ঘেন্না! তবু পোড়া প্রাণ তো রাখিতে হইবে!

বেশ্যাবৃত্তিতে তার বেশী সুবিধা হইল না। তার রূপ-যৌবন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সে না জানে সাজিতে, না জানে গান গাহিতে, না জানে নাচিতে, না জানে দুটো কথা কহিতে। সে মদও খাইতে পারে না। কাজেই সৌখীন লোকে তার কাছে বড় ভিড়িত না। ফলে তার অবস্থা বড় সুবিধা হইল না। অল্প দিনের মধ্যেই সে ব্যারামে পড়িল, এখন সবে একটু সারিয়াছে। এখন সে এক মেসে ঝিগিরি করে; তা ছাড়া বেশ্যাবৃত্তিও করে। কিন্তু বড় কষ্টে তার দিন যাইতেছে।

খুব সঙ্কোচের সহিত আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোর ছেলে?"

বিধু বলিল, "সে গেছে।" বলিয়া চুপ করিল। আস্তে আস্তে তার চোখ হইতে বড় বড় অশ্রু বিন্দু গড়াইয়া পড়িল। তার পর চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে বলিল, "আমার যখন বেশী ব্যারাম তখনই সে গেছে। এক ফোঁটা ওষুধ, একটু পথ্যি তাকে দিতে পারি নি। সে বিনা চিকিৎসায় তিন দিনের জ্বরে মারা গেছে।"

বিধুর সমস্ত বর্ণনার মধ্যে এক ফোঁটা আড়ম্বর, একটু অনাবশ্যক ভাষার ছটা ছিল না। কিন্তু সেই সরল অলঙ্কার-হীন কথার মত করুণ কাহিনী কোনও দিন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। তার সে কথা শুনিয়া আমার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল, তাই আমি কেবল নীরবে আগাগোড়া শুনিয়া গেলাম; কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া শুনিলাম। কিন্তু যখন সে তার শিশুর—আমার-রক্ত-মাংসে-গড়া শিশুর—মৃত্যুর কথা বলিল, তখন আমার অশ্রু আর বাধা মানিল না। আমি বিধুর সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিলাম।

অনেকক্ষণ পরে আমি কথা বলিলাম। কত কথা আমার মনে উঠিতেছিল, কিছুই বলিতে পারিলাম না। কথাগুলি বুকের ভিতর ঠেকিয়া রহিল; আমি কেবল বলিলাম, "বিধু, তবে আমি আসি।"

"এসো" বলিয়া বিধু সঙ্গে সঙ্গে উঠিল।

আমি একবার বুকের পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম, আমার টাকার ব্যাগ সেখানে নাই। গত রাত্রে যারা আমাকে মারধোর করিয়াছিল, তাহারা আমার টাকাকড়িও হস্তগত করিতে ভুলে নাই, তাহা বুঝিলাম। কাজেই বিধুকে কিছু দেওয়া হইল না, দিবার কথা কিছু বলিতে লজ্জা-বোধ হইল।

রাস্তায় বাহির হইয়া আসিয়া মনে হইল যে, এখন

বিধুকে দু' দশ টাকা দিতে যাওয়া তাকে অপমান করা। সে আমার জন্য যাহা সহিয়াছে, তার জন্য সে আমাকে গঞ্জনা দেয় না, নিন্দা করে তার অদৃষ্টের! আমার যে সেবা সে করিয়াছে, যে স্নেহ সে আমাকে দিয়াছে, তার প্রতিদানের আশা সে করে না। তাকে আমার টাকা দিতে যাওয়া অপমান। কিন্তু সঙ্কল্প করিলাম যে, তাহাকে আমি এ জীবন হইতে স্থায়ী ভাবে উদ্ধার করিব।

ভগবানের চরণে অসংখ্য প্রণিপাত যে এই সংকল্প রক্ষা করিবার সুমতি আমার হইয়াছিল।

আমি তখনই সোজা নরেন্দ্রবাবুর বাসায় গেলাম। তাঁর কাছে অকপট চিত্তে আমার সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি আমাকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "এ কি সর্ব্বনাশ ক'রেছ ভাই! এত ছোট আমাদের জীবন, ভগবানের দুয়ার দান,—এর দুটো দুটো বছর এমনি করে অপচয় ক'রেছ!"

এ অনুযোগের কথা নয়; তিরস্কার নয়; এ স্নেহের কথা, করুণার কথা! আমার যেন মনে হইল, ভগবান স্বয়ং আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে কোল বাড়াইয়া দিয়াছেন।

নরেন্দ্রবাবু বিধুর ভার লইলেন। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। ইহার পর কয়েক বৎসর বিধু বাঁচিয়া ছিল। সে অভাবে কষ্ট পায় নাই, কিন্তু আবশ্যকের অতিরিক্ত সম্পদও পায় নাই। তার বাড়ী ঘর ছিল, এক বৃদ্ধা সঙ্গিনী ছিল। সে বাড়ীতে তরী-তরকারী বুনিত, অবসর কালে চরকায় সুতা কাটিত, লেস বুনিত; ক্রমে তাহাতেই তার গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত। আমি কিছু কিছু সাহায্য করিতাম। নরেন্দ্রবাবু তার দেখা শুনা করিতেন। (ক্রমশঃ)

লোটা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

আমি লোটা আমি যোগীর কাম্য, আমি যে পরম সম্বল,
ভাগ্যবন্ত হতে বাকি শুধু ছোট একখানা কম্বল।
সব ছাড়ে যারা, হায়, তারাও আমারে চায়,
জয় গায় মোর ইরাবতী রেবা গঙ্গা গোমতী চম্বল।

আমি চলিয়াছি হিংলাজ হতে সটান পরশুকুণ্ড,
কাথিয়ার হতে মালাবার আর পুরী হতে 'কাট্‌মুণ্ড'।
বাধা নাই চলি দেদার, দ্বারকা বদরী কেদার;
সমাদর করে পাণ্ডা পূজারী দীন দাতা সাধু ভণ্ড।

গেছি দুষ্কর পুষ্করে আমি প্রয়াগে নেয়েছি কুম্ভে,
অমরনাথের পথের খবর আমার নিকটে শুন্‌বে।
মেখেছি ব্রজের রজ হে, কি মহাভাগ্য বোঝ হে,
গঙ্গোত্তরী উতারি এসেছি গোমুখীর ধারা চুম্বে।

গোদাবরী নীর বহে নিয়ে যাই অযোধ্যা হতে গান্ধার,
রামেশ্বরের শিরেতে চড়াই সলিল অলকানন্দার।
সে মানসসর কোথা রে, বার করি আমি হাতাড়ে?
চোর বাটপাড় করিনেক ডর, ঘেঁসে না ক কাছে বান্দার।

আমি লোটা, আমি সুধার ভাণ্ড, আমি অমৃতের পুত্র;
মন্দালয়ের পেগোডায় রই নহিক নেহাৎ ক্ষুদ্র।
আছি নালন্দা কক্ষে, আছি অজন্তা বক্ষে,
কম্‌লিওলার সত্রেতে আছি,—বলো নাই আমি ক্ষুত্র?

নাজেহাল আর পেশেমান হই পড়িয়া গৃহীর হস্তে,
ধ্যানের সময় তিলেক পাইনে নিরজনে একা বস্‌তে।
মনে পড়ে মোর নিতি গো, কাশী কাঞ্চীর স্মৃতি গো,
কোথা শৃঙ্গেরি, কোথা যোশীমঠ, অনুতাপে মরি পস্তে।

লয়ে যায় কেহ ঝুলাইয়া ঘাড়ে গামছায় করি বন্ধন,
কখনো জোগাই পিয়াসার বারি, কখনো বা করি রন্ধন।
সময় সময় ভাইরে, আরো হীন কাজে যাইরে;
আমি কারো পদে পাদ্য জোগাই, কেউ মোরে করে বন্দন।

সব মায়াময় স্বপ্নের খেলা দেখে দেখে করি হাস্য;
আমি লোটা, আমি বেদান্ত গোটা, খাঁটী শাঙ্কর-ভাষ্য।
সুধা ধরে রাখি স্বর্গে, নিপুণ ন্যায়ের তর্কে—
আমি রসময় রসের আধার মধুর সখ্য দাস্য।

কীর্ত্তন ঃ—দাদ্‌রা—ঠুংরি। (তালফের)

কথা ও সুর—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

কতকাল রবে নিজ যশ বিভব অন্বেষণে ?
দুদিনের ধনের লাগি ভুলিলে পরম ধনে !
ঘরেতে ধন কর পুঁজি, সঙ্গে নেবে ভাব বুঝি,
দীনের দৈন্য কর হে মোচন, দীনের অভাব নাই এ দেশে—
দীনের দৈন্য কর হে মোচন, দীনের ধনেই তোমরা ধনী—
দীনের দৈন্য কর হে মোচন, দীনবন্ধু হবেন সুখী—
দীনের দৈন্য কর হে মোচন, পুণ্য হবে ধন অরজনে।

দুটি ঘরে জ্ঞানের আলো, কোটি ঘরে আঁধার কালো,
এ আঁধার ঘুচাতে হবে, নইলে এ দেশ এমনি রবে—
এ আঁধার ঘুচাতে হবে, দানেই জ্ঞান দ্বিগুণ হবে—
এ আঁধার ঘুচাতে হবে, এরাও তোমার মায়ের ছেলে—
এ আঁধার ঘুচাতে হবে, যতনে অতি যতনে।

পুরাণো সে ত্যাগের কথা, হৃদয়ে কি দেয় না ব্যথা !
সেই দেশের মানুষ তোমরা যেথা রাজার ছেলে হ'ত ফকির
সেই দেশের মানুষ তোমরা যেথা পরের তরে ঝরত আঁখি
সেই দেশের মানুষ তোমরা যেথা ধন হ'তে প্রেম ছিল বড়
সেই দেশের মানুষ তোমরা সে কথা কি গেছ ভুলে ?
কেন এলে তবে মানবের ভবে রবে যদি নিজ কাজে (তবে কেন বা এলে) !

সবাকার মান হোক্ তব মান অপমান পর-লাজে (সেদিন কবে বা হবে ?)।
জাতি-কুল-অভিমান, দ্বেষ-হিংসা-ভেদজ্ঞান ভারতে আনিল মরণ (ভাই হে)
কবে হবে সে সুমতি সবার উন্নতি হইবে সবারি সাধন।
হেন সাধন আর নাই হে হইবে সবারি সাধন।
এ হেন সাধনে জীবনে মরণে পূজিব হে প্রেমসিন্ধু !
(মোরা) পূজিব তোমায়, সেবার কুসুম কুড়াইয়া—
(মোরা) পূজিব তোমায়, নিজের পূজা ঘুচাইয়া—
(মোরা) পূজিব তোমায়, ভারতের আশা পুরাইয়া—
(মোরা) পূজিব তোমায় পরের দুঃখ ঘুচাইয়া—
তব পদে ঠাঁই যেন সবে পাই দয়া কর দীনবন্ধু !
নমো দীনবন্ধু ! তুমি দীনজনের লও প্রণতি ! নমো দীনবন্ধু !

\+ ০ II+

{ সা | সা রা গা | মা পা পা | রা রা রমা | মা মা -া | মা মপধা পা |
ক ত কা ল র - বে - নি জ য শ - বি ভ ব

মপা -া মা | গা রা গরা | গা সা } সা | সা রা গা | মা পা পা | -া -া -া | II
অ - ন্বে ষ ণে - - - ক ত কা ল র - বে - - -

া া পা | ধা ধা ধা | ধা -া ণা | ধা র্সনা ধপা | পা পা -া | পা -া ধা |
- - দু দি নের ধ নে - র লা গি - ভু লি - লে - পু

মপা ধপা মা | গা রা -া | গরা গা সা | সা রা গা | মা পা পা | -া -া -া |
র - ম ধ নে - - - ক ত কা ল র - বে - - -

-া -া পা | পা ধা না | র্সা র্রা র্গর্রা | র্সনা র্রসা -া | -া -া র্সা |
- - ঘ রে তে ধন ক র - পুঁ জি - - - স
- - দু টি ঘ রে জ্ঞা নে র আ লো - - - কো
- - পু রা ণো সে ত্যা গে র ক থা - - - হৃ

র্সা র্সা নর্সা | ধা ধা র্সা | না না র্সা | ধনা ধনর্সা না | ধা -া পা |
ঙ্গে নে বে ভা ব - বু ঝি - - - - - - - -
টি ঘ রে আঁ ধা র কা লো - - - - - - - -
দ য়ে কি দে য় না ব্য থা - - - - - - - -

পা পা -া | পা -া পা | পা পা ধা | র্সনা ধা -া | র্সা র্সা -া | র্সা র্সা না | ধা র্সা র্সা | না ধা না |
দী নে র দৈ - ন্য ক র হে মো চ ন দী নে র অ ভা ব না ই এ দে শে -
এ - আঁ ধা র ঘু চা - তে হ বে - ন ই লে এ দে শ এ ম্ নি র বে -
দে শে র মা নু ষ তো ম রা যেথা রা জা র ছে লে - হ - ত ফ কি র

পা পা -া | পা -া পা | পা পা ধা | ধনা ধা -া | র্সা র্সা র্রা | রা রা গর্রা | র্সা র্রা র্সা | না ধা না |
দী নে র দৈ - ন্য ক র হে মো চ ন দী নে র ধ নে ই তো মা রা ধ নী -
এ - আঁ ধা র ঘু চা - তে হ বে - দা নে - ই জ্ঞা ন দ্বি গু ণ হ বে -
সে ই দে শে র মা নু ষ তো ম রা যেথা প রে র ত রে - ঝ র ত আঁ খি -

পা পা -া | পা -া পা | পা পা ধা | ধনা ধা -া | র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সনা | ধনা না র্সা | না ধা না
দী নে র দৈ - ন্য ক র হে মো চ ন দী ন - ব - ন্ধু হ বে ন সু খী -
এ - আঁ ধা র ঘু চা - তে হ বে - এ রা ও তো মা র মা য়ে র ছে লে -
সে ই দে শে র মা নু ষ তো ম রা যেথা ধ ন হ তে প্রে ম ছি ল - ব ড়-

ধপা পা -া | পা -া পাঁ | পা পা ধা | র্সনা ধা -া | ধা ধা -া | ধা -া ধা | ধা ধা ণা | ধা র্সণা ধপা |
দী নে র দৈ - ন্য ক র হে মো চ ন দী নে র দৈ - ন্য ক র হে মো চ ন
এ - আঁ ধা র ঘু চা - তে হ বে - এ - আঁ ধা র ঘু চা - তে হ বে -
সে ই দে শে র মা নু ষ তো ম রা - সে ই দে শে র মা নু ষ তো ম রা -

পা -া পা | পা পা ধা | মপা ধপা মা | গা রা গরা | গা সা সা | সা রা গা | মা পা পা | II ||
পু - ণ্য হ বে ধ ন - অর জ নে - - - ক ত কা ল র - বে
য - ত নে - অ তি - য ত নে - - - ক ত কা ল র - বে
সে - ক থা - কি আ - ছে ম নে - - - ক ত কা ল র - বে

(অল্প ঠায়ে)

{ রা গা পা | মা গা মা | রা গা গা | গা মা গা | রা গা রা | সা ধসা সরা | রা রা -া | -া
কে ন এ লে ত বে মা ন বে র ভ বে র বে য দি নি জ কা জে - -

(রা রা | রা গা পমা | গা রসা নসা |) } -া -া | পা ধা র্সনা | ধা ধা -া | পা র্সা না | ধা পধনা ধপা |
ত বে কে ন বা এ লে - - - স বা কা র মা ন হো ক ত ব মা ন

| পা ধা পক্ষা | গরা গা মা | গা রা -া | -া (রা রা | গা পা পা | ধা র্সনা ধপা |) | ।
অ প মা ন প র লা জে - সে দিন ক বে বা হ বে - - -

(ঠুংরি)

। ররা মগা রা | রা রা রা -া | । সমা মা মগা | রগা রগা রসা -া | { । রমা মা মা |
- জাতি কু ল অ ভি মা ন - দ্বেষ হিং সা ভে দ জ্ঞা ন - ভা র তে

মা পা পা ধা | পক্ষা পা -া -া | (মা গমা রগা সা) | } । । । । | । পধা র্সনা ধা |
আ নি ল ম র ণ - - ভা ই - হে - - - - - কবে হ বে

[রা মা মা]

ধা ধা ধা ধা | পর্সা র্সা র্সা না | ধা না ধা পা | { । মা গা রগা | মা পা ধা পা | ক্ষা পা -া -া |
এ সু ম তি স বা - র উ - ন্ন তি - হ ই বে স বা রি সা ধ ন - -

(মা গা রা সা) | } । । পা পা | পা ধা -া ধা | ধা ণা ধণা ধপা | । রা মা মা | মা পা পা ধা |
বি ধি হে - - - হে ন সা ধ ন আর না ই হে - - হ ই বে স বা রি সা
পক্ষা পা -া -া | । । । । |
ধ ন

দাদারাতে প্রত্যাবর্ত্তন

মা পা পা | মা ধা পা | মা পধা পা | মা গা গমা | পনা না ধনা | ধা পা ধপক্ষা |
এ হে ন সা ধ নে জী ব নে ম র ণে পূ জি ব হে প্রে ম
পা ধা পধনর্সা | ধনা পা পা |
সি ন্ ধু - মো রা

পা ধা ধা | ধা পধা নর্সা | ধনা -া -া | । । । | পর্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা |
পূ জি ব তো মা - য - - - - সে বা র কু সু ম

না র্সা না | ধনা না ধা |
কু ড়া ই য়া মো রা

পা ধপা ধা | ধা পধা নর্সা | ধনা -া -া | । । । | র্সা র্রা -া | র্সর্রা র্গা র্রা | র্সা র্রা র্সা | না ধনা ধান
পূ জি ব তো মা - য - - - - নি জে র পূ - জা ঘু চা ই য়া মো রা

পা ধপা ধা ধা পধা নর্সা | ধনা -া -া | । । । | পা র্সা র্সা -া র্সা র্সা |
পূ জি ব তো মা - য - - - - ভা র তে র আ শা

না র্সা না | ধনা ধনা ধা |
পূ রা ই য়া মো রা

{ পা ধপা ধা | ধা পধা নর্সা | ধনা -া -া | । । । | (র্সা র্রা -া | র্সর্রা র্গা র্রা |
পূ জি ব তো মা - য - - - - প রে র দুঃ - খ

র্সা র্রা র্সা | না ধনা ধান |) }
ঘু চা ই য়া মো রা

পা ধা র্সা | র্সা র্সা -া | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সর্রা র্সনা | না র্সা না | ধনা ধনা ধপা |
ত ব প দে ঠাঁ ই যে ন স বে পা ই দ য়া ক র দী ন

পা ধা পধা | নর্সা ধনা -া | । । সা | সা রা গা | মা পা পা | রা রা রমা
ব ন্ ধু - - - - ন মো দী ন ব ন্ ধু - তু মি

মা মা । | মা গমা পধা | পা -া মা | গা রগা রগা | । । সা | সা রা গা | মা পা পা | -া -া -া
দী ন - জ নে - ল ও প্র ণ তি - - ন মো দী ন ব ন্ ধু - - -

পীঠস্থান

অধ্যাপক শ্রীআনন্দকিশোর দাশ এম-এ

আমাদের পাড়ায় একটা নূতন রকমের স্কুল ছিল। পাড়াটা সহর থেকে অনেক দূরে। ছোট ছেলেদের হেঁটে স্কুলে যেতে বড্ড কষ্ট হত। তাই আমাদের অভিভাবকগণ নিজেরাই আমাদের ভার নেবেন ঠিক করেছিলেন। সবাই মস্ত মস্ত পণ্ডিত; বেলি, রমেশ ও আমার বাবা কলেজে পড়াতেন, টুলু আর রাণুর বাবা স্কুলের মাষ্টার ছিলেন। বস্তুতঃ পাড়াটাকে অধ্যাপক-পাড়া বল্লেও চল্‌ত।

ছেলেমেয়ে সকলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। সবে ১২।১৪টী মাত্র ছাত্র। তাতে আবার এক পাড়ায় থাকি বলে, খেলাধূলা সব এক সঙ্গেই হত। কাজেই কোন রকম বাধ বাধ ঠেক্‌ত না।

পাঠশালার আলাদা কোন ঘর ছিল না। কে কখন কি পড়াবেন, আমাদের জানা ছিল; আমরা সে বাসায় গিয়া পড়তাম। পাশে পাশেই বাসা, কোন কষ্ট হত না। ক্লাস সকালে আর সন্ধ্যায় হত।

দুপুরে আবার একটা ক্লাস হ'ত, সেটা আরও অদ্ভুত। তখন মাষ্টার হতেন আমাদের মা, মাসীমা, কাকীমারা—অর্থাৎ পাড়ার গিন্নিরা। কেউ গান বাজনা শেখাতেন, কেউ সেলাই শেখাতেন, কেউ বা ছবি আঁকাতেন।

এই ক্লাসটাকে আমি বড্ড ভয় কর্‌তাম। কোন মতেই মন্‌টা বসাতে পারতাম্ না। কর্ত্তারা সব স্কুলে, কলেজে—কোথায় এখন একটু সর্দ্দারী কর্ব্ব, গাছে চড়্‌ব, ঘুড়ি উড়াব—তা নয়, সা, রে, গা, মা, বাজাও, ড্রইং কর; গাছের কত রকম পাতা আছে বসে বসে রং দিয়ে আঁক। এগুলি আমার কেমন আস্‌ত না। আমার ছবি সব বিট্‌কেল চেহারার হ'ত, দেখে সবাই হাস্‌ত। বেলুটাই বেশী ঠাট্টা কর্ত্ত। সে একটু ভাল ছবি আঁক্‌ত কি না, তাই। আমার কিন্তু ভারী রাগ হত।

সেদিন আমাদের বাসায় ক্লাস হচ্ছে, ড্রইংএর ক্লাস। নানা রংএর পেন্সিল নিয়ে বসে আছি; সামনে ফুলবাগান। মা একটা ফুল আঁক্‌তে দিলেন। পাতা যখন আঁক্‌তে বলে, তখন পাতার চেহারা কোন মতেই হয় না। আজ ফুল আঁক্‌তে দিয়েছে কি না, কেবল পাতার মতনই চেহারা হচ্ছে। সবার আঁকা হয়ে গিয়েছে—মা একটী একটী করে দেখ্‌ছেন। আমার খাতা দেখে বেলুকে বল্লেন,—"দেখ্ বেলু, অনুর ফুলটা দেখ্ এসে—"। দেখে বেলু ত হেসে গড়াগড়ি। স্কুলে কোন বাঁধা নিয়ম ছিল না, মাষ্টারের ভয় আমাদের হ'ত না। মা, মাসীকে ত আর সত্যি মাষ্টার ভাব্‌তে পার্ত্তাম না। কাজেই ক্লাসে হাসি-ঠাট্টা বেশ চল্‌ত।

বেলুর হাসি দেখে সবাই এসে জড় হয়েছে, আর তামাসা চল্‌ছে। "অনুজদা, এটা কি এঁকেছ? ফুল? কি ফুল?" আবার হাসি। আর সহ্য হল না। বেলুটাকে মাল্লাম এক চড়। "কেন? ওই'ত হেসে হেসে সব জড় করেছে। ভারী ত একটু ছবি আঁক্‌তে পারেন, তাই কত দেমাক্। দেখে নেব আঁকের ক্লাসে। তখন যে আকাশের তারা গুন্‌তে থাক, তার কি?"

মা কিন্তু ভারি চটে গেলেন।

"কি অন্যায় কথা, তুই আমার সাম্‌নে বেলুকে এম্‌নি ধারা মার্‌লি। তুই আজ আর বিকালে ঘর থেকে বের হ'তে পার্ব্বি না, তোর আজ খেলা বন্ধ।"

খেলা বন্ধটা যে আমার কত বড় শাস্তি, মা তা বেশ জান্‌তেন।

পড়্‌বার ঘরে মুখ ভার করে বসে আছি। মনে মনে ফন্দি আট্‌ছি, আজ বিকালে খাবার খাব না। বাবা কলেজ থেকে এলে তাঁর সঙ্গে খাবার খাই। আমায় না দেখ্‌লেই বাবা খুঁজবেন। তখন মজাটা দেখে নেব; মার নামে খুব করে লাগাব।

বাবা বাড়ী ফিরে হাত-মুখ ধুয়েছেন,—মা রেকাবীতে করে জলখাবার সাজিয়ে টেবিলে রেখেছেন।

অনু কোথায়, ওকে দেখ্‌ছি না যে। কোন অসুখ-বিসুখ করেছে না কি?

এ সময়ে আমি কখনই ঘরহাজির থাকি না, বাবা সেটা বিলক্ষণ জান্‌তেন। আমি কাছে না থাক্‌লে তাঁরও খাওয়া জম্‌ত না।

—ঘাট্, অসুখ কর্ব্বে কেন? বেলুকে মেরেছিল, তাই খেল্‌তে মানা করেছি। তাই রাগ হয়েছে, বল্‌ছেন আজ খাবেনও না।

—ও কোথায়?

ঐ দেখ না, জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মার্‌ছেন।

—কি হয়েছে রে? এদিকে আয় দেখি?

—না, আমি খাব না, কিচ্ছুই খাব না। অভিমান-ক্ষুণ্ণ স্বরে বল্লাম।

—নাই বা খেলি, তা, এ দিকে আয় না, কি হয়েছিল? বেলুকে মার্ত্তে গেলি কেন?

—মার্ব্বো না, সে হাস্‌লে কেন? বলেই খানিকটা এগুলাম।

—বেশ, কেউ হাস্‌লেই তাকে মার্ত্তে হয় না কি?

"—আমি ড্রইং আঁক্‌তে পারি না বলে সব্বাই আমাকে ঠাট্টা"—আর বল্‌তে পার্‌লাম না—কান্নায় আমার বাক্-রোধ হয়ে গেল। মাকে কেন জানি না বড্ড ভয় কর্ত্তাম, তাই যত সব আব্দার বাবার কাছেই হ'ত।

"—ও, তাই"—বলে আমাকে কোলের কাছে টেনে নিলেন। মাকে বল্লেন—"তোমরা বড্ড বোকা, এমনি কর্ল্লে ছেলেদের যে উৎসাহ ভেঙ্গে যায়।" মা বল্লেন, "মাষ্টারী ত আর আমাদের ব্যবসা নয়।"

বাবা মুচ্‌কে হাস্‌লেন, আমাকে সঙ্গে করে খেতে লাগ্‌লেন।

খাওয়া শেষ হয়েছে; ওদিকে দেখি, বেলুটা মার আশে পাশে ঘুর্‌ছে। আমাকে না হলে ত খেলা চল্‌বে না। আমি হলাম পাড়ার সর্দ্দার।

ভাব্‌লাম, বাবা নিশ্চয়ই আমাকে ছুটী দেবেন খেল্‌তে।

বাগানের ওপাশে সবাই খেল্‌ছে, তাদের হল্লা শুন্‌তে পাচ্ছি। বল্লাম "বাবা, খেল্‌তে যাই।"

—তা কি হয়, তোমার মা যে মানা করেছেন। চল, আমরা বসে গল্প করি।

ভাব্‌লাম, বাবাও মাকে ভয় করেন দেখ্‌ছি। মার কথা কাটিয়ে আমায় খেল্‌তে দিলে কত বড় অন্যায় হ'ত, ছেলের বাবা হয়ে আজ তা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি।

বেলুটাও ধীরে ধীরে আমাদের কাছে এসে জুটেছে। ওর জন্যই যত গোলমাল; রাগে আমি ওর দিকে তাকালাম না। ওর সঙ্গে আজ আড়ি।

—'অনুদা, এস। আমি তোমার সঙ্গে খেল্‌ব।' বড্ড কাঁদ কাঁদ ভাব।

—না, তোর সঙ্গে খেল্‌ব না, বাবার সঙ্গে খেল্‌ব। কেন, এখন হাস্ না গিয়ে!

কি নিষ্ঠুর ছিলাম আমি—!

বেলু কেঁদে ফেল্লে—"আর হাস্‌ব না, আমার ঘাট হয়েছে।" বাবা বেলুকে কোলে টেনে নিলেন, তার সুন্দর কোঁকড়ান চুলগুলিতে হাত বুলাতে লাগ্‌লেন।

তার পর আমাদের দুজনাকে দুপাশে নিয়ে গল্প জুড়ে দিলেন।

(২)

বছর দুই হ'ল আমি এখানে এসেছি। এম-এ পাশ করে আইন পড়ছিলাম, এমন সময় গৌহাটীতে একটা চাকুরী জুটে গেল। শ্বশুর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, আইনটা পাশ করি; বাবা বল্লেন চাকুরীটা যখন হয়েছে, চলে যাক্। আমারও তাই মত। সংসারে বড় টানাটানি, বাবা একলা পেরে উঠ্‌ছিলেন না। কয় বৎসর হ'ল, বাবা পেন্‌সন নিয়েছেন।

যাবার সময় মনটা কেমন কর্ত্তে লাগ্‌ল। কোথায় কুমিল্লা আর কোথায় গৌহাটী। তাতে আবার শুন্‌লাম, গৌহাটী না কি ৺কামাখ্যার নিকটে। বৌদি বল্লেন, 'সাবধান ঠাকুরপো, কামরূপ কামাখ্যা কিন্তু ডাকিনীর দেশ! সেখানে গেলে না কি ভেড়া হয়!' ভাব্‌লাম, 'দূর ছাই, এই দূর দেশে একলাই যাব'। মা তাতে বাদ সাধলেন,—বৌকে সঙ্গে নিতেই হবে। বোধ হয় বৌদির কথাটা কাণে গিয়ে থাক্‌বে; তাই রক্ষাকবচ সঙ্গে দিলেন।

মা চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে শিরশ্চুম্বন করে দুর্গা দুর্গা বলে বিদায় দিলেন। ট্রেণে উঠে রাত্রিটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এক রকম কেটে গেল। ঘুম থেকে উঠে

দেখি, বেশ রোদ উঠেছে। শিউলিও ততক্ষণে উঠে বসেছে। ট্রেণ তখন পাহাড়ে রাস্তায় ঢুকেছে। পাহাড়ের পর পাহাড়—মাঝে লোকালয়ের চিহ্ন নাই—কদাচিৎ দুই একটা চা-বাগিচার কুলির ঘর দেখা যাচ্ছে। এত পাহাড়! একমনে পাহাড়ের শোভা দেখ ছি—হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। এ কি? শিউলি ত চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। আমিও কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। একটু পরেই দেখি, আবার আলো,—হাসি পেল। পূর্ব্বে ত আর দেখি নি, তাই বুঝ্‌তে পারি নি যে, ট্রেণ Tunnelএ ঢুকেছিল! শিউলি বল্লে,—"বাবা, কি ভয়ই পেয়েছিলাম! তুমি আগে বল্লে না কেন, এমন ধারা সুড়ঙ্গ আছে?"

—"বলা উচিত ছিল বটে, তবে বড় অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই বলা হয় নাই।"

এই রকম বহু পাহাড়, বহু Tunnel ডিঙ্গিয়ে ক্রমে ট্রেণ এসে গৌহাটীতে দাঁড়াল। বাবা, কি পাহাড়ের দেশ! রেল কোম্পানীর বাহাদুরী, এই বিস্তীর্ণ দুর্ভেদ্য গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে এমন সুন্দর রাস্তা কেটে বের করেছে।

একে ভেড়া হওয়ার ভয়, তাতে আবার এই পর্ব্বত-শ্রেণী দ্বারা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। অজানা দেশ, অজানা সমাজ—মনটা যেন কেমন দমে গেল। যা হোক্, একখানা গাড়ী করে বাসায় পৌছান গেল। বাড়ীখানা ঠিক নদীর উপরে।

এই গৌহাটী! আহা, কি মনোভিরাম দৃশ্য! এখানে এলে লোক আট্‌কে পড়বে, আশ্চর্য্য কি? এ যে এক অপূর্ব্ব মায়াপুরী! অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।—সম্মুখে বিস্তীর্ণ ব্রহ্মপুত্র, হুঙ্কার করে ছুটেছে। মধ্যে উমানন্দ ভৈরব তার গর্ব্বিত স্পর্দ্ধাকে যেন উপহাস করে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রুদ্ধ নদ আহত ফণীর ন্যায় উন্মত্ত হয়ে বিপুল বেগে হুঙ্কার করে তাকে আঘাতের পর আঘাত কচ্ছে। অদূরে কামাখ্যা পাহাড়—শীর্ষদেশে ভুবনেশ্বরী মন্দিরের শুভ্র চূড়া দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের পর পাহাড়—অনন্ত বিস্তার। পাহাড়ে নদীতে মিলিয়ে এমন দৃশ্য বুঝি ভূভারতে কোথাও নাই। শিউলি যোড় করে উদ্দেশে মা কামাখ্যাকে প্রণাম কল্লে।

পর দিনই ৺কামাখ্যা মন্দিরে গেলাম। গৌহাটী পৌছিয়াই কামাখ্যা মায়ের পূজা দিতে হবে, মা মাথার দিব্বি দিয়ে পুনঃ পুনঃ বলে দিয়েছিলেন।

সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে শিউলি জিজ্ঞাসা কল্লে—

—"আচ্ছা, কামাখ্যা এতবড় তীর্থস্থান কেন?"

বল্লাম, "পীঠস্থান কি না।" ভাবলাম, সবই বলা হল!

—'পীঠস্থান কি?'

মাটী! বিদ্যা-বুদ্ধি এবার ফেঁসে যায়! পাণ্ডাঠাকুর রক্ষা কল্লে। কেমন করে দক্ষযজ্ঞে স্বামীর অবমাননা সহ্য কর্ত্তে না পেরে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন, শোকে উন্মত্ত মহেশ্বর সেই প্রাণহীন পুণ্যময় দেহ স্কন্ধে করে কেমন করে পৃথিবীময় ঘুরেছিলেন, সেই বিশ্বগ্রাসী শোকের তাপে কেমন করে সৃষ্টিনাশ হয়ে প্রলয়ের সূচনা হয়েছিল, ভগবান বিষ্ণু ভোলানাথের অজ্ঞাতসারে কেমন করে সেই পবিত্র সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটেছিলেন, সেই স্বর্গীয় প্রেমের চিত্তোন্মাদন কাহিনী বল্লে।

শুন্‌তে শুন্‌তে মনে যেন কেমন একটা অভূতপূর্ব্ব পুলক সঞ্চার হল। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ পুণ্যময় আবেষ্টনের মধ্যে অতিবড় পাপিষ্ঠের চিত্তেও বুঝি সরসতা আনয়ন করে।

শিউলির দিকে তাকিয়ে দেখি,—আঁচল দিয়ে বার বার চোখ মুছ্‌ছে। তার বেদনা-কাতর, অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ দিয়ে যেন কেমন একটা পুণ্যজ্যোতিঃ বের হচ্ছে; স্বভাবসুন্দর মুখখানিকে যেন এই প্রেমের, এই ত্যাগের মাহাত্ম্যে আচ্ছন্ন করে ফেলেছি।

ততক্ষণে আমরা মন্দিরের সোপানে এসে পৌছেছি। যাত্রিগণ 'কামাখ্যা মাই কি জয়' বলে পাণ্ডার পেছনে পেছনে মন্দিরে ঢুক্‌ছে। কি উন্মাদনা এদের হৃদয়ে! এত ভিড়, এত ধাক্কাধাক্কি,—ভ্রূক্ষেপ নাই। মন্দির-দ্বারে প্রেমপিয়াসী ভক্তগণ কেহ বা উদাত্ত স্বরে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ কচ্ছেন, কেহ বা ভক্তিভাবে ষোড়শোপচারে কুমারীপূজা কচ্ছেন। সবারই মুখে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ,—সবারই এক লক্ষ্য।

ক্রমে আমরাও মন্দিরে ঢুক্‌লাম। পীঠস্থানে উভয়ে পাশাপাশি বস্‌লাম,—পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করালে। আভূমি প্রণত হয়ে গদ্‌গদ চিত্তে মন্ত্রোচ্চারণ করলাম। পবিত্র পীঠস্থান দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ কর্‌লাম,—সমস্ত দেহে যেন

তড়িৎ খেলে গেল। তখনো কাণে সেই প্রেমে পাগল ভোলানাথের প্রেমের কাহিনীর মূর্চ্ছনাই চল্‌ছিল।

"মাগো, আশীর্ব্বাদ করো, যেন স্বামিপদে মতি থাকে, যেন স্বামি-সোহাগিনী হই।" শিউলির অস্ফুট, কাতর প্রার্থনা কাণে গেল। পুরোহিত আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য ও সিন্দুর সিঁথিতে কপালে লেপিয়া দিল।

ভগবান তোমার অনন্ত প্রেমের জয় হউক!

৩

আরও ৩।৪ বৎসর কেটে গেছে। হঠাৎ এক দিন একখানা চিঠি পেলাম বেলুর কাছ থেকে। লিখেছে, "অনুদা, বৌদিকে বল, তার এক অজানা অতিথি আস্‌ছে; ২।৪ দিন তাকে ভোগাবে।"

ব্যাপারখানা কি বুঝ্‌তে পারলাম না। হঠাৎ বেলু গৌহাটী আস্‌ছে কেন? তীর্থ কর্ত্তে নয়, এটা ঠিক্! তারা একটু ব্রাহ্মভাবাপন্ন। তবে কি?

ঠিক মনে নাই কেন, সেদিন আপিস বন্ধ ছিল। ভাবলাম, যাই, 'পাণ্ডু' থেকে বেড়িয়ে আসি।—বেলু-টাকেও এগিয়ে নিয়ে আস্না যাবে। না জানি, বেলু কত বড় হয়েছে। উঃ, কতকাল দেখা হয় নি। ছেলে-বেলাকার কত কথা মনে হচ্ছিল। কত দুষ্টুমি, কত মারামারি করেছি দুজনায়। তার পর তার বাবা বদলী হয়ে গেলেন, আর দেখাশুনা হয় নাই। তবে শুনেছিলাম বটে, বেলু B. A. পাশ করে ঢাকায় মেয়েস্কুলে মাষ্টারী কচ্ছে।

'পাণ্ডু' flatএ দাঁড়িয়ে আছি। ওপার থেকে ষ্টীমার ছেড়েছে। মনে মনে কেমন একটা আশঙ্কা হচ্ছে কি জানি, বেলুকে যদি চিন্‌তে না পারি! কতকাল দেখা হয় নি। হঠাৎ দেখি, ষ্টীমারের উপর থেকে কে একখানা রুমাল উড়্‌ছে। তাকিয়ে দেখি, বেলু। এই সেই বেলু! এত বড় হয়েছে! আমি ভাব্‌ছিলাম, বেলু বুঝি এখনো এতটুকুই রয়েছে!

ষ্টীমার থেকে নেমে এসেই জিজ্ঞাসা কল্লে, "অনুদা, কেমন আছ?" উত্তর দেবার প্রতীক্ষা না করেই, "এই লীলু, এই তার বাবা" বলে তাদের Party'র সাথে পরিচিত করিয়ে দিলে। লীলা বেলুর কলেজের বন্ধু, ঢাকায় একত্র কাজ করে।

"যাও, এবার তোমার অনুদাকে ত পেয়েছ? কি বল্‌ব অনুজ বাবু, সমস্তটা রাস্তা কেবল অনুদা, অনুদা।"

তার পর গলা একটু ছোট করে বল্লে "আপনি married, তা না হলে মনে কত্তাম বুঝি—"

—"নে, নে, আর বখামি কত্তে হবে না," বলে বেলু লীলার কথা ওখানে থামিয়ে দিলে।

লীলার বাবা বল্লেন—"motorএ আমাদের Seatগুলি booked আছে কি না, খবরটা নিয়ে দেবেন অনুজবাবু!"

—"আপনারা এখান থেকেই চলে যাবেন না কি? আমাদের ওখানে এক দিন বিশ্রাম করে যাবেন না?"

—"না, এবার আর না; ফের্‌বার পথে হয়ে যাব এখন।" ততক্ষণে আমরা Platformএ এসে পৌছেছি। এক পাশে আসাম লাইনের গাড়ী দাঁড়িয়ে; অপর পাশে সার দিয়ে শিলংএর মোটরগুলি। লীলাদের Seatএর বন্দোবস্ত করে তাদের বসিয়ে দিলাম। ট্রেণ ছাড়তে এখনো ঘণ্টা খানেক দেরী। এতক্ষণ কে বসে থাকে? আমরাও একখানা Taxiতে উঠে পড়্‌লাম।

"আমরা তবে আসি, ফিরে যাবার সময় অনুগ্রহ করে হয়ে যাবেন কিন্তু" বলে লীলা ও তার বাবার কাছে বিদায় নিলাম। Car ছেড়ে দিল। বেলু আর লীলা রুমাল উড়িয়ে পরস্পর বিদায় সম্ভাষণ জানালে। রুমালের সুবাস motorএর হাওয়া বিভোর করে দিলে।

"বৌদি ভাল আছেন ত? তোমার না কি একটী খোকা হয়েছে? কত বড় হয়েছে? কি বলে ডাক তাকে?" ইত্যাদি প্রশ্ন করে বেলু অস্থির করে তুল্লে।

দেখ্‌লাম, বেলু এখনো ছেলেবেলাকার মতন চঞ্চলই আছে।

—"এই কামাখ্যা?" তখন Carখানা ৺কামাখ্যা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

—"একবার কামাখ্যা দেখ্‌তে হবে।" একটু থেমে বল্লে—"ভেড়া কর্ব্বে না ত?"

—তোদের ভেড়া করে কার সাধ্য? ভেড়া হব ত আমরা!

—তোমার কি ভেড়া হওয়ার এখনো বাকী আছে না কি?

—কেরে সেই ডাকিনী যোগিনী?

—কেন বৌদি। বাবা, বিয়ের পর আর একখানা চিঠি লিখ্‌লে না!

—তাই বল্! আমি ভাবছিলাম, না জানি কে?

বেলু কথাটা নেহাৎ অন্যায় বলে নি। বাস্তবিক, বহুকাল তাদের কোন খবরাখবর নেওয়া হয় নাই। তাই তাড়াতাড়ি কথাটা ফিরিয়ে দিলাম।

"হঠাৎ গৌহাটী কি মনে করে? তীর্থ কত্তে না কি? চিঠিতে ত একটী কথাও লিখিস্ নি।"

—ভাব্‌লাম, তোমাদের একটু Surprise কর্ব্ব। পূজোর ছুটী, লীলুরা শিলং যাচ্ছে, বল্লে—চল্ না। বাবাকে জিজ্ঞাসা কত্তে, বল্লেন, বেশ ত। অনুরা গৌহাটী আছে, ওদেরও দেখে যেও। বারে! এতবড় কথাটাই খেয়াল হয় নি! বাস্তবিক, শিলং যেতে যে গৌহাটী হয়ে যেতে হয়, এত কথা কে জান্‌ত বাপু!

Carখানা এবার গেটের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে। Carএর শব্দে শিউলি এগিয়ে এল। "শিউলি, এই বেলু, তোমার সঙ্গে ত দেখা নাই।"

মুখ ফিরিয়ে বেলুকে বল্লাম, "এই তোর—"

—"বৌদি" নিজেই কথাটা কেড়ে নিলে। তার পর শিউলির গলায় ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো, যেন কত কালের ভাব!

৪

কটা দিন যে কি ভাবে কাট্‌ল, বুঝ্‌তেই পার্ল্লাম না। রোজই একটা কিছু আছে। আজ 'বশিষ্ঠাশ্রমে', কাল "নবগ্রহ," পরশ্ব "উমানন্দ," "অশ্বাক্রান্ত" এম্‌নি করে যেন হাওয়ার মতন দিনগুলি কেটে গেল। বেলু একটা কিছু নিয়ে আছেই। তবে খোকার উপরই তার দৌরাত্ম্যটা বেশী। আদর করে, চুমু খেয়ে, কোলে করে, কাঁধে করে ওকে একেবারে অস্থির করে তুলেছে।

"আহা, তোমার কাপড়-চোপড় সব নোংরা করে দেবে যে!"

"তোমার কাপড় নোংরা করে না বৌদি?"

"কি খাসা উত্তরই দিলে! আমি ছেলের মা,—আমায় তোমায় বুঝি এক কথা হ'ল!"

"আমি বুঝি তবে ওর কেও নই?"

অভিমান-ক্ষুণ্ণ অশ্রুভারাক্রান্ত আয়ত নয়নযুগল শিউলির মুখের উপর রেখে বেলু প্রশ্ন কল্লে।

"তোর সঙ্গে আর কথায় পারিনে বাপু।"

এমনি করে দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। এদিকে শিলং থেকে তাগিদ এসেছে—"ছুটীটা কি গৌহাটীতেই কাটিয়ে দিবি না কি? তবে শিলংএর নাম করে বেরিয়েছিলি কেন?"

"চল অনুদা, কাল কামাখ্যাটা সেরে আসি। পরশু বেরিয়ে পড়া যাবে।"

মনটা কেবন ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌ল।

—"এত শিগ্‌গির?"

"শিগ্‌গির আর কৈ? ৬।৭ দিন ত হয়ে গেল। লীলুটাও বড্ড তাড়া দিচ্ছে। এম্নি না জানি কত ঠাট্টা কর্ব্বে!" বলে মুচ্‌কে হাস্‌তে লাগল।

এদিকে রোজ ছুটাছুটীতে শিউলীর শরীরটা বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটু ঠাণ্ডা লেগেছে, একটু জ্বর-জ্বর ভাব। তাই বল্লাম, "তোর বৌদির শরীরটা যে ভাল নয়।"

শিউলি পাশেই বসে ছিল, বল্লে—"তাতে কি? আমি ত অনেকবার কামাখ্যা গিয়েছি। তোমরাই বেড়িয়ে এস।"

"তা কি হয়, তাহলে ত অর্দ্ধেক স্ফূর্ত্তিই মাটী।" বেলু বল্লে।

—"না, তা কেন। এসগে তোমরা। বেশী পাহাড় চড়তে ডাক্তাররা আমায় মানা করেছে।"

বুকে একটা যন্ত্রণা আছে বলে ডাক্তার শ্রম-জনক কিছু কর্ত্তে নিষেধ করেছিল বটে। তাতে আবার এই কয়দিন একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে। তাই আমি আর বেশী পীড়াপীড়ি কর্ত্তে দিলাম না।

পর দিন ভোরেই একখানা ট্যাক্সি করে আমরা বেরুচ্ছি। শিউলি বল্লে—"জুতোটা ছেড়ে যাও বেলু; তীর্থে যাচ্ছ, জুতো কেন?"

"আহা, পিছু ডাক্‌লে বৌদি, আজ একটা accident না হয়ে যায় না" বলে বেলু হাস্‌তে লাগল।

"ঐ তোদের 'হিল্' উঁচু জুতো নিয়ে পাহাড় চড়তে পার্ব্বি না" বলে প্রকারান্তরে আমিও শিউলির কথা সমর্থন কর্‌লাম।

—"এবেলা নাব্‌তে বেলুর কষ্ট হবে, একেবারে ছায়া পড়লে ও-বেলাই নেবো। সঙ্গে চায়ের জিনিষ সব দিলাম।" বলে 'গেট' পর্য্যন্ত শিউলি আমাদিগকে এগিয়ে দিল।

গাড়ীখানা নদীর ধার দিয়ে মন্থর গতিতে যাচ্ছে। ডান দিকে বিরাট ব্রহ্মপুত্র নদ—প্রশান্ত, গম্ভীর। তর্ তর করে আপন মনে চলে যাচ্ছে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। যেন কোন যোগীবর মানব-হিতের জন্য সর্ব্বত্র প্রেমের ধারা বিলাইয়া তার চির-বাঞ্ছিতের উদ্দেশে যাচ্ছে। প্রভাতী বায়ু স্থানে স্থানে একটু একটু বীচি-বিক্ষেপ তুলেছে। এ-পারের কুয়াসা কেটে গেছে। Ferry Steamer ভোঁ ভোঁ করে যাত্রী ডাক্‌ছে।

বেলুর আজ পোষাকের বিশেষ পারিপাট্য নাই। একখানা বুটীদার খদ্দরের শাড়ি ও তদনুরূপ একটী ব্লাউজ। এতেই তাকে বেশ মানিয়েছে। ভোরের মৃদুমন্দ হাওয়া গায়ে লাগ্‌ছে; একটু একটু শীত কচ্ছে। বেলু তার ভাঁজ-করা শালখানা গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে। পাহাড়ে জলাভাব ব'লে ঘরেই স্নান সেরে এসেছে। সিক্ত কবরী উন্মুক্ত, হাওয়ায় ঈষৎ দুল্‌ছে; দুই একগাছা চুল মুখে চখে এসে পড়েছে। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।

৫

কেমন একটু আন্‌মনা হয়ে ছিলাম: হঠাৎ গাড়ী থামার শব্দে চৈতন্য হ'ল। দেখি, গাড়ী পাহাড়ের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে।

বেলুকে গাড়ী থেকে নামালাম।

"পাহাড়ে উঠ্‌তে এম্নি হাঁপিয়ে পড়বি।" বলে তার শালখানা নিজে নিলাম।

"সন্ধ্যার ঠিক আগে গাড়ী চাই" 'শফার'কে বলে পাহাড়ের দিকে চল্লাম। ক্রুরর ক্রুর্ করে carখানা বেরিয়ে গেল।

সাম্‌নে একটা 'গেট্'। সেটা পার হয়ে সিঁড়ি চড়্‌তে আরম্ভ করেছি। প্রথম ধাপটা পার হয়েছি—ছোট ধাপ, পাথরে বাঁধান।

"এমন ধারা আর কয়টা ধাপ?"

"এটা ত ফাও। এই সবে সত্যিকার সিঁড়ি আরম্ভ হ'ল।" ততক্ষণে আমরা আসল সিঁড়িতে এসে পৌঁছেছি। ক্রমে উঠ্‌ছি। ডানদিকে উঁচু পাহাড়, বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন; বামে উৎরাই। মাঝে পাথরের রাস্তা—বেশ প্রশস্ত।

"জয় হউক বাবা, সিদ্ধিদাতা তোমার বাসনা সিদ্ধ করুন!" রাস্তার ধারে এক প্রকাণ্ড পাথর, যাত্রীদের দেখ্‌বার জন্য যেন উঁকি মেরে রয়েছে। তাতে সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্ত্তি,—সর্ব্বাঙ্গ সিন্দুর দিয়ে লেপা; পাশে ছোট একখানা মাটীর কুঁড়ে। সাধু বাবা বসে বসে গঞ্জিকা সেবন কচ্ছেন, আর যাত্রীদের কাছ থেকে কিছু কিছু আদায় কচ্ছেন।

"বাবা, কত বড় পাথর! এত সব পাথর এল কোত্থেকে? কে এ রাস্তা বাঁধিয়ে দিলে?"

"নরকাসুর।"

"সে আবার কে?" হাসিমুখে বেলু জিজ্ঞাসা কল্লে।—

"ভগদত্তের বাবা" গম্ভীর ভাবে বল্লাম।

"হিং টিং ছট, একেবারে জলের মতন তরল!"

"ভগদত্তকে চেনেন না, এসেছেন কামাখ্যা তীর্থ কর্ত্তে। বেহ্ম কোথাকার! বাক্যবিনোদ মশায় শুন্‌লে তোর কাণ মলে দিতেন!"

"ওঃ, ভগদত্ত, তাই বল; তাকে আর চিনি না? ঐ যে দত্ত পাড়ায় বাড়ী?" চোখে কৌতুকের হাসি, মুখ আমাপেক্ষাও গম্ভীর।

এবার আর না হেসে পার্ল্লাম না; তার চোখ মুখের ভাব দেখে বিষম হাসি পেল।—

অগত্যা পাণ্ডাদের মুখে যা শুনেছিলাম, দুই এক কথায় বল্লাম। নরকাসুর আসামের রাজা; ভগদত্ত তাঁহার পুত্র, মস্ত বড় যোদ্ধা।—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরু পক্ষ নিয়ে অর্জ্জুনের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করেছিলেন। এক দিন নরকাসুর কামাখ্যা বেড়াতে এসে মায়ের রূপ দেখে মোহিত হয়ে যায়—ইচ্ছা, মাকে বিয়ে কর্ব্বে।

"মাকে বিয়ে কর্ব্বে? তা না হলে আর নরক-অসুর নাম কেন! সার্থকনামা যা হোক!"

"তার মাকে ত আর নয়, আমাদের মাকে,—কামাখ্যা মাকে।" তার পর মার সঙ্গে চুক্তি হ'ল, মন্দিরে উঠবার রাস্তা করে দিতে হবে—এক রাত্তিরে, কুক্কুট ডাকবার আগে। নরকাসুর তাতেই রাজি—তার যত সব সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে হুড়মুড় করে পাথর দিয়ে রাস্তা বাঁধ্‌তে লেগে গেল।—মা দেখ্‌লেন, বিপদ, রাস্তা যে শেষ হয়! এদিকে এখনো ভোর হতে ঢের দেরী। অম্নি এক অনুচর পাঠিয়ে পাশের পাহাড়ে এক কুক্কুটের গলায় চেপে ধরালেন।—কুক্কুট ধ্বনি প্রভাতের সূচনা কল্লে।—

"নরকাসুর, ভোর যে হয়ে গেল!"

ক্রোধে অসুর খানিকটা রাস্তা অসমাপ্ত রেখেই চলে গেল।

"তবে আর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দোষ কি? ভাল নজীর ছিল।"

"এখান থেকে মাল্লাম তীর,
তীর পড়্‌ল কলা গাছে।
হাটু বেয়ে রক্ত পড়ে। ইত্যাদি"

হাসি চেপে গম্ভীর ভাবে আওড়ালাম।

"তোমার বুদ্ধি দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছে অনুদা! বল্‌ছিলাম কি, তোমরা হল্লা কচ্ছ, গবর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে স্বরাজ দেয় না যুদ্ধের সময় কত খাটিয়ে মাল্লে, কত লোভ দেখালে; যুদ্ধ মিটে গেছে, এখন সব ফোঁসফাঁস! তাই বল্‌ছিলাম, কামাখ্যা মাই ত নজীর রেখেছেন।"

তার পর বল্লে—"চল, একটু বসি, বড্ড পায়ে ব্যথা হয়েছে।"

আমরা প্রায় দুই ধাপ উঠেছি। মুখোমুখি হয়ে দুজনায় দুখানা পাথরে বস্‌লাম। রাস্তার দুই পাশে গুলঞ্চ ফুলের গাছ সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; অসংখ্য ফুল ফুটে আছে, সাদা সাদা ফুলগুলি—রাস্তা আলো করে আছে। গাছগুলি যেন ডালা ভরে ফুল নিয়ে মায়ের মন্দিরে অঞ্জলি দেবার অপেক্ষা কচ্ছে। চারি ধারে কত ফুল পড়ে আছে। এদের মৃদুমন্দ সৌরভে চারিদিক আমোদিত কচ্ছে। হাওয়ায় দুচারিটি ফুল আমাদের গায়ে, আশে পাশে পড়্‌ছে। বেলু কটা ফুল হাতে তুলে নিলে, নাকের কাছে নিয়ে একটু শুঁক্‌লে। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আপন মনে গুন্ গুন্ করে গান ধর্‌লে—

"ছিন্ন করে লও হে মোরে, আর বিলম্ব নয়।
ধূলায় পাছে ঝরে পড়ি, এই লাগে মোর ভয়। ইত্যাদি"

শ্রমকাতর সুকুমার দেহ, কপোলে মুক্তার মতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বেদবিন্দু, গণ্ডে একটু গোলাপী আভা, ঈষদুন্নত বক্ষ দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসে আন্দোলিত, অনভ্যস্ত শূন্য পদযুগল রক্তিমাভ—কে যেন তাতে আল্‌তা পরিয়ে দিয়েছে। উরুর উপর বাম কনুই, তদুপরি বাম গণ্ড স্থাপিত; ঈষৎ আরক্ত মুখে গুন্ গুন্ ধ্বনি; ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ বিভক্ত; চোখ দুইটি স্থির, অপলক—যেন কোন দূর ভবিষ্যতে নিবদ্ধ; দক্ষিণ হস্তের চম্পকাঙ্গুলিতে একটী শুভ্র প্রস্ফুটিত গুলঞ্চ। ঠিক যেন চিত্রকরের সাধনার বিষয়।

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি; হঠাৎ চৈতন্য হ'ল।—ছি ছি!!

(৭)

"খুব ধীরে ধীরে উঠিস্; এবারের ধাপটা বড় উঁচু।"

আমরা আবার চল্‌তে আরম্ভ করেছি। ওরা বরাবর planesএ থাকে; কাজেই পাহাড়ে চড়া ততটা অভ্যাস নাই। তাতে এতটা উঠে শরীরও একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। তাই খুব ধীরে ধীরে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম।

"আপনাদের পাণ্ডা কে?" জনৈক পাণ্ডা জিজ্ঞাসা কর্ল্লে।

"চিন্‌তে পাচ্ছ না, ইনি যে গৌহাটীর অনুজ বাবু" তার সঙ্গী বল্লে। তখন তারা আবার আপন মনে কথা বল্‌তে বল্‌তে নেমে গেল।

"বড্ড খাড়াই; আর যে উঠ্‌তে পাচ্ছি না, অনুদা," একখানা প্রকাণ্ড পাথর দুই হাতে ভর করে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্লে। "আর কত দূর?"

"যত দূর হক ত্বরা চল সেই দেশ
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ!"

"রেখে দাও তোমার কবিতা, প্রাণ যে ওষ্ঠাগত!"

"নে, এক কাজ কর; আমার হাত ধরে ধরে উঠ।"

বলে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলাম। ক্রমে একটু একটু করে উঠতে লাগ্‌ল। একে নিজেই হয়রান্, তাতে আবার বেলুর ভার; হাতে ভর দিয়ে রেখেছে। পাছে ছিট্‌কে পড়ে, তাই হাতখানা খুব এঁটে ধরেছি; ফুলের মতন সুকুমার তার হাত; আমার কঠিন হাতের চাপে একেবারে রাঙ্গিয়ে উঠেছে।

—আর একটু, আর একটু, এবার শেষ! ওঃ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। প্রকাণ্ড একটা অশ্বত্থ গাছ, বেশ ছায়া হয়েছে,—তার শিকড়ের উপর ধপ্ করে দুজনেই বসে পড়্‌লাম। দুজনেই এবার বড় শ্রান্ত। মুখে কথা নাই, চুপ করে বসে আছি। এম্‌নি কতক্ষণ গেল। ক্রমে পাহাড়ের শীতল হাওয়ায় ক্লান্তি কতকটা দূর হ'ল।

"এখানে পাথর নাই কেন? ও বুঝেছি! এখানে

এসেই বুঝি ব্যর্থ প্রেমিকের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছল।" মাটীর রাস্তা দেখে বেলু বল্লে।

আবার বেলুর সহজ চঞ্চল ভাব জেগে উঠেছে।

"তা হবে।"

আমার কণ্ঠস্বরে বোধ হয় কিছু ছিল; হঠাৎ বেলু তাকালে।

"ওঃ, বড্ড হয়রাণ করেছি তোমায় অনুদা!" চোখে মুখে কি কাতরতা!

"দূর্, আমরা ত বরাবরই উঠি।"

"চল, না হয় আর একটু বসি।" আমার কাঁধে হাত চেপে বল্লে। বড় স্নেহমাখা কাতর করুণ কণ্ঠ।

"না, চল্, একেবারে মন্দিরের সাম্‌নে গিয়ে বস্‌ব।" বলেই আবার চল্‌তে লাগলাম।

"এই কামাখ্যা মন্দির!" তোরণদ্বার ডিঙ্গিয়েই একটী মন্দির দেখে বল্লে।

"কামাখ্যা মন্দির আর একটু উপরে, দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্বি। দশমহাবিদ্যার প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা মন্দির এখানে আছে কি না, এ সব সেই মন্দির।"

ক্রমে মন্দিরের সামনে এসে পড়েছি! একটী নারকেল গাছ, নীচে বেশ ছায়া। মন্দিরের দিকে মুখ করে সেখানে বসে পড়্‌লাম।

এমন সময় মালাকর এসে হাজির। জিজ্ঞাসা কল্লে—"পাণ্ডার ওখানে যাবেন না?"

"আপাটাকে নিয়ে যাও; আমরা দর্শন সেরে তবে যাব; ওবেলা নাবব। পাণ্ডাঠাকুরকে বোলো।"

"আচ্ছা" বলে আপাকে নিয়ে মালাকর চলে গেল। একটু পরেই পাণ্ডাঠাকুর এলেন। শুভ্র গৌর দেহ, সদ্যস্নাত, পরিধানে রক্তাম্বর।

—"বাঃ, তোমাদের পাণ্ডাটী ত বেশ।"

"হাঁ, এখানের পাণ্ডারা সবাই বেশ; তাদের ব্যবহারও বেশ ভদ্র।"

বল্‌তে বল্‌তে আমরা মন্দিরে ঢুকলাম।

"ও বাবা, কি অন্ধকার!"

"আমার হাত ধরে ধরে চলিস্; দেয়ালের গায়ে হাত রাখ্‌বি; সিঁড়ি আছে, এক পা এক পা করে নাবিস্। খুব সাবধান!"

সেদিন বড্ড ভিড়। পাণ্ডাঠাকুর সাম্‌নে থেকে টান্‌ছে। বেলু কতকটা ভয়ে, কতকটা ভিড়ের চাপে একেবারে আমার গায়ে গায়ে মিশে গেছে। তার 'শিরিষ-পেলব' সুকুমার দেহের স্পর্শ, তার মৃদুমন্দ নিশ্বাস-প্রশ্বাস বেশ অনুভব কচ্ছি। এবার পীঠস্থানে এসে পৌঁছেছি।

"বসুন"—বলে পীঠস্থানের পুরোহিত বেলুকে বসালে।

"আপনি ওপাশে বসুন" কি মনে করে বল্লে পুরোহিতই জানে। ভিড়ের চাপে দাঁড়াতে পাচ্ছি না—অগত্যা বসে পড়লাম।

যাহোক কোন মতে মন্দিরের কাজ সেরে বেরিয়ে পড়া গেল।

"এমন অন্ধকার কেন?"

"বোধ হয় মন্দিরের গাম্ভীর্য্য বাড়াবার জন্য।"

"আমার ত বাপু ভয়ই বাড়ছিল।"

পাণ্ডার বাড়ী এসেছি; দোতালার উপর একখানা ঘর আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। সুন্দর, পরিষ্কার ঘর। চারিধারে দেয়ালের গায়ে দশমহাবিদ্যা ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙ্গান; দু পাশে দুখানা তক্তপোষ, দুইটী বিছানা পাতা। মাঝে একখানা চেয়ার; সাম্‌নে খোলা বারান্দা।

খাওয়া দাওয়ার পর বেলুকে বল্লুম, "এবার একটু বিশ্রাম করে নে দেখি। ওবেলা আবার ভুবনেশ্বরে উঠতে হবে।"

"আরও উঠা বাকী আছে না কি?" ভয়কম্পিত স্বরে বেলু জিজ্ঞাসা কল্লে।

"দেখবি, কেমন খাসা যায়গা ভুবনেশ্বর।"

"ওঃ, তাই না কি"—বলে বেলু শুয়ে পড়লো।

"বাঃ, বারান্দায় কি সুন্দর হাওয়া," বলে একখানা পাটী টেনে আমিও বারান্দায় শুয়ে পড়লাম।

৭

"এই বেলা চল্, তা না হ'লে নাব্‌তে নাব্‌তে রাত হয়ে যাবে।" এখন আর ৺কামাখ্যা মন্দিরের ধারে ভোরের সে ভিড়, সে চাঞ্চল্য নাই। মন্দিরে প্রণাম ক'রে উভয়ে ভুবনেশ্বরে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম।

"বাঃ, কি সুন্দর হাওয়া।"

ততক্ষণে আমরা পাণ্ডাদের বাড়ী পার হয়েছি।

চারি ধারে একেবারে খোলা। দূরে ভুটানের ও খাসিয়া পাহাড়ের পর্ব্বতমালা দেখা যাচ্ছে।

—"ঐ বাঙ্গলাখানা কোন্ পাণ্ডার? খাসা বাঙ্গলাখানা ত!"

"পাণ্ডার নয়, দ্বারভাঙ্গার মহারাজার বাঙ্গলা ওখানা।"

"মহারাজা বুঝি খুব ধার্ম্মিক? ওঃ"! হঠাৎ একখানা পাথরে হোঁচট খেয়ে বেলু আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লো।

"কিরে, বড্ড লেগেছে না কি?"

"দেখ ত" কাতর কণ্ঠে বলেই পায়ের আঙ্গুলটা চেপে ধর্‌লে। আহাহা! চেয়ে দেখি, নখটা ফেটে গেছে; ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে। চাঁপাফুলের মতন রং, চাঁপার কলির মতন ছোট্ট ছোট্ট আঙ্গুলগুলি—লালে লাল হয়ে গেছে।

"বৌদি পিছু ডেকেছিল; তখনি বুঝেছি, একটা কিছু ঘট্‌বে। তুমিও ত আবার বৌদির কথায় সায় দিলে। এখন দেখ ত! ওঃ, আঙ্গুলটা একেবারে গেছে!"

খালি পায়ে উঠতেই কতটা বেগ পেতে হয়েছে, সে কথাটা বলে আর তার ব্যথাটা বাড়ান আবশ্যক মনে কর্ল্লাম না। কুঁজোতে চায়ের জল ছিল। আপাটার কাছ থেকে একটু চেয়ে নিয়ে রুমালটা ভিজিয়ে নিলাম। একটা ধার ছিঁড়ে ফেলে আঙ্গুলটা বাঁধবার মতন করে নিলাম।

"আহা, রুমালটা ছিঁড়ে ফেল্লে!"

"তুই আর একটা বানিয়ে দিস্ এখন। এ জন্যই শাস্ত্রে বলে, 'পথে নারী বিবর্জ্জিতা।' তোরা একটা না একটা গোল বাধাবিই।" আঙ্গুলটা বাঁধতে বাঁধতে গম্ভীর ভাবে বল্লাম।

"কোন্ শাস্ত্রে এ ব্যবস্থা আছে? আমরা সাত বছরে বিধবা হলে নির্জ্জলা উপবাসের বিধান যে শাস্ত্রে, তাতে বোধ হয়।"

"বথামি করিস্ নে! দুপাত ইংরাজী পড়ে ধরাকে সরা ভাবতে শিখেছিস।"

"তা এত চোট্‌পাট কেন বাপু! বর্জ্জন করে গেলেই ত পার। এই পুণ্যতীর্থে শাস্ত্রের শাসন লঙ্ঘন কল্লে আরও কোন্ বিপদ ঘটে, কে জানে।"

"আচ্ছা, তা দেখা যাবে তখন। এবার ওঠ।"

"বল্লে ত ওঠ, কিন্তু উঠতে পাচ্ছি কৈ?"

বাস্তবিক, তাদের ত আর আমাদের মতন 'লোহা-পেটা' শরীর নয়? আঙ্গুলটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুলে উঠেছে। ধীরে ধীরে হাত ধরে তুল্‌লাম।

"একটা লাঠি টাঠি দিতে পার? হাঁট্‌তে পাচ্ছি না।"

"এখানে লাঠি পাব কোথায়? নেঃ, এক কাজ কর। আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল্। মন্দির ত ঐ দেখা যাচ্ছে।"

আপাটাকে বল্লাম, এগিয়ে গিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিতে। আমরা ধীরে ধীরে উঠ্‌ছি। হঠাৎ বেলু বল্লে "অনুদা, তুমি কপালকুণ্ডলা পড়েছ নিশ্চয়।" কি মনে করে বলেছে, মনে হতেই আমি হেসে উঠ্‌লাম। বেলু কিন্তু দেখ্‌লাম, কেন জানি না, সে হাসিতে যোগ দিল না। সে কেমন যেন একটু গম্ভীর, একটু অন্যমনস্ক। ক্রমে উঠ্‌ছি। স্কন্ধে হাতের চাপ যেন ক্রমেই একটু বাড়ছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন ক্রমেই একটু দ্রুত। পা-টা বোধ হয় বড্ড কন্‌কন্ কচ্ছে! তাই ধীরে, আরও ধীরে, একপা একপা করে এগুচ্ছি।

নীরব নির্জ্জন এস্থান, চারিদিক গুল্মলতায় সমাচ্ছন্ন; মধ্যে সঙ্কীর্ণ রাস্তা। সূর্য্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। এমন সময়ে কে এ তরুণী, উদ্ভিন্ন-যৌবনা, অপরূপ-রূপলাবণ্যময়ী—এই যুবকের স্কন্ধে ভর দিয়ে একান্ত নির্ভয়ে ধীর পাদক্ষেপে চলেছে? বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত রূপ রস গন্ধ নিঙড়িয়ে যেন তার সুকুমার দেহলতাকে পরিপূর্ণ সুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছে!—এ কি বেলু?

ক্রমে ভুবনেশ্বরে এসে পৌছলাম। চায়ের জল ফুট্‌ছিল। বেলু নিপুণ হস্তে চা তৈয়ার করে ফেল্লে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একখানা প্রকাণ্ড পাথর, পাথরের পূর্ব্বে নদী। নদীর দিকে মুখ করে পাথরে ঠেস্ দিয়ে বসে আমরা চা খেলাম।

"চায়ের বাসনগুলি নিয়ে নেবে যা। নীচে জল পাবি, ধুয়ে রাখিস্। মটর দাঁড়াতে বলিস্" বলে আপাটাকে বিদায় দিলাম।

আমি তেম্‌নি বসে আছি। বেলু উঠে ঠিক আমার মাথার উপরের পাথরে বস্‌লে—আধশোয়া, আধবসা গোছের। প্রস্ফুটিত কমলের মতন সুকুমার মুখখানা হস্তের উপর স্থাপিত, একটু কাত হয়ে নদীর দিকে মুখ করে আছে; মাথা আমার মাথার ঠিক উপরে।

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, তার শেষ কিরণরেখা পাহাড়ের গায়ে বিদায়ের চুম্বনের মতন লেগে আছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা সমীরণ বইছে, মৃদু মধুর সুশীতল হাওয়ায় সমস্ত গ্লানি, সমস্ত অবসাদ কেটে গেছে। গুলঞ্চ ফুলের সুবাস হাওয়ার সাথে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। বেলুর অঞ্চল সে হাওয়ায় দুল্‌ছে, উন্মুক্ত কবরী সে হাওয়ায় নড়্‌ছে, দুই একটী শিথিল গুচ্ছ সে হাওয়ায় উড়ছে, তার কপোলে, গণ্ডে, আমার স্কন্ধে পড়ছে। কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই।

ক্রমে গোধূলির আলো নিবে আস্‌ছে, সর্ব্বত্র কেমন একটু আবছায়ার মতন। নীচে বিস্তীর্ণ ব্রহ্মপুত্র নদ নীরব নিস্তব্ধ—বৃহদাকার হ্রদের মতন দেখাচ্ছে। যে ব্রহ্মপুত্র মা কামাখ্যার পাদপীঠ ধৌত করে কুলুকুলু নাদে তাঁর পুণ্যময় কীর্ত্তিগাথা গেয়ে দেশ দেশান্তরে চলে যাচ্ছিল, কাহার হস্তের ইঙ্গিতে যেন অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারিদিকে কেমন যেন একটা বিরাট নিস্তব্ধতা; সবাই যেন উন্মুখ হয়ে বসে আছে কি এক অঘটনের প্রতীক্ষায়। যেন মাতা বসুমতী তাঁর মুমূর্ষু সন্তানকে বক্ষে করে বসে আছেন,—উদ্বেগ-কাতর, অপলক নয়নে, তার বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখপানে চেয়ে। পৃথিবীর যা কিছু চাঞ্চল্য, যা কিছু ব্যাকুলতা, সব যেন লোপ পেয়ে গেছে।

এম্‌নি ধারা বসে আছি—কি ভাব্‌ছি ঠিক বল্‌তে পারি না। কিন্তু কেমন একটা নূতন, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অনুভূতি হৃদয়ে জাগ্‌ছে—যার কাছে এই মন্দির, এই পুণ্যতীর্থ, নদনদী পাহাড় পর্ব্বত—প্রকৃতির যত সব অতুলনীয় সম্পদ—সব যেন নিতান্ত তুচ্ছ, নিতান্ত অসম্ভব মনে হচ্ছে। আমি যে কি তাই যে ঠিক উপলব্ধি কর্ত্তে পাচ্ছি না। আমার যে আরও একটা সত্ত্বা আছে—একটী পবিত্র লতা যে আমাকে একান্ত বিশ্বাসে জড়িয়ে আছে, তার ফুল ফল দিয়ে সার্থক কর্ব্বার জন্য উন্মুখ হয়ে আমার পানে চেয়ে আছে—আমার সঙ্গে সঙ্গে যে তার সরল সুন্দর পুণ্যময় অস্তিত্ব একেবারে লয় পাবে—এসব কিছুই মনে হচ্ছে না। কি এ অনুভূতি—যার কাছে জীবন মরণ, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, ইহকাল পরকাল সব ভেসে যাচ্ছে। কি এ অনুভূতি, যার কাছে সম্মুখের তরঙ্গায়িত অনন্তবিস্তার পর্ব্বতমালা, দূরের, অতি দূরের ক্ষীণ চক্রবালরেখা, উপরের বিস্তৃত, অনন্ত প্রসারিত, উন্মুক্ত আকাশ—উহারাও যেন নিতান্ত সান্ত মনে হচ্ছে—এদের ভিতরেও যেন স্থানাভাবে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠ্‌ছে। আরও দূর—আরও দূর—আরও অনন্ত—এ বিশ্বে কোন আবরণ, এ অনন্ত পথের মাঝে কোন বাধা সহিতে যেন মন একেবারেই প্রস্তুত নহে!

কি এক অপূর্ব্ব আবেগে দেহ মন বিভোর হয়ে উঠ্‌ছে—মনে হচ্ছে এ জগতে আর কিছু নাই—কেবল দুইটী নরনারী। ঐ যে ক্ষুদ্র নৌকা—নদীর মাঝখানে ধীর নিশ্চল—ওতে কে আরোহী? সুধু দুইটী নরনারী! ঐ যে পর্ব্বতমালা, অনন্ত প্রসারিত—ওতে কারা বাঁস করে—সুধু দুইটী নরনারী! ঐ যে, অনন্ত আকাশ, ঐ যে অফুরন্ত বাতাস—ওতে কে আছে? আর কেহ নয়—সুধু দুইটী নরনারী! এম্‌নি বিভোর হয়ে ভাব্‌ছি, হঠাৎ কেমন করে অতর্কিতে উদ্বেলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল—

—"বেলু"—

—"অনু"—

কি মধুর প্রাণোন্মাদকারী সে স্বর—যেন দূরাগত সঙ্গীতের মতন কর্ণে এসে পৌছল! যেন ব্রজের বাঁশরীর মতন কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মস্থানে আঘাত কর্ল্ল—শরীরের প্রতি লোমকূপ, প্রতি অণুপরমাণুতে যেন কি এক মাদকতা ঢালিয়া দিল!

আবার—আবার ডাকলাম—"বেলু!"

আবার—আবার শুনলাম—"অনু!"

কতকাল, কত যুগ ধরে যেন দুইজন ঐ কথাই বল্‌ছি, ভাষায় যেন আর কোন কথা নাই, অভিধানে যেন আর কোন শব্দ নাই—এক মাত্র এই দুইটী শব্দ—উহাতেই মানবের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত সাধনা গ্রথিত, পুঞ্জীভূত।

উভয়ে ঠিক তেমনি ধারা বসে—নীরব, নিথর। কতক্ষণ? কে বলিবে কতক্ষণ? ঘড়ি ধরে বুঝি সে সময়ের গণনা হয় না! কেবল এই অনুভূতির তীব্রতা দ্বারাই বুঝি ইহার পরিমাণ সম্ভব।

হঠাৎ স্কন্ধে যেন কিসের শীতল স্পর্শ অনুভব কর্‌লাম। দেখি, বেলুর মুখ আমার স্কন্ধের উপর। ডান হাত দিয়ে ধীরে, অতি ধীরে তাহার সমস্ত মস্তক স্পর্শ কর্‌লাম,—গায়ক যেম্‌নি করে তার সাধের বীণাকে স্পর্শ করে, চিত্রকর যেম্‌নি করে তার অতি সাধের চিত্রকে স্পর্শ করে, সাধক যেম্‌নি করে তাহার একমাত্র আরাধ্যকে স্পর্শ করে—তেম্‌নি করে

স্পর্শ করলাম। কি তড়িৎ-প্রবাহ যেন দেহের উপর দিয়ে বয়ে গেল—কি এক অপূর্ব্ব পুলকে যেন দেহ, মন, হৃদয়ের অন্তস্তল শিউরে উঠ্‌ল।

আবার ডাকলাম—বেলু! জবাব পেলাম্ না। তাকিয়ে দেখি, বেলু কাঁদছে; উঃ, সে কি কান্না! কাধের উপর মুখ রেখে ফুঁ ফিয়ে ফুঁ ফিয়ে বেলু কাঁদছে—যেন এক প্রবল ভূমিকম্প দেহের ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, দেহ-মন ভীষণ ভাবে আলোড়িত করে দিচ্ছে! বক্ষঃ বিদীর্ণ করে যেন ধূম্র, কর্দ্দম, বাষ্প, সমস্ত আবর্জ্জনারাশি নিঃশেষে বের হয়ে যাচ্ছে। সে কান্নার আর বিরাম নাই, সে অশ্রুর আর শেষ নাই—এ যেন গোমুখীর অনন্ত নিঃস্রাব—এ যেন পূত মন্দাকিনীধারা, যাতে ধৌত করে দেয় পৃথিবীর সমস্ত পাপতাপ—সমস্ত কলঙ্ক-কালিমা।

বল্‌তে পার্ব্ব না কেমন করে হল, বুঝাতে পার্ব্ব না, কিন্তু ধীরে ধীরে সেই বাল্যের স্মৃতি হৃদয়ে জেগে উঠ্‌ল—সেই আমাদের পল্লী, সেই স্কুল, সেই মা, বাবা, সেই মান, অভিমান—সেই ছোট্ট বেলু—সেই সহজ সরল স্নেহ-ভালবাসা।

ডাক্‌লাম—"বেলু, দিদি, বোন্!"

—"অনুদা!"

তৎক্ষণে গোধূলি অতীত, শুভ্র মেঘাচ্ছাদিত অষ্টমীর চাঁদের ম্লান আলো ফোটফোট। কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে এদের ভিতর পবিত্র সন্ধি হয়ে গেছে বুঝ্‌তে পারি নাই।

"চল্ বোন, বড্ড দেরী হয়ে গেল।"

"চল অনুদা, বৌদি না জানি কত ভাব্‌ছে।"

একখণ্ড মেঘ চাঁদকে হঠাৎ ঢেকে ফেল্লে।

—"ঝড়টড় আসবে না ত?"

—"আস্‌ছিল—কেটে গেছে।"

(৮)

'মোটর' এসে বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াল। শিউলিকে বারান্দায় দেখলাম না। কোথায় সে? মনটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌ল।

"মার বড্ড অসুখ করেছে বাবু" ঝি-টা বল্লে।

"কি অসুখ রে? কখন হল?" বল্‌তে বল্‌তে দুজনা ছুটে শোবার ঘরে ঢুক্‌লাম। দেখি, শিউলি বিছানায় শুয়ে। মাথায় হাত দিলাম—উঃ, কি গরম!

"কখন জ্বর এল?"

"তোমরা যাওয়ার পর থেকেই গা-টা কেমন কচ্ছিল। দুপুর থেকে জ্বরটা জোরে এসেছে।"

একটু থেমে বল্লে "তোমাদের জন্য বড্ড ভাবনা হচ্ছিল, দেরী দেখে।"

রাত্রিতে ভাল করে ঘুম হ'ল না। কেমন যেন একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা প্রাণে জাগ্‌তে লাগ্‌ল। মনকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম, কারো কি জ্বর হয় না? সেরে যাবে এখন। কিন্তু কোথায়? ও কথায় যেন মন প্রবোধ পেলে না।

আরও দুই দিন গেল। জ্বরের বিরাম নাই, একটু একটু কাসি আছে। ডাক্তার বুক পরীক্ষা করে বল্লেন—নিউমনিয়া হয়েছে।

"—কি হবে ডাক্তার বাবু?" আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম।

"এত অস্থির হচ্ছেন কেন? এখনো তেমন কিছু হয় নি। একটু সাবধান থাক্‌লেই আর বাড়তে পার্ব্বে না।"

—আরও দুই দিন গেল। কৈ? তবু ত উপশম হয় না। ডাক্তারের মুখ কাল।

হায় হায়! কি হবে আমার! আমার শিউলি, আমার প্রাণের শিউলি। ওগো ভগবান, এ কি তোমার বিধান? ভগবানকে ডাক্‌তে লাগ্‌লাম। কিন্তু এ কি! ডাক্‌তে যে পারি না—মন যে বসাতে পারি না। ও কার কথা, কার চেহারা মনে আস্‌ছে। "মা কামাখ্যা, দয়া কর মা" করযোড়ে কাতর কণ্ঠে ডাক্‌ছি। মায়ের স্বরূপ হৃদয়ে উপলব্ধি কর্ব্বার জন্য চক্ষু মুদিত কর্চ্ছি। আহা হা—ঐ যে মা আমার—কি সুন্দর মায়ের মুখ, কি স্নেহমাখা তাঁর চাহনি—কিন্তু এ কি?—এ যে উদ্ভিন্ন-যৌবনা, ঈষৎ আলুলায়িতকুন্তলা কে এক নারী! এই কি মা? প্রস্তরখণ্ডে যেন বসে আছে, হস্তে প্রস্ফুটিত গুলঞ্চপুষ্প, গুন্ গুন্ স্বরে গান কচ্ছে!—এ কি শাস্তি ভগবান!

শিউলির পাশে যাই—অনভ্যস্ত হস্তে শুশ্রূষা কর্ত্তে চেষ্টা করি—সব গোলমাল হয়ে যায়। চুপ্ করে বসে থাক্‌তে চাই—পারি না, কে যেন অনবরত কশাঘাত কচ্ছে। ইতস্ততঃ হাঁটছি, ছট্‌ফট্ কচ্ছি, নিজের চুল নিজে ছিঁড়ছি।

আমি কি কর্ব্ব? কোথায় যাব? আবার বসি, আবার ভাব্‌তে চেষ্টা করি।

"ত্বম্ আদি দেব পুরুষ-পুরাণ
ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বং অনন্ত রূপ।

হৃদয় মন সংযত করে আভূমি প্রণিপাত কচ্ছি আমার মায়ের সে রাজিব চরণে। কি সুন্দর আরক্ত পদযুগল, কি সুন্দর চম্পকাঙ্গুলি—ক্রমে দেখ্‌ছি উহারা যেন লাল হয়ে উঠ্‌ছে! চম্‌কে উঠ্‌লাম—হায়, হায় এ কি?

৺কামাখ্যা পীঠস্থান। কত লোক দেশ-দেশান্তর থেকে এখানে আস্‌ছে, মানত করে, পূজো দিতে। আমি মন্দির-দ্বারে বাস করি—এত বড় সৌভাগ্য আমার। সে দ্বার আজ আমার পক্ষে অবরুদ্ধ। এ কি দারুণ অভিশাপ!

—মা, তোর নাম নিতে পার্ব্ব না, তোকে ডাকতে পার্ব্ব না? তবে আর কার কাছে যাব মা? কার দিকে তাকাব দয়াময়ী? আমার শিউলির জন্য কার কাছে হাত পাতব, কার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা কর্ব্ব? ওঃ, বুক যে ফেটে যায়। করুণা কর্ মা, করুণা কর্। তোর এ অভিশাপ ক্ষণকালের জন্য সরিয়ে নে মা। একবার আমায় প্রাণ খুলে ডাক্‌তে দে। শিউলি ত যাবেই—মনের শান্তির জন্য একবার তোর স্বরূপ হৃদয়ে অনুভব কর্ত্তে দে। এ শান্তি দে মা, যে শিউলির জন্য তোকে একবার একাগ্র মনে ডাক্‌তে পেরেছিলাম। তার পর আমার সমস্ত জীবন অভিশপ্ত করে দে—মাথা পেতে নেব তোর শাসন।

আর ভাবতে পাচ্ছি না, ক্রমে যেন সংজ্ঞা লোপ হল। আধ-ঘুম, আধ-জাগা—এমন সময় যেন শুন্‌তে পাচ্ছি কে বল্‌ছে—

"বুকটা ত অনেকটা পরিষ্কার বোধ হচ্ছে; জ্বরটাও ত বেশ নেবেছে।"

ধড়ফড় করে উঠ্‌লাম—তবে কি মা তোর দয়া হল? সাত দিন পরে জ্বর ত্যাগ হল।

"বেলু, আর জন্মে তুই আমার মায়ের পেটের বোন ছিলি নিশ্চয়"—শিউলি বল্লে।

উঃ, কি সেবাটাই করেছে বেলু! মূর্ত্তিমতী সেবার ন্যায় বসে থাক্‌ত শিউলির পাশে। দিবারাত্রি জ্ঞান নাই; আহার-নিদ্রা নাই। ধীর, স্থির। কোথায় ছিল তার স্বাভাবিক চঞ্চলতা! সে কি সেবা! মানুষে বুঝি তেমন পারে না।

শিউলি বল্লে—"অনুদা পাগল হয়ে যেত তোমার কিছু হলে। যা হোক, ভগবান বাঁচিয়েছেন।"

শিউলির রোগক্লান্ত পাণ্ডুর মুখখানা একটু রাঙ্গিয়ে উঠ্‌ল। সলজ্জ মৃদু হাস্য করে আমার দিকে একটু তাকালে।

কাল বেলু চলে যাবে। তা যাবেই ত। তার সমস্ত জীবন সম্মুখে। নিশ্চয় জানি, এ জীবন ব্যর্থ হবে না। ভগবান তার জীবনকে সার্থক কর্ব্বেন।

সন্ধ্যায় খোলা বারান্দায় বসে আছি। শিউলি এক-খানা আরাম-কেদারায় বসে—আমরা দু'জন তার দুপাশে। কৃষ্ণ-দ্বিতীয়ার চাঁদ একখানা রৌপ্য-থালার মতন পাহাড়ের গা দিয়ে ভেসে উঠ্‌ছে। বেলু গাইছে—

আমারেও কর মার্জ্জনা
আমারেও দেহ নাম অমৃতের কণা—ইত্যাদি।"

কি মধুর তার কণ্ঠস্বর। নয়ন বেয়ে ধারা বইছিল। এ কি আত্ম-নিবেদন তার বিধাতার কাছে!

হাস্‌নাহানার মৃদু সৌরভ বারান্দার হাওয়া আমোদিত করে তুল্‌ছে; গৃহ, আকাশ, বাতাস সর্ব্বত্র যেন আন্দোলিত হচ্ছে সে সঙ্গীতের তরঙ্গ, সে গানের মূর্চ্ছনা—কেবলি যেন শুন্‌তে পাচ্ছি—

"আমারেও কর মার্জ্জনা"—

বিবিধ-প্রসঙ্গ

প্রাচীন-ভারতে কাম্বোজ জাতি

ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি

প্রাচীন সংস্কৃত ও বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে কাম্বোজদের নাম বহু স্থানে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সুতরাং এই জাতিটি খ্যাতি প্রতিপত্তি ও শক্তিতে প্রাচীন-ভারতে যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ কাম্বোজেরা প্রাচীন বৈদিক জাতিগুলিরই অন্তভুক্ত একটি জাতি ছিল। সাম-বেদের বংশ ব্রাহ্মণে বৈদিক ঋষিদের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেই সর্ব্বপ্রথমে কাম্বোজদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তালিকায় একজন ঋষির নাম—কাম্বোজ ঔপমন্যব অর্থাৎ উপমন্যুর পুত্র কাম্বোজ (পণ্ডিত সত্যব্রত সাম-শ্রমীর সম্পাদিত বংশ ব্রাহ্মণ)। ঋষি আনন্দজ শরকরাক্ষের পুত্র সাম্ব এবং উপমন্যুর পুত্র কাম্বোজের নিকট হইতে বেদ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আনন্দজ দুই জন গুরুর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এ কথা বলার তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝা কঠিন। কারণ এক গুরুর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করাই তখনকার কালের প্রথা ছিল। অবশ্য কোনো বিশেষ অবস্থায় এ প্রথার পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নয়। তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায়, আনন্দজের প্রথম গুরু ছিলেন সাম্ব, তাহার পর তিনি কাম্বোজের নিকট অধ্যয়নের জন্য উপস্থিত হন। কাম্বোজের বেদ-সম্বন্ধে বিশেষ এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যই সম্ভবতঃ আনন্দজের ভিন্ন গুরু গ্রহণের কারণ। ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের ভিতর কাহারো কাহারো মতে কাম্বোজেরা ছিল ইরাণিয়ান জাতির লোক; কিন্তু এ মত যে সত্য নহে, প্রাচীন বৈদিক যুগে তাহারা যে ভারতীয় বৈদিক জাতিগুলিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, পূর্ব্বোক্ত ঘটনা তাহার প্রমাণ। বৈদিক ঋষিদের এই তালিকাতেই পাওয়া যায় যে, আনন্দজের উভয় শিক্ষকই একই ঋষির নিকট হইতে বেদ-সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন—সাম্ব শরকরাক্ষ এবং কাম্বোজ ঔপমন্যব—এই উভয়েরই বেদ পাঠের গুরু ছিলেন—মদ্রগার সৌঙ্গায়ণি। মদ্র সৌঙ্গায়ণি ছিলেন মদ্র-বংশোদ্ভব। (Vedic Index, I. p. 138) মদ্র এবং কাম্বোজের সঙ্গে এই যে যোগাযোগ, ইহা খুবই স্বাভাবিক। কারণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে এই দুইটি জাতি একরূপ গায়ে গায়ে মিশিয়াই বাস করিত।

ঋগ্বেদে কাম্বোজদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঋগ্বেদের যুগেও যে তাহারা বৈদিক আর্য্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহার প্রত্যক্ষ না হউক পরোক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। লুডউইগ দেখাইয়াছেন, ঋগ্বেদের স্তোত্রেও ঋষি উপমন্যুর নামের উল্লেখ আছে (ঋগ্বেদ ১,১০২.৯); এবং এই উপমন্যুই যে বংশ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত কাম্বোজ গুরুর পিতা ছিলেন, এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এই রকমের একটা সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জিমার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (Altindisches Leben, p. 102) এই সব অনুমান এবং সিদ্ধান্তের মূল্য যাহাই হোক্ না কেন, এ-সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ নাই যে, কাম্বোজের একজন লোক সেই সব ঋষিদের তালিকার ভিতরে স্থান লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা সেই প্রাচীন যুগে বেদের আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার বিস্তারে সাহায্য করিয়াছেন। বৈদিক-যুগে কাম্বোজেরা যে ভারতীয় বৈদিক-জাতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় ছিল, তাহাতেও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

তাহার পর কাম্বোজদের উল্লেখ পাওয়া যায় যাস্কের নিরুক্তে। এই গ্রন্থের একটি স্থানে আছে যে কাম্বোজেরা বৈদিক ভাষাই ব্যবহার করিত। তবে সে ভাষা যাস্কের সময় মধ্য-দেশে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ছিল। যাস্ক দেখাইয়াছেন যে, কাম্বোজেরা 'শবতি' ক্রিয়া পদটি তাহার আদিম অর্থ 'যাওয়া' বুঝাইতে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু মধ্যদেশের ব্যবহারে এ অর্থ লোপ পাইয়া গিয়াছিল। তখনকার প্রচলিত ভাষায় ইহা রূপান্তরিত হইয়া 'শব' এই শব্দরূপে ব্যবহৃত হইত এবং ইহার ক্রিয়া-বাচক পদটির ব্যবহারও দেখা যাইত না। অনেকে এই ব্যাপার হইতেই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কাম্বোজেরা ভারতীয় জাতি ছিল না, তাহারা আইরেনিয়ান ছিল। এ যুক্তি মোটেই সারবান বলিয়া মনে হয় না। যাস্কের মতানুসারে বরং মনে হয় যে, কাম্বোজেরা বৈদিক জাতিই ছিল; এবং তাহাদের দ্বারা প্রাচীন ক্রিয়াপদগুলির আদিম অর্থ কোনও রূপে বিকৃত হয় নাই; কিন্তু বৈদিক জাতির অন্যান্য অংশ, যাহারা ভৌগোলিক ব্যবধানের দ্বারা বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা এই সব ক্রিয়াপদের আদিম অর্থ বজায় রাখিয়া চলিতে পারে নাই।

সার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন বলেন, "শব এবং শবথি" এই দুইটি শব্দের ধাতুগত উৎপত্তির যোগাযোগের সত্যাসত্য লইয়া আলোচনা না করিলেও, ইহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, যাস্কের মতে কাম্বোজেরা আর্য্য ছিল না। তাহারা সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করিত বটে, কিন্তু তাহাদের সে ভাষার সহিত মূল ভাষার পার্থক্যও ছিল বিস্তর। শবতি শব্দ সংস্কৃত ভাষার কোথাও পাওয়া যায় না, উহা আইরেনিয়ান শব্দ।' মোটের উপর সার জর্জ্জের মতে কাম্বোজেরা ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি অসভ্য জাতি; তাহাদের ভাষা ছিল হয় আইরেনিয়ান শব্দ-বহুল সংস্কৃত ভাষা না হয় এমন একটি ভাষা যাহার কতকগুলি শব্দ ছিল ভারতীয় আর্য্যদের ভাষা, হইতে উদ্ভূত, এবং আর কতক শব্দ ছিল, আইরেনিয়ানদের প্রথা হইতে উদ্ভূত। (১)

(১) J. R. A. S. 1911, pp. 801-802.

যাস্ক কাম্বোজ নামটিতেও একটি ধাতু-গত অর্থ আরোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টাও সম্যক সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি বলিয়াছেন, কম্বল ভোজ হইতেই কাম্বোজ নামের উৎপত্তি। তাহারা উক্ত পশ্চিম-ভারতের মালভূমিতে বাস করিত এবং এই অঞ্চলের নিদারুণ শীত হইতে আত্ম-রক্ষার জন্যই কম্বলের ব্যবহার তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। কম্বোজ 'কম' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'কমনীয় ভোজ' অর্থ সুখকর দ্রব্য উপভোগ করিত বলিয়াই তাহাদের নাম কাম্বোজ। কম্বল যে ভারতের এই শীতপ্রধান অঞ্চলটাতে খুবই আরামপ্রদ জিনিষ ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি পণ্ডিতেরা যাস্কের এই ভাবে কম ও কম্বলের সহিত ভাষাগত সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা এবং এই দুইটি শব্দের সহিত কাম্বোজের সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইতে রাজী নহেন। কাম্বোজেরা যে কম্বলের কারবার করিত, তাহার উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় কাম্বোজ-রাজ যুধিষ্ঠিরকে "অনেক উৎকৃষ্ট চর্ম্ম, পশমের কম্বল, মাটির গহ্বরে বাস করে এমনি সব পশু এবং বিড়ালের লোমের দ্বারা তৈয়ারী সোনার সূতার কাজ করা কম্বলও উপহার দিয়াছিলেন।" (২) মহাভারতের আরও এক স্থানে এই কম্বল দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে আছে, কাম্বোজ-রাজের নিকট হইতে যুধিষ্ঠির কালো, গাঢ় এবং লাল রঙের 'কদলি' নামক হরিণের হাজার হাজার চামড়া, এবং উৎকৃষ্ট জমিনের কম্বলও উপহার পাইয়াছিলেন। (৩)

ইহার পর কাম্বোজের উল্লেখ পাওয়া যায় পাণিনিতে। পাণিনির একটি সূত্রে কম্বোজল শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাঃ ডি, আর ভাণ্ডারকর বলেন, কম্বোজ শব্দটি কেবল মাত্র কম্বোজ দেশ এবং কম্বোজ জাতি বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইত না, ইহার দ্বারা কম্বোজের রাজাকেও বুঝাইত। কিন্তু এই কম্বোজের অনুরূপ আরো কতকগুলি শব্দ আছে, যাহার ব্যবহার পাণিনির ভিতর পাওয়া যায় না। সেই জন্যই কাত্যায়ন পাণিনির পূর্ব্বোক্ত সূত্রটি একটু রূপান্তরিত করিয়া লিখিয়াছেন—কম্বোজাদিভ্যো=লুগ—বচনম্ চোড়াদ্যর্থম্। অর্থাৎ কম্বোজ শব্দটির মত চোড়, কদের, কেরল প্রভৃতি শব্দ কেবলমাত্র দেশ বা জাতিকে বুঝায় না—তাহাদের রাজাকেও বুঝায়। (৪)

টি. ডব্লিউ. রিজ ডেভিড্সের মতে কম্বোজ দেশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত ছিল এবং দ্বারকা ছিল উহার রাজধানী। (৫) কাম্বোজদের রাজধানী সম্বন্ধে এস, কে, আয়াঙ্গার টি, ডব্লিউ রিজ ডেভিড্সের সঙ্গে একমত। বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশ ও গুজরাটকেই তিনি কম্বোজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। (৬) ডাঃ পি এন ব্যানার্জ্জিও তাঁহার Public Administration in Ancient India নামক গ্রন্থে মানিয়া লইয়াছেন যে, বর্ত্তমান সিন্ধু-প্রদেশের নিকটেই কাম্বোজ অবস্থিত ছিল এবং তাহার রাজধানীর নাম ছিল দ্বারকা। (৭ ধর্ম্মপালের প্রেতবস্তুর টীকায় কাম্বোজের সঙ্গে-সঙ্গেই দ্বারকার উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু দ্বারকা যে কাম্বোজেরই রাজধানী ছিল, এ কথার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ তাহার ভিতর পাওয়া যায় না। (৮) ভি, এ, স্মিথ মনে করেন, কাম্বোজ হয় তিব্বত, না হয় হিন্দুকুশের পর্ব্বতমালার ভিতর কোনও এক স্থানে অবস্থিত ছিল। (৯) এবং তাহাদের ভাষা ছিল আইরেনিয়ান। ম্যাকক্রিণ্ডেলের মতে কাম্বোজ ছিল আফগানিস্থানেরই নাম; এবং হিউয়েন সংএর কাফুই (কম্বু) ছিল কাম্বোজ। (Me. Crindle, Alexander's Invasion, p. 38) মিঃ আর, ডি, ব্যানার্জ্জির মতে কম্বোজ বা কম্বোডিয়া সুমাত্রার পূর্ব্ব-প্রান্তে অবস্থিত ছিল। (১০) কিন্তু তাঁহার এই কাম্বোজ গান্ধারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমাদের মহাজনপদ কাম্বোজ নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ডাঃ ডি, আর, ভাণ্ডারকর বলেন, "কাম্বোজ যে কোথায় ছিল তাহা নির্দ্দেশ করা ভারি কঠিন। কাহারও কাহারও মতে কাম্বোজেরা উত্তর হিমালয়ের একটি জাতি ছিল, আবার কাহারও কাহারও মতে তাহারা ছিল তিব্বতীয় জাতি। কিন্তু আমাদের মতে তাহারা সম্ভবতঃ সিন্ধুনদের উত্তর পশ্চিমে বাস করিত এবং পারস্য শিক্ষালিপিতে যে কাম্বোজিয় নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহারাই সম্ভবতঃ কাম্বোজ। কিন্তু কোথায় যে তাহাদের রাজধানী ছিল তাহা জানা যায় না।" (১১) বৈদিক সূচিপত্রেও (Index) ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতেরই সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেও আমরা দেখিতে পাই যে কাম্বোজেরা সিন্ধুনদের উত্তর পশ্চিম তীরেই বাস করিত এবং প্রাচীন পারসীক শিলালিপিতে যে কম্বুজিয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারাই কাম্বোজ। স্যার চার্লস ইলিয়টের মতে, কাম্বোজেরা ছিল সম্ভবতঃ তিব্বতীয় জাতি। (১২) তাঁহার Hinduism & Buddhism নামক গ্রন্থের আর একটা খণ্ডে তিনি বলিয়াছেন, কাম্বোজেরা কোন্ জাতি ছিল তাহা নিশ্চয়

(২) মহাভারত—অধ্যায় ৫১,৩।

(৩) Ibid, Chap. 48, 19.

(৪) Dr. D. R. Bhandarkar, Carmichael Lectures 1918, pp. 6-7.

(৫) Buddhist India, p, 28.

(৬) S. K Aiyangar, Ancient India, p. 7.

(৭) p. 56.

(৮) Paramattha dipani on the Petavatthu, P.T.S. p, 113. Vide also my the Buddist Conception of spirits, p. 81, foll.

(৯) Early History of India p. 184.

(১০) Vangalar Ithasa, Vol. 1. p. 95

(১১) D. R. Bhandarkar, Carmichael Lectures 1918, pp. 54-55.

(১২) Hinduism & Buddhism, Vol. 1, p. 268.

বিবিধ-প্রসঙ্গ

প্রাচীন-ভারতে কাম্বোজ জাতি

ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি

প্রাচীন সংস্কৃত ও বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে কাম্বোজদের নাম বহু স্থানে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সুতরাং এই জাতিটি খ্যাতি প্রতিপত্তি ও শক্তিতে প্রাচীন-ভারতে যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ কাম্বোজেরা প্রাচীন বৈদিক জাতিগুলিরই অন্তর্ভুক্ত একটি জাতি ছিল। সাম-বেদের বংশ ব্রাহ্মণে বৈদিক ঋষিদের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেই সর্ব্বপ্রথমে কাম্বোজদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তালিকায় একজন ঋষির নাম—কাম্বোজ ঔপমন্যব অর্থাৎ উপমন্যুর পুত্র কাম্বোজ (পণ্ডিত সত্যব্রত সাম-শ্রমীর সম্পাদিত বংশ ব্রাহ্মণ)। ঋষি আনন্দজ শরকরাক্ষের পুত্র সাম্ব এবং উপমন্যুর পুত্র কাম্বোজের নিকট হইতে বেদ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আনন্দজ দুই জন গুরুর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এ কথা বলার তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝা কঠিন। কারণ এক গুরুর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করাই তখনকার কালের প্রথা ছিল। অবশ্য কোনো বিশেষ অবস্থায় এ প্রথার পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নয়। তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায়, আনন্দজের প্রথম গুরু ছিলেন সাম্ব, তাহার পর তিনি কাম্বোজের নিকট অধ্যয়নের জন্য উপস্থিত হন। কাম্বোজের বেদ-সম্বন্ধে বিশেষ এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যই সম্ভবতঃ আনন্দজের ভিন্ন গুরু গ্রহণের কারণ। ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের ভিতর কাহারো কাহারো মতে কাম্বোজেরা ছিল ইরাণিয়ান জাতির লোক; কিন্তু এ মত যে সত্য নহে, প্রাচীন বৈদিক যুগে তাহারা যে ভারতীয় বৈদিক জাতিগুলিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, পূর্ব্বোক্ত ঘটনা তাহার প্রমাণ। বৈদিক ঋষিদের এই তালিকাতেই পাওয়া যায় যে, আনন্দজের উভয় শিক্ষকই একই ঋষির নিকট হইতে বেদ-সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন—সাম্ব শরকরাক্ষ এবং কাম্বোজ ঔপমন্যব—এই উভয়েরই বেদ পাঠের গুরু ছিলেন—মদ্রগার সৌঙ্গায়ণি। মদ্র সৌঙ্গায়ণি ছিলেন মদ্র-বংশোদ্ভব। (Vedic Index, I. p. 138) মদ্র এবং কাম্বোজের সঙ্গে এই যে যোগাযোগ, ইহা খুবই স্বাভাবিক। কারণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে এই দুইটি জাতি একরূপ গায়ে গায়ে মিশিয়াই বাস করিত।

ঋগ্বেদে কাম্বোজদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঋগ্বেদের যুগেও যে তাহারা বৈদিক আর্য্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহার প্রত্যক্ষ না হউক পরোক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। লুডউইগ দেখাইয়াছেন, ঋগ্বেদের স্তোত্রেও ঋষি উপমন্যুর নামের উল্লেখ আছে (ঋগ্বেদ ১,১০২.৯); এবং এই উপমন্যুই যে বংশ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত কাম্বোজ গুরুর পিতা ছিলেন, এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এই রকমের একটা সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জিমার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (Altindisches Leben, p. 102) এই সব অনুমান এবং সিদ্ধান্তের মূল্য যাহাই হোক্ না কেন, এ-সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ নাই যে, কাম্বোজের একজন লোক সেই সব ঋষিদের তালিকার ভিতরে স্থান লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা সেই প্রাচীন যুগে বেদের আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার বিস্তারে সাহায্য করিয়াছেন। বৈদিক-যুগে কাম্বোজেরা যে ভারতীয় বৈদিক-জাতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় ছিল, তাহাতেও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

তাহার পর কাম্বোজদের উল্লেখ পাওয়া যায় যাস্কের নিরুক্তে। এই গ্রন্থের একটি স্থানে আছে যে কাম্বোজেরা বৈদিক ভাষাই ব্যবহার করিত। তবে সে ভাষা যাস্কের সময় মধ্য-দেশে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ছিল। যাস্ক দেখাইয়াছেন যে, কাম্বোজেরা 'শবতি' ক্রিয়া পদটি তাহার আদিম অর্থ 'যাওয়া' বুঝাইতে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু মধ্যদেশের ব্যবহারে এ অর্থ লোপ পাইয়া গিয়াছিল। তখনকার প্রচলিত ভাষায় ইহা রূপান্তরিত হইয়া 'শব' এই শব্দরূপে ব্যবহৃত হইত এবং ইহার ক্রিয়া-বাচক পদটির ব্যবহারও দেখা যাইত না। অনেকে এই ব্যাপার হইতেই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কাম্বোজেরা ভারতীয় জাতি ছিল না, তাহারা আইরেনিয়ান ছিল। এ যুক্তি মোটেই সারবান বলিয়া মনে হয় না। যাস্কের মতানুসারে বরং মনে হয় যে, কাম্বোজেরা বৈদিক জাতিই ছিল; এবং তাহাদের দ্বারা প্রাচীন ক্রিয়াপদগুলির আদিম অর্থ কোনও রূপে বিকৃত হয় নাই; কিন্তু বৈদিক জাতির অন্যান্য অংশ, যাহারা ভৌগোলিক ব্যবধানের দ্বারা বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা এই সব ক্রিয়াপদের আদিম অর্থ বজায় রাখিয়া চলিতে পারে নাই।

সার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন বলেন, "শব এবং শবথি" এই দুইটি শব্দের ধাতুগত উৎপত্তির যোগাযোগের সত্যাসত্য লইয়া আলোচনা না করিলেও, ইহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, যাস্কের মতে কাম্বোজেরা আর্য্য ছিল না। তাহারা সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করিত বটে, কিন্তু তাহাদের সে ভাষার সহিত মূল ভাষার পার্থক্যও ছিল বিস্তর। শবতি শব্দ সংস্কৃত ভাষার কোথাও পাওয়া যায় না, উহা আইরেনিয়ান শব্দ। মোটের উপর সার জর্জ্জের মতে কাম্বোজেরা ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি অসভ্য জাতি; তাহাদের ভাষা ছিল হয় আইরেনিয়ান শব্দ-বহুল সংস্কৃত ভাষা না হয় এমন একটি ভাষা যাহার কতকগুলি শব্দ ছিল ভারতীয় আর্য্যদের ভাষা, হইতে উদ্ভূত, এবং আর কতক শব্দ ছিল, আইরেনিয়ানদের প্রথা হইতে উদ্ভূত। (১)

(১) J. R. A. S. 1911, pp. 801-802.

যাস্ক কাম্বোজ নামটিতেও একটি ধাতু-গত অর্থ আরোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টাও সম্যক সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি বলিয়াছেন, কম্বল ভোজ হইতেই কাম্বোজ নামের উৎপত্তি। তাহারা উক্ত পশ্চিম-ভারতের মালভূমিতে বাস করিত এবং এই অঞ্চলের নিদারুণ শীত হইতে আত্ম-রক্ষার জন্যই কম্বলের ব্যবহার তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। কম্বোজ 'কম' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'কমনীয় ভোজ' অর্থ সুখকর দ্রব্য উপভোগ করিত বলিয়াই তাহাদের নাম কাম্বোজ। কম্বল যে ভারতের এই শীতপ্রধান অঞ্চলটাতে খুবই আরামপ্রদ জিনিষ ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি পণ্ডিতেরা যাস্কের এই ভাবে কম ও কম্বলের সহিত ভাষাগত সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা এবং এই দুইটি শব্দের সহিত কাম্বোজের সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইতে রাজী নহেন। কাম্বোজের যে কম্বলের কারবার করিত, তাহার উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় কাম্বোজ-রাজ যুধিষ্ঠিরকে "অনেক উৎকৃষ্ট চর্ম্ম, পশমের কম্বল, মাটির গহ্বরে বাস করে এমনি সব পশু এবং বিড়ালের লোমের দ্বারা তৈয়ারী সোনার সূতার কাজ করা কম্বলও উপহার দিয়াছিলেন।" (২) মহাভারতের আরও এক স্থানে এই কম্বল দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে আছে, কাম্বোজ-রাজের নিকট হইতে যুধিষ্ঠির কালো, গাঢ় এবং লাল রঙের 'কদলি' নামক হরিণের হাজার হাজার চামড়া, এবং উৎকৃষ্ট জমিনের কম্বলও উপহার পাইয়াছিলেন। (৩)

ইহার পর কাম্বোজের উল্লেখ পাওয়া যায় পাণিনিতে। পাণিনির একটি সূত্রে কম্বোজল শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাঃ ডি, আর ভাণ্ডারকর বলেন, কম্বোজ শব্দটি কেবল মাত্র কম্বোজ দেশ এবং কম্বোজ জাতি বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইত না, ইহার দ্বারা কম্বোজের রাজাকেও বুঝাইত। কিন্তু এই কম্বোজের অনুরূপ আরো কতকগুলি শব্দ আছে, যাহার ব্যবহার পাণিনির ভিতর পাওয়া যায় না। সেই জন্যই কাত্যায়ন পাণিনির পূর্ব্বোক্ত সূত্রটি একটু রূপান্তরিত করিয়া লিখিয়াছেন—কম্বোজাদিভ্যো=লুগ—বচনম্ চোঢ়াদ্যর্থম্। অর্থাৎ কম্বোজ শব্দটির মত চোঢ়, কদের, কেরল প্রভৃতি শব্দ কেবলমাত্র দেশ বা জাতিকে বুঝায় না—তাহাদের রাজাকেও বুঝায়। (৪)

টি. ডব্লিউ. রিজ ডেভিড্‌সের মতে কম্বোজ দেশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত ছিল এবং দ্বারকা ছিল উহার রাজধানী। (৫) কাম্বোজদের রাজধানী সম্বন্ধে এস, কে, আয়াঙ্গার টি, ডব্লিউ রিজ ডেভিড্‌সের সঙ্গে একমত। বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশ ও গুজরাটকেই তিনি কম্বোজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। (৬) ডাঃ পি এন ব্যানার্জ্জিও তাঁহার Public Administration in Ancient India নামক গ্রন্থে মানিয়া লইয়াছেন যে, বর্ত্তমান সিন্ধু-প্রদেশের নিকটেই কাম্বোজ অবস্থিত ছিল এবং তাহার রাজধানীর নাম ছিল দ্বারকা। (৭) ধর্ম্মপালের প্রেতবস্তুর টীকায় কাম্বোজের সঙ্গে-সঙ্গেই দ্বারকার উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু দ্বারকা যে কাম্বোজেরই রাজধানী ছিল, এ কথার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ তাহার ভিতর পাওয়া যায় না। (৮) ভি, এ, স্মিথ মনে করেন, কাম্বোজ হয় তিব্বত, না হয় হিন্দুকুশের পর্ব্বতমালার ভিতর কোনও এক স্থানে অবস্থিত ছিল। (৯) এবং তাহাদের ভাষা ছিল আইরেনিয়ান। মুকক্রিণ্ডেলের মতে কাম্বোজ ছিল আফগানিস্থানেরই নাম; এবং হিউয়েন সংএর কাফুই (কপু) ছিল কাম্বোজ। (Mc. Crindle, Alexander's Invasion, p. 38*) মিঃ আর, ডি, ব্যানার্জ্জির মতে কম্বোজ বা কম্বোডিয়া সুমাত্রার পূর্ব্ব-প্রান্তে অবস্থিত ছিল। (১০) কিন্তু তাঁহার এই কাম্বোজ গান্ধারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমাদের মহাজনপদ কাম্বোজ নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ডাঃ ডি, আর, ভাণ্ডারকর বলেন, "কাম্বোজ যে কোথায় ছিল তাহা নির্দ্দেশ করা ভারি কঠিন। কাহারও কাহারও মতে কাম্বোজেরা উত্তর হিমালয়ের একটি জাতি ছিল, আবার কাহারও কাহারও মতে তাহারা ছিল তিব্বতীয় জাতি। কিন্তু আমাদের মতে তাহারা সম্ভবতঃ সিন্ধুনদের উত্তর পশ্চিমে বাস করিত এবং পারশ্য শিক্ষালিপিতে যে কাম্বোজিয় নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহারাই সম্ভবতঃ কাম্বোজ। কিন্তু কোথায় যে তাহাদের রাজধানী ছিল তাহা জানা যায় না।" (১১) বৈদিক সূচিপত্রেও (Index) ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতেরই সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেও আমরা দেখিতে পাই যে কাম্বোজেরা সিন্ধুনদের উত্তর পশ্চিম তীরেই বাস করিত এবং প্রাচীন পারসীক শিলালিপিতে যে কম্বুজিয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারাই কাম্বোজ। স্যার চার্লস ইলিয়টের মতে, কাম্বোজেরা ছিল সম্ভবতঃ তিব্বতীয় জাতি। (১২) তাঁহার Hinduism & Buddhism নামক গ্রন্থের আর একটা খণ্ডে তিনি বলিয়াছেন, কাম্বোজেরা কোন্ জাতি ছিল তাহা নিশ্চয়

(২) মহাভারত—অধ্যায় ৫১,৩।

(৩) Ibid, Chap. 48, 19.

(৪) Dr. D. R. Bhandarkar, Carmichael Lectures 1918, pp. 6-7.

(৫) Buddhist India, p, 28.

(৬) S. K Aiyangar, Ancient India, p. 7.

(৭) p. 56.

(৮) Paramattha dipani on the Petavatthu, P.T.S. p, 113. Vide also my the Buddist Conception of spirits, p. 81, foll.

(৯) Early History of India p. 184.

(১০) Vangalar Ithasa, Vol. 1. p. 95.

(১১) D. R. Bhandarkar, Carmichael Lectures 1918, pp. 54-55.

(১২) Hinduism & Buddhism, Vol. 1, p. 268.

করিয়া বলা কঠিন। তবে তাহারা সম্ভবতঃ তিব্বত অথবা উহার সীমান্ত প্রদেশেরই অধিবাসী ছিল। মিঃ ফুসের তাঁহার Iconographie Bauddhique নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, নেপালের ইতিহে কাম্বোজ দেশ তিব্বতকে বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে। (১৩) স্যার জর্জ্জ গ্রিয়ারসনের মতে, কাম্বোজেরা উত্তর পশ্চিম ভারতের একটি জাতি ছিল এবং তাহাদের নামের উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যের বহুস্থানে পাওয়া যায়, (১৪) কম্বিসি এবং সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী কম্বোজ—ইহারা উভয়েই একজাতি এরূপ মনে করা সম্ভবতঃ সঙ্গত হইবে না। (১৫) ডাঃ রায় চৌধুরী মহাভারত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, রাজপুর নামক একটি স্থান কাম্বোজদের বাসভূমি ছিল। (১৬) কাম্বোজের সহিত গান্ধারের যোগাযোগ এবং সম্পর্কের দিক দিয়া আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, এই রাজপুর এবং হিউয়েন সং এর 'রাজপুর একই স্থান (Watters, Yuan Chwang, Vol. 1, p. 284) এবং উহা পানচ্‌এর দক্ষিণে অথবা দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। (Political History of India from the accession of Parikshit to the coronation of Bimbisara, p. 77.) রাজপুর এবং কম্বোজ জনপদের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে আমরা ডাঃ রায় চৌধুরীর সহিত সম্পূর্ণ একমত। পাণিনি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোক। সুতরাং কাম্বোজদের রীতিনীতি এবং পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁহার যে জ্ঞান, তাহা নিভুল বলিয়াই মনে হয়। পাণিনির মতে কাম্বোজেরা তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করিত। কাম্বোজেরা যে মাথা মুড়াইতে অভ্যস্ত ছিল তাহা রঘুনন্দনও হরিবংশ হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এই পদটির উল্লেখ অধ্যাপক মোক্‌ষ মুলারের গ্রন্থের ভিতরেও পাওয়া যায়। শকেরা (Scythians) তাহাদের মাথার অর্দ্ধেক মুণ্ডন করিত, যবনেরা (Greeks) এবং কাম্বোজেরা সমস্তটা মাথাই কামাইয়া ফেলিত। (১৭)

পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের সময়ে যে ১৬টি মহাজনপদ ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠত্বের খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, কাম্বোজ তাহাদেরই একটি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুত্ত পিটকের অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে দেখা যায় ১৬টি মহাজনপদের একটি জনপদ। নিকায়ের মতে বুদ্ধের আটটি উপদেশ প্রতিপালনের দ্বারা একজন লোক যে পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারে, তাহা তুলনায় এই সকল মহাজনপদের যে কোনো একটির উপর রাজত্ব করা অপেক্ষা অন্ততঃ ১৬ গুণ বেশী বাঞ্ছনীয়। (১৮)

হরিবংশে আমরা দেখিতে পাই যে, কাম্বোজেরা প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল, সগর তাহাদিগকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করে (Harivamsa, 14.)। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৪৩ এবং ৪৪ শ্লোকেও আছে যে, কাম্বোজ, শক, যবন প্রভৃতি জাতি প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণকে অগ্রাহ্য করিয়া পবিত্র রীতি নীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া চলার অপরাধে তাহারা ধীরে ধীরে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় যে, কাম্বোজ ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের ক্ষত্রিয়েরা কৃষি, বাণিজ্য এবং শস্ত্র চালনার দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কাম্বোজেরা ক্ষত্রিয় ছিল। (১৯)

কাম্বোজের বীরেরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সব সময় বীরত্বের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সুমঙ্গল বিলাসিনীতে কাম্বোজ বীরদের জন্মভূমিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (২০) মহাভারত কাম্বোজ বীরদের বীরত্বের উদাহরণে পরিপূর্ণ। সভা পর্ব্বে আছে কাম্বোজ রাজ যুধিষ্ঠিরকে তিনশত অশ্ব উপহার প্রদান করিয়াছিলেন—এই সব অশ্বের দেহের বর্ণ ছিল বিচিত্র, তাহারা নানারূপ রেখাদ্বারা পরিশোভিত ছিল, এবং তাহাদের নাসিকা ছিল শুক পক্ষীর নাসিকার ন্যায় সুন্দর। (২১) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কাম্বোজদের ক্ষিপ্রগতি এবং শক্তিশালী অশ্বগুলি বিশেষ কাজে আসিয়াছিল। পঞ্চম দিনের যুদ্ধের যে বিবরণ মহাভারতে আছে, তাহাতে পাওয়া যায়, অর্জ্জুন যখন কৌরব সৈন্যকে অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং সৈন্যেরা যখন ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন কাম্বোজ দেশাগত দ্রুতগামী অশ্বগুলি কৌরবদের বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল। (২২) অষ্টম দিনের যুদ্ধে যে বিপুল হয়সাদী লইয়া অর্জ্জুন পুত্র নাগবীর ইরাবণ কৌরব সৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সৈন্য কম্বোজ দেশের অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। (২৩) দ্রোণ পর্ব্বে আছে, নকুল যে অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা কম্বোজ দেশীয় অশ্বের বংশ হইতে উদ্ভূত। এই অশ্বের আকৃতি ছিল অত্যন্ত মনোহর এবং উহা শুক পক্ষীর পালকের দ্বারা পরিশোভিত ছিল। (২৪) চেদীরাজ ধৃষ্টকেতুর অশ্বও ছিল এই কম্বোজ দেশীয় এবং তাহার গাত্রের বর্ণও ছিল বিচিত্র। (২৫) যুদ্ধ ক্ষেত্রের আরও

(১৩) p. 134.
(১৪) J. R. A. S. 1911, p. 801.
(১৫) The Cambridge History of India, Ancient India, p. 334, f n.
(১৬) Mahabharata, vii, 4-5.
(১৭) A History of Sanskrit Literature by Max Muller (Published by Panini office) p. 28,
(১৮) Anguthara Nikaya, Val. 1, p. 213, Ibid, Vol. iv, pp. 252-256 etc.
(১৯) Arthasastra, Translated by Shama Shastri, p. 455.
(২০) Vol I, p. 124.
(২১) Mahabharata, Sabhaparva, chap, 71, 13.
(২২) Mahabharata, Bhismaparva, chap. 71. 13.
(২৩) Ibid, chap, 90, 3.
(২৪) Ibid, Dronaparva, chap. 22, 7.
(২৫) Ibid, chap 22, 22-23

ভারতবর্ষ

ওমর খৈয়াম্

অতীত যা তার দুখের স্মৃতি, ভবিষ্যতের ভাবনা ঘোর—
দিল্-পিয়ারা সাকী গো আজ পেয়ালা ভরে' ঘুচাও মোর—

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

অনেক রাজপুত্র এই কম্বোজ দেশীয় অশ্বেরই আরোহী ছিলেন। (২৬) সৌপ্তিক পর্ব্বে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ যে রথে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহার ঘোড়া কাম্বোজের উৎকৃষ্ট অশ্ববংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাহার গলদেশে সুবর্ণমাল্য লম্বিত ছিল। (২৭)

জৈন উত্তরাধ্যয়নসূত্রে আছে যে, সুশিক্ষিত কাম্বোজীয় অশ্বের তুল্য উৎকৃষ্ট অশ্ব আর কোথাও পাওয়া যায় না, কোনো রকমের শব্দে তাহারা ভীত হয় না। (২৮) চম্পেয় জাতকে পাওয়া যায়, নাগরাজ কাশীর রাজাকে নাগভবনে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজা সুশিক্ষিত কাম্বোজ অশ্বকে রথে সংযোজিত করিবার জন্য আদেশ দেন। (২৯) হয়মলা গৌরবের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুবর্দ্ধন যিনি পরবর্ত্তীকালে মহীশূরের রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারও কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব ছিল এবং তাঁহার এই অশ্বের পদ-প্রহারে পৃথিবী কম্পিত হইত। (৩০) মুঙ্গেরের নিকট দেবপাল-দেবের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার বিজয় প্রসঙ্গে কাম্বোজ দেশীয় অশ্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (৩১) মহাবস্তু মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের একখানি গ্রন্থ। এই গ্রন্থের এক স্থানে পাওয়া যায় যে, রাজা নাগদের বাসস্থান পরিদর্শনের জন্য তাঁহার মন্ত্রীদিগকে সুসজ্জিত রাজ-পথে কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব সংযোগ করিতে আদেশ প্রদান করিতেছেন। (৩২) প্রাচীন সাহিত্যের এই উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে এ কথা বেশ স্পষ্ট রূপেই বুঝা যায় যে, কাম্বোজ দেশী অশ্ব অতি উৎকৃষ্ট এবং অত্যন্ত দ্রুতগামী ছিল। সকলে তাহাদিগকে অতি মাত্রায় পছন্দও করিত। তাহা ছাড়া কোনও রকমের শব্দেই তাহারা ভীত হইত না বলিয়া ইতিপূর্ব্বে যে কথাটা বলা হইয়াছে তাহার ভিতর অত্যুক্তি নাই। কুনাল জাতকের অর্থকথায় কাম্বোজদের বন্য অশ্ব ধরার চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। কাম্বোজেরা প্রথমে খানিকটা স্থান বেড়ার দ্বারা ঘিরিয়া একটি খোয়াড়ের মত প্রস্তুত করিত। এই ঘেরা স্থানটিতে যাতায়াতের দ্বার থাকিত কেবলমাত্র একটি। তাহার পর জলীয় উদ্ভিজ্জে তাহারা মধু মাখাইয়া রাখিত। অশ্বেরা জলের অন্বেষণে আসিয়া মধুর গন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এই সব ঘাস ভোজন করিতে করিতে ঘেরা স্থানটির ভিতর প্রবেশ করিত। তাহার পর ঘাস-ভোজনরত সেই সব বন্য অশ্বকেই ধরিয়া কাম্বোজেরা পোষ মানাইয়া লইত। (Jtaka, vol. V, p. 446)

(২৬) Ibid, chap. 22, 42.
(২৭) Ibid, Sauptikaparva chap. 13, 1-2.
(২৮) Jaina Sutra, S. B, E. pt. ii, p. 47.
(২৯) Jataka, (Fausboll) Vol. iv, p. 464.
(৩০) S. K. Acyangar, Ancient India, p. 236.
(৩১) R. D. Banerjee, Vangalar Itihasa, pp. 179—180.
(৩২) p. 185.

কালিদাসের রঘুবংশে আছে, রঘু বংশু বা অক্সাস নদীর তীরে হুনদিগকে পরাজিত করিয়া কাম্বোজদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কাম্বোজরা রঘুর বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার সম্মুখে তেমনি ভাবে নত হইয়াছিল, যেমন ভাবে তাহাদের আখরোট বৃক্ষগুলি রঘুর হস্তী সমূহের পরাক্রমে নত হইয়াছিল। এই বৃক্ষগুলিতে রঘু তাঁহার হস্তী সমূহ বন্ধন করিয়াছিলেন। কাম্বোজেরা অপরিমিত অর্থ এবং উৎকৃষ্ট অশ্ব রঘুকে কর-স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোশল রাজের মনের ভিতর গর্ব্বের উদ্রেক হয় নাই। (৩৩) কালিদাস লিখিয়াছেন, কাম্বোজদিগকে পরাজিত করিয়া রঘু হিমালয়ে আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যখন হুনদিগকে অক্সাস নদীর তীরে পরাজিত করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে-ছিলেন তখনই এই কাম্বোজদের জয় করেন।

মহাভারতে ক্ষত্রিয় জাতিদের ভিতর কাম্বোজদের স্থান বেশ উচ্চেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভৌগোলিক নির্দ্দেশ অনুসারে কাম্বোজেরা উত্তর ভারতের অধিবাসী (Mahabharata, Bhismaparva, chap. 9)। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে তাহারা দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের সাহস, বিশেষতঃ তাহাদের রাজা সুদক্ষিণের রণনৈপুণ্য এই যুদ্ধে কুরুপক্ষের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের মহারথীদের ভিতর সুদক্ষিণও ছিলেন একজন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কাম্বোজ এবং পশ্চিম সীমান্তের অন্যান্য জাতির সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণের জন্য দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন (৩৪) কিন্তু পাণ্ডবেরা তাহাদের সাহায্য লাভে সমর্থ হন নাই, তাহারা দুর্য্যোধনের সঙ্গেই যোগদান করিয়া-ছিল। ইহার কারণ সম্ভবতঃ গান্ধারের প্রভাব ও প্রতিপত্তি। গান্ধাররাজ দুর্য্যোধনের মাতামহ ছিলেন এবং গান্ধার যুবরাজ শকুনী ছিলেন কুরু-পাণ্ডব বিবাদের একজন প্রধান অভিনেতা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে দুর্য্যোধন উলুকের মুখে পাণ্ডবদের কাছে যে গর্ব্বোদ্ধত বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এই কথাই বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, কাম্বোজ প্রভৃতি উত্তর অঞ্চলের মহা-রথীরা এবং অন্যান্য যোদ্ধারা তাঁহার পক্ষে সমবেত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সাহস পাণ্ডবদের আছে কি না তাহা জানিতে চান। (৩৫) এই বার্ত্তার উপসংহারে দুর্য্যোধন মহা মহারথীদের সহিত কাম্বোজের নাম উল্লেখ করিয়া কাম্বোজদের একটি বিশেষ উচ্চ স্থানেই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন তাহার অপরিমিত সৈন্য একটা বিরাট সমুদ্রবৎ—"ভীষণ ইহার দুর্লঙ্ঘ্য স্রোত, দ্রোণ মহাপরাক্রান্ত কুম্ভীর, কর্ণ শল্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য মৎস্য এবং কাম্বোজ ইহার অগ্নিগত মুখ।" (৩৬)

(৩৩) Raghuvamsa, hap IV, Verses 69-70
(৩৪) Mahabharata, Udyogaparva, 18.
(৩৫) Mahabharata, Udyogaparva hap 160, 21
(৩৬) Ibid, chap, 160, 40.

কৌরব পক্ষের রথী মহারথীদের নামোল্লেখের সময় ভীষ্ম কাম্বোজ রাজ সুদক্ষিণের বীরত্বের প্রচুর প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার মতে কাম্বোজ রাজ সুদক্ষিণ একজন রথীর তুল্য। তিনি তোমার জয় কামনা করিয়া যুদ্ধ করিবেন। হে নৃপ-শ্রেষ্ঠ, রথীদের ভিতর এই সিংহের পরাক্রম যুদ্ধকালে যখন তোমার সাহায্যে প্রযুক্ত হইবে তখন তিনি যুদ্ধ-নিরত কৌরবদের কাছে ইন্দ্র তুল্য বলিয়া প্রতিভাত হইবেন। তাঁহার অধীনস্থ যোদ্ধারা অমিত বলে তীর নিক্ষেপ করিতে পারে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ, কাম্বোজেরা যুদ্ধক্ষেত্র পঙ্গপালের মত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে।" (৩৭)

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সংস্থাপনার সময় কাম্বোজরা পৌরবদের নিজেদের সৈন্যের সহিত ব্যূহ-মুখ রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাভারতে আছে "পৌরব, কলিঙ্গ" কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ক্ষেমধন্বা এবং শল্য দুর্য্যোধনের সম্মুখ ভাগ রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৩৮)

ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ যখন ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ তখন সেই যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া পাণ্ডবদের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সঞ্জয় সেই যুদ্ধের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন—"হে নৃপশ্রেষ্ঠ, শ্রুতকর্ম্ম কাম্বোজরাজ মহারথী সুদক্ষিণকে আক্রমণ করিলেন। হে রাজেন্দ্র, সুদক্ষিণ সহদেব পুত্র সেই মহারথীকে আহত করিলেও তাঁহাকে টলাইতে পারিলেন না, তিনি মৈনাক পাহাড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর শ্রুতকর্ম্ম মহা ক্রুদ্ধ হইয়া অজস্র শরের দ্বারা মহারথী কাম্বোজরাজের দেহ বহু স্থানে বিদ্ধ করিলেন।" (৩৯) যুদ্ধের তৃতীয় দিনে ভীষ্ম যখন গরুড় ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিতে-ছিলেন, কাম্বোজেরা ব্যূহের পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। ষষ্ঠদিনের যুদ্ধে ভীষ্ম-রচিত মকর ব্যূহতে তাহারা ভার পাইয়াছিল ব্যূহের মস্তক রক্ষার। সপ্তমদিনের যুদ্ধে সহস্র সহস্র কাম্বোজ সেনা ত্রিগর্ত্তের পার্শ্বে স্থান লাভ করিয়াছিল। (৪০)

ভীষ্মের পর দ্রোণ যখন কৌরব সৈন্য চালনার ভার গ্রহণ করিলেন, তখন কাম্বোজেরা সুদক্ষিণের নেতৃত্বে দ্রোণের পার্শ্বে উপস্থিত ছিল। (৪১)

যখন দ্রোণ গরুড় ব্যূহ-রচনা করিয়া সেনা সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, তখন কাম্বোজেরা ব্যূহের গ্রীবাদেশ রক্ষার ভার প্রাপ্ত হয়। (৪২) পুত্রের মৃত্যুর পর জয়দ্রথকেই তাহার মৃত্যুর প্রধান কারণ মনে করিয়া অর্জ্জুন যখন জয়দ্রথ নিধনে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তখন কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ সসৈন্যে তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এই স্থানে সুদক্ষিণ যদিও অর্জ্জুনের শরে নিহত হন, তথাপি তাঁহার বাণাঘাতে একবার অর্জ্জুনকে হত-চৈতন্য হইতে হইয়াছিল। যে কয়েকটি শ্লোকে মহাভারতে সুদক্ষিণের নিধন ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে, সে শ্লোক কয়েকটি ভারি চমৎকার। শ্লোক কয়েকটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—"তখন কাম্বোজ-রাজের পুত্র মহাবীর সুদক্ষিণ মহাবেগশালী অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া অরি নিসূদন অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর পার্থ সুদক্ষিণকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার উপর সাত বান নিক্ষেপ করিলে শর সকল বর্ম্মভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর সুদক্ষিণ গাণ্ডীব প্রেরিত তীক্ষ্ণ শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া ক্রোধ ভরে প্রথমতঃ অর্জ্জুনকে কঙ্ক পাখীর পালক শোভিত দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন, এবং পরে তিন শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি পুনরায় পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সুদক্ষিণের ধনু ও রথ ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে দুই সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুদক্ষিণ অর্জ্জুনের ভল্লাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক অতি ভয়ানক ঘণ্টাযুক্ত লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সুদক্ষিণ নিক্ষিপ্ত মহাশক্তি প্রজ্জ্বলিত মহাউল্কার ন্যায় মহারথ অর্জ্জুনের উপর নিপতিত হইয়া তাঁহার কলেবর বিদারণ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। মহাতেজা অর্জ্জুন শক্তির আঘাতে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৃক্কনীলেহন করতঃ কঙ্কপত্রালঙ্কৃত নারাচ দ্বারা সুদক্ষিণকে এবং তাহার অশ্ব, ধ্বজ, ধনু ও সারথীকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপর ভূরি ভূরি অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার বক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া সুতীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধনঞ্জয়ের বিশ্রম শরপ্রভাবে কাম্বোজ-রাজ তনয় সুদক্ষিণের বর্ম্ম ছিন্ন, গাত্র শিথিল, এবং মুকুটও অঙ্গদ পরিভ্রষ্ট হইল। তিনি যন্ত্রমুক্ত ধ্বজের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন। বসন্তাগমে পর্ব্বত-শিখর-জাত সুন্দর শাখাবৃত কর্ণিকার বৃক্ষ যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া নিপতিত হয়, সেইরূপ কম্বোজ রাজতনয়, মহর্ঘ শয্যায় শয়ন করিতে অভ্যস্ত থাকিলেও প্রাণশূন্য হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। সেই মহামূল্য ভূষণে বিভূষিত, সুবর্ণ মাল্যাকৃত, সুন্দর-দর্শন লোহিতাক্ষ সুদক্ষিণ পার্থশরে গতাসু হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিলে বোধ হইল যেন যানুমান পর্ব্বত রণস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছে। হে মহারাজ, এইরূপে মহাবীর শ্রুতায়ুধ এবং কাম্বোজ-রাজ-তনয় নিহত হইলে আপনার পুত্রের সমস্ত সৈন্য নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।" (৪৩)

সেই দিবসের মহাসমরেই যুধিষ্ঠিরের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া সাত্যকি

(৩৭) Udyogaparvam, chap. 165, 1-3.

(৩৮) Mahabharata, Bhismaparua, chap. 17, 26-7

(৩৯) Mahabharata Bhismaparva chap, 45, 66-68.

(৪০) Ibid, chap. 87, 10.

(৪১) Mahabharata, Dronaparva, chap. 7. 14.

(৪২) Dronaparva—19. 7

(৪৩) Mahabharata Dronaparva, Chap xcii, Verses 61-75.

যখন অর্জ্জুনের অনুসরণে উদ্যত হইয়াছিলেন তখন এই কাম্বোজেরাই তাঁহার পথ অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহাভারতে আছে, "যুযুধানে ভোজরাজের সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে কাম্বোজের সৈন্যদলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। সেখানে বহুবীর রথী তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। ফলে অমিতবলশালী সাত্যকি সম্মুখের দিকে আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিলেন না।" (৪৪) ইহার পর মহাভারতকার লিখিয়াছেন ; "সাত্যকি হাজার হাজার কাম্বোজকে নিধন করিয়া অজেয় কাম্বোজদের ভিতর একটি বিরাট ভয়ের সৃষ্টি করিলেন।" (৪৫) অতঃপর তিনি কাম্বোজদের সৈন্য-সমুদ্রের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন। (৪৬)

তাহার পর কর্ণ যখন কুরুসৈন্যের অধ্যক্ষের পদে বৃত হইয়াছিলেন, তখনও কাম্বোজেরা তাঁহার চারিপাশে সমবেত হইয়া প্রচুর সাহস এবং বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। (৪৭) সুদক্ষিণের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাম্বোজ সৈন্যদের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। (৪৮) এই বীরের মৃত্যুর পরও কাম্বোজেরা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে বিরত হয় নাই। (৪৯)

অবশেষে শল্য যখন ধ্বংসাবশিষ্ট কুরুসৈন্যের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন কাম্বোজেরা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি তাহাদের বিরাট সৈন্যের সমস্তই একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ তখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শল্য যে ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করিবার ভার কাম্বোজদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াই অশ্বত্থামা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৫০)

এতদ্ব্যতীত মহাভারতের আদিপর্ব্বেও চন্দ্রবর্ম্ম নামক একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি কাম্বোজ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। (৫১)

সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, কুরুক্ষেত্রে কাম্বোজেরা বিরাট বাহিনী লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং তাহারা মহাসাহসী ক্ষত্রিয় বীরের ন্যায়ই যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। মহা-ভারতের পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে অর্থাৎ শান্তিপর্ব্ব, আনুশাসনিক পর্ব্ব প্রভৃতি অধ্যায়ে কাম্বোজদের রাজ্য বর্ব্বরদের দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। এইরূপে এই প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতিটি নবাগত বর্ব্বরদের দ্বারা পরাজিত হইয়া তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল।

মহাভারতের একটি অধ্যায়ে তাহাদের নাম উত্তর পথের অসভ্য জাতিদের সহিত সন্নিবিষ্ট হইতে দেখা যায়। (৫২) অনুশাসন পর্ব্বে আছে কাম্বোজ-ব্রাহ্মণ না থাকায় কাম্বোজেরা শূদ্র জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। (৫৩) এই সব শ্লোক হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, পরবর্ত্তী কালে কাম্বোজেরা অসভ্য জাতিদের সংমিশ্রণে আর্য্য এবং ব্রাহ্মণ সভ্যতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল এবং যে সময় উপরিউক্ত পর্ব্ব দুইটি মহাভারতের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহারা আর্য্য-সামাজিক পরিবেষ্টনীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

রামায়ণের আদিকাণ্ডের ৫৮ পর্ব্বে দেখা যায়, কাম্বোজেরা বশিষ্ঠের অনুরোধে গো-মাতা সবলা দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল। কিষ্কিন্ধ্যা ৪৩ পর্ব্বে দেখা যায়, সুগ্রীব শতদল নামক একজন বানরকে সীতার অন্বেষণে উত্তর-ভারতের কাম্বোজ ও অন্যান্য দেশে প্রেরণ করিতেছে।

বায়ু পুরাণে আছে রাজা সগর হৈহয়দিগকে নিধন করিয়া কাম্বোজ শক, যবন, পহ্লব প্রভৃতির ধ্বংস সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সগরের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তাহারা বশিষ্ঠের আশ্রয় ভিক্ষা করে এবং রাজা সগর তাঁহার কুলগুরু বশিষ্ঠের আদেশ অনুসারে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে মস্তক মুণ্ডনের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া-ছিলেন। (বঙ্গবাসী সংস্করণ ৮৮ অধ্যায়) হরিবংশে দেখা যায়, ইক্ষ্বাকু-রাজ বাহু কাম্বোজ ও অন্যান্য সকলের দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হইয়া ছিলেন।

জাতকে পাওয়া যায় যে, কাম্বোজেরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ছিল এবং তাহারা আর্য্য-রীতিনীতি পরিত্যাগ করিয়া অসভ্যদের পংক্তিভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। (৫৪) ভূরিজাতকে আছে, অনার্য্য কাম্বোজদের অনেকেরই বিশ্বাস ছিল, পতঙ্গ, মক্ষিকা, সাপ, ভেক, মধুমক্ষি প্রভৃতি বধের দ্বারা মানুষ পাপমুক্ত হয় এবং ইহা যে ভ্রান্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাস তাহাতে সন্দেহ নাই। (৫৫) শাসন-বংশে দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ২৩৫ বৎসর পর মহারক্ষিত থের জনক প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন এবং কাম্বোজ ও অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধ-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। (৫৬) এই গ্রন্থে উত্তর জীব থেরের সিংহল গমনের কথাও পাওয়া যায়। তিনি ৮ পদ নামে একজন সামণেরকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ৮ পদ সেখানে ত্রিপিটক পাঠ করেন, এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের শ্রেষ্ঠতম পদবীতে অধিষ্ঠিত হন। সেখান হইতে তিনি জম্বুদ্বীপে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, "জম্বুদ্বীপে আমি যদি ভিক্ষুকদের সহিত বিনয়-কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করি, তবে তাহা আমার পক্ষে মহা অসুখের কারণ হইবে।

(৪৪) Mahabharata, chap iii. 59-60

(৪৫) Mahabharata, Dronaparva, 119, 51

(৪৬) Ibid, Chap 118, 9,

(৪৭) Mahabharata, Karna Parva, Chap, 46, 15,

(৪৮) Ibid, Chap, 56.

(৪৯) Ibid, Chap, 88.

(৫০) Mahabharata, Salya Parva, Chap, 8, 25,

(৫১) Adipara, Chap 67.

(৫২) Ibid, Chap. 207, 43-44.

(৫৩) Ibid, Anusasanik-Parva. Chap. 337, 21.

(৫৪) Jataka, (Cowell) VI p. 110, fn.

(৫৫) Fausboll, Jataka Vol. VI, pp. 208 & 210.

(৫৬) Sasanavamsa (P.T.S.) p. 49.

সুতরাং ত্রিপিটক যাঁহারা বেশ ভাল ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, এমন চারিজন ভিক্ষুককে আমার সঙ্গে লইতে হইবে।" তিনি জম্বুদ্বীপে গমন করিবার সময় এইজন্য চারিজন ভিক্ষুক সঙ্গে লইয়াছিলেন। এই ভিক্ষুকের ভিতর কাম্বোজ-রাজের পুত্র তামলিন্দ থেরও ছিলেন একজন। শ্রীহংস কাম্বোজ হইতে আসিয়া রতনপুর নগর জয় করিয়াছিলেন। তিনি একদা মনে-মনে চিন্তা করিলেন, "ভিক্ষুদের স্ত্রী-পুত্র নাই, তাহারা শিষ্যদিগকেই লেখাপড়া শিখাইয়া প্রতিপালন করে। এইরূপেই তাহাদের পরিবার বাড়িয়া উঠে। যদি তাহারা পার্থিব বিষয়ে কখনও মনোযোগ দেয়, তবে তাহারা সাম্রাজ্যও জয় করিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং আমি সমস্ত ভিক্ষুকেই নির্ধন করিব।" অতঃপর তিনি তং-ভী-লু নামক বনের মাঠে বহু মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া জ্যেয়পুর, বিজয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলের মহাথের এবং তাঁহাদের শিষ্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা সমবেত হইলে তিনি হস্তী, অশ্ব, সৈন্য প্রভৃতির দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। প্রায় তিন হাজার ভিক্ষু এই ব্যাপারে নিহত হয়। তাহা ছাড়া তিনি বহু পুস্তক ভস্মাবশেষ এবং বহু মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছিলেন। (৫৭)

সম্রাট অশোকের ১৩ সংখ্যক শিলালিপিতে দেখা যায় যে, প্রকৃত জয় অর্থাৎ ন্যায়, দয়া এবং কর্ত্তব্যের জয় ধর্ম্মাশোকের দ্বারা তাঁহার নিজের রাজ্য কাম্বোজ, গ্রীক প্রভৃতির ভিতরেই সুরু হইয়াছিল। (৫৮) প্রত্যন্ত প্রদেশে কাম্বোজ, যবন প্রভৃতির মধ্যে অশোক ধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা তাহাদিগকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রচারকও প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৫৯) অশোকের ৫ম সংখ্যক শিলালিপিতে আছে যে, তিনি তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে কাম্বোজ, গন্ধার প্রভৃতির ভিতর নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতিষ্ঠা এবং সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (৬০) ভি এ স্মিথ বলেন, ন্যায়, দয়া, কর্ত্তব্যানুরাগের দ্বারা যে জয় তাহাই প্রকৃত জয়। অশোক তাঁহার সাম্রাজ্যে কাম্বোজ এবং অন্যান্য জাতির ভিতর এই জয়ই লাভ করিয়াছিলেন। (৬১)

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাংলার পাল বংশকে রাজা দেব পাল কাম্বোজদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। (৬২) কিন্তু দশম শতকের শেষ ভাগে অবস্থা একেবারে উল্টাইয়া যায়। কাম্বোজেরাই পাল রাজাদিগকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া তাহাদের নিজেদের একজনকে বাংলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। (৬৩) দিনাজপুরে বানগড় নামে একটি স্থান আছে। এইখানে কাম্বোজ বংশের একজন রাজার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি গৌড়ের রাজা ছিলেন। সম্ভবতঃ দেবপালের রাজত্ব কালেই কাম্বোজেরা প্রথমে গৌড় জয় করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে সময় তাহারা পরাজিত হয়। (৬৪) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের মতে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগেও হিমালয় প্রদেশের কাম্বোজেরা আর একবার উত্তর বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিল এবং উত্তর বঙ্গের বর্ত্তমান অধিবাসী কোচ, মেচ, পলিয়া প্রভৃতি তাহাদেরই বংশধর। পাল বংশের নবম রাজা মহীপাল এই কাম্বোজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। পাল রাজারা ১০২৬ শতকে বাংলায় রাজত্ব করিতেন। তাহার পর সম্ভবতঃ তাঁহারা রাজ্য ভ্রষ্ট হন। ৯৭৮ বা ৯৮০ খৃষ্টাব্দে আবার কাম্বোজদিগকে পরাজিত করিয়া এই মহীপালই পিতৃ সিংহাসন উদ্ধার করিয়াছিলেন। (৬৫)

(৫৭) Sasanavamsa, (P, T, S) p, 40,

(৫৮) V. A. Smith, Asoka, p 186.

(৫৯) Ibid, p 100

(৬০) V. A. Smith, Asoka, p. 168.

(৬১) V. A. Smith, Ancient & Hindu India, p. 96.

(৬২) R. D. Banerjee, Vngalar Itihasa, p. 182.

(৬৩) V. A. Smith, Early History of India p, 399.

(৬৪) R. D. Banerjee, Vangalar Itihasa, p 184.

(৬৫) V. A. Smith, Early History of India p. 399.

ভারতের সহিত আফ্রিকা ও ঈজিপ্টের প্রাচীনকালে ঘনিষ্ঠ সংশ্রবের বিশেষ ঐতিহাসিক প্রমাণ

অধ্যাপক শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ

ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার পরস্পর সান্নিধ্য হইতে উভয় দেশের মধ্যে যে স্মরণাতীত কালেই ঘনিষ্ঠ সংস্রব সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে এই অনুমান আরও দৃঢ়তা সাধন করে। আমরা এস্থলে সেই পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানই পাঠকবর্গের গোচর করিব।

আবিসিনিয়া আফ্রিকার বিশেষ উন্নত দেশ। এই দেশে যে প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, বৌদ্ধশিল্পের সহিত তাহার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্যেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আবিসিনীয়গণ ৩৩০ খৃষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তৎপূর্ব্বে তথায় যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল, উল্লিখিত প্রাচীন শিল্প-নিদর্শনের দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে এই সংস্রবের দ্বারা পরস্পরের উপর প্রভাব প্রখ্যাপনের মূল্যবান্ ঐতিহাসিক প্রমাণই পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতের উজ্জয়িনী ও ভারুকচ্ছ এবং আফ্রিকার অক্সাম (অক্ষাম) ও আলেকজেণ্ড্রিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগই বর্ত্তমান

ছিল। জলপথেই যে ভারতের প্রভাব আফ্রিকায় বিস্তারিত হয়, তাহা বিশেষ সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম ঃ—

"The Abyssinians were converted to Christianity about 330 A. D. Before that time their strongest outside influence may have been Buddhism. James Fergusson (History of Architecture, 1, 142-43) notes that the great monolith at Axum is of Indian inspiration, "the idea Egyptian, but the details Indian. An Indian-nine storied pagoda, translated in Egyptian in the first century of the Christian era!" He notes its likeness to such Indian temples as Bodh- Gaya, and says, it represents "that curious marriage of India with Egyptian art, which we expect to find in the spot where the two people came in contact, and enlisted architecture to symbolise their commercial union. Such an alliance was to the advantage of the Hindu traders * * * * * * * Ujjeni and Bharukacha, Axum and Alexandria were in close connection during the first and second centuries, and the observer of the early relations between Buddhism and Chriatianity may find among this frequented route greater evidence of mutual influence than along the relatively obstructed overland routes through Parthia to Antioch and Ephesus." "The Periplus of the Erythrean Sea" translated and edited by Wilfred H. Schoff, A. M, pp 64-65.

আবিসিনিয়াতে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের আরও স্পষ্টতর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তথায় ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞসূত্রের অনুকরণে দীক্ষিত খ্রীষ্টানগণ গলায় নীল রেশম-সূত্র ধারণ করিয়া থাকে। উপরি উদ্ধৃত পুস্তকেই এ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"Another survival of Hindu influence seems to be the mateb or blue silk neck cord, the badge of baptism in modern Abyssinian Christianity, which suggests, more than any Arab-custom the Zenner or sacred cord of the Brahman priest, (See references in I-G Frazer's Pansanias and Goldha Bongh, Porphyry de Ant Nymph, p 268; Asiatic researches, 348, Maurice, India Antiquities)" Ibid p 139.

দেশ আবিষ্কারের উদ্যম ও সাহসের জন্য পাশ্চাত্যগণ বর্ত্তমান যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা, টেঙ্গেনিকা ও নাইআ প্রভৃতি হ্রদের আবিষ্কার তাঁহাদের কৃতিত্বের প্রধান পরিচায়ক। আবিসিনিয়ায় উপনিবিষ্ট হিন্দুগণের দ্বারাই সুদূর অনৈতিহাসিক কালের অশেষ সঙ্কটের মধ্যেও এই সমস্ত হ্রদের আবিষ্কার আশ্চর্য্য কৃতিত্বের সহিত সাধিত হইয়াছিল। এই কৃতিত্বের বিষয় পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের বর্ণনায়ই স্বীকৃত হইয়াছে ঃ—

"The Hindu traders had a firm basis to stand upon, from their intercourse with the Abyssinians through whom they must have heard of the county of Amara, which they applied to the Nyanza and with the Wanyamuezi or men of the moon, from whom they heard of the Janganiyika and Karague mountains." Ibid p 88.

হিন্দুগণ কেবল যে দেশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা নহে, বর্ত্তমান ভ্রমণকারীদের ন্যায়, তৎসম্বন্ধে বিবরণও যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানেই প্রকাশ পাইয়াছে ঃ—

"Nothing was ever written concerning their country of the moon, as far as we know, until the Hindus, who traded with the east coast of Africa, opened commercial dealings with its people in slaves and ivory, possibly sometime prior to the birth of our Saviour, who associated with their name, men of the moon, sprang into existence the mountains of the moon." Ibid p 88.

The antiquity of Hindu trade in East Africa is asserted by Speke (Discovery of the source of the Nile, chaps I, V, X,). The Puranas described the mountains of the moon and the Nayanga lakes, and mentioned as the source of the Nile, "the country of Amara", which is the native name of the district north of Victoria Nyanza. A map based on this description drawn by Lieut. Wilfred was printed in the Asiatic Researches Vol, III 1801. Ibid pp 87-88.

হিন্দুগণ অপরের কথার উপর নির্ভর করিয়া আবিষ্কার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাঁহারা স্বয়ং আবিষ্কার করিয়াই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নীল-নদের উৎপত্তিস্থলও আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারাই প্রথম এই বার্ত্তা ঈজিপ্টের পুরোহিতদিগের নিকট প্রচার করেন। পুরোহিতেরা কিন্তু আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিজেরাই গ্রহণ করিয়া বৃথা আস্ফালন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। নীল-নদের আবিষ্কর্ত্তা স্পিক (Speke) সাহেব ঈজিপ্টের পুরোহিতদিগের এই বৃথা গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া দিয়া, হিন্দুদিগকেই নীল-নদের আবিষ্কারকের প্রাপ্য ন্যায্য প্রশংসা প্রদান করিয়াছেন ঃ—

"All our previous information," says Speke, "concerning the hydrography of these regions originated with the ancient Hindus, who told it to the priests of the Nile; and all those busy Egyptian Geographers who disseminated their knowledge with a view to be famous for their longsightedness in solving the mystery which enshrouded the source of their holy river, were so many hypothetical humbugs. The Hindu traders had a firm basis to stand upon through their intercourse with the Abyssinians "Periplus of the Erythrean Sea," Translated and Edited by Wilfred H. Schoff, A M. p 230.

"নীল" নামটী সংস্কৃত ভাষারই শব্দ, সুতরাং নীল-নদের নাম পর্য্যন্ত যে হিন্দুদিগেরই প্রদত্ত, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। পেরিপ্লাসের টীকাকারের মন্তব্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নীল-নদের উৎপত্তি-স্থান ও নাম প্রভৃতি সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণের সাহায্য লইয়া তবেই পাশ্চাত্য আবিষ্কারক স্পিক্ সাহেব আপনার আবিষ্কার কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। পুরাণে নীল-নদ "কৃষ্ণ" নামে অভিহিত হইয়াছে এবং ইহার উৎপত্তি স্থানের প্রদেশ "চন্দ্রিস্থান" অর্থাৎ চন্দ্রের দেশ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এস্থলে টীকাকারের মন্তব্য উদ্ধৃত হইল :—

"Significant also is the fact that Lieutenant Speke, when planning his discovery of the source of the Nile, secured his best information from a map reconstructed out of the Puranas (Journal pp 27, 77, 216, Wilfred, in Asiatic Researches, 111). It traced the course of the river, the "Great Krishna" through Kusha-dvipa, from a great lake in Chandristhan," "Country of the moon," which it gave the correct position in relation to the Zanzibar island." Ibid p 230.

ভারতের সহিত আফ্রিকার ঘনিষ্ট যোগের ইহাও অন্যতর বিশিষ্ট প্রমাণ যে, মধ্যযুগের পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ পূর্ব্ব-আফ্রিকাকে "ইণ্ডিজের" অন্যতর বিভাগরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মার্কো পোলো (Marco Polo), আবিসিনিয়াকে ভারতেরই মধ্যভাগে স্থাপন করিয়াছেন :—

"European geographers in mediaeval times Classified East Africa as one of the Indies and Marco Polo located Abyssinia in "middle India." Ibid p 92.

আফ্রিকার পূর্ব্বদিকের প্রধান দ্বীপ সকলের নামের মূল লক্ষ্য করিলেও ভারতের দ্বারা ইহাদিগের নামকরণেরই আভাস পাওয়া যায়। "শকোট্রা" আফ্রিকার একটী প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা "সুখাধার" নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া, পাশ্চাত্যদিগের দ্বারা বিবেচিত হইয়াছে। এই নামের প্রাচীনত্ব ইহাঁরা স্পষ্টরূপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই দ্বীপটী ভারত ও আরবের মধ্যে সমুদ্র-যাত্রায় বিশ্রামস্থল রূপে ব্যবহৃত হইত। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মন্তব্য এখানে দেওয়া গেল :—

"Both forms (Diokorida, Socotra) are corruption of the Sanskrit Dipa Sukhadara, meaning "Island abode of Bliss," a stopping place for the voyagers between India and Arabia. How ancient the Hindu name may be is unknown, the sense possibly antedates the language in which it is expressed." Ibid p 133.

"মাডাগাস্কার" দ্বীপের প্রাচীন নামের অর্থ পাশ্চাত্য ভৌগোলিকদিগের বিবরণে "চন্দ্রের দ্বীপ" (Island of the moon *) বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহাতেও আমরা ভারতীয় প্রাচীন নামের আভাসই যেন প্রাপ্ত হই। ভারতবর্ষের নয়টী উপদ্বীপের উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়। যথা :—

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ॥"

বিশ্বকোষধৃত "বিষ্ণুপুরাণ"।

দেখা যায়, এই সমস্তের মধ্যে একটীর নাম "সৌম্য"। সৌম্য সোম শব্দ হইতে উৎপন্ন। সোম অর্থে চন্দ্র বুঝায়। "সৌম্যদ্বীপ" সুতরাং সোম বা চন্দ্র সম্বন্ধীয় দ্বীপ অর্থাৎ ইংরেজী Island of the moon অর্থই প্রকাশ করে। "মাডাগাস্কারকেই", তাহা হইলে, আমরা পুরাণের "সৌম্যদ্বীপ" বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রাক্তন নবদ্বীপের মধ্যে "তাম্রবর্ণ" বর্ত্তমান সিংহলেরই নাম। "নাগদ্বীপ" সিংহলের উত্তরাংশেরই প্রাচীন নাম। (বিশ্বকোষ, প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। ভারত সাগরের দ্বীপের মধ্যে প্রাগুক্ত দ্বীপদ্বয় ব্যতীত লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ ছাড়া ভারতাধিকার-ভুক্ত দ্বীপ আর দৃষ্ট হয় না। অথচ আফ্রিকার পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী দ্বীপ সকল ভারতসাগরান্তর্গত বলিয়াই যখন ভূগোলে নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তখন আফ্রিকার প্রধান দ্বীপ সকলের মধ্যে কোন কোন দ্বীপ যে পুরাণোক্ত নবদ্বীপের দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। মাডাগাস্কার দ্বীপটীকে পুরাণোক্ত "সৌম্যদ্বীপ" বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে, পূর্ব্ব-আফ্রিকার আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান সম্বন্ধেই আমরা সুব্যাখ্যা পাইতে পারি। সোমালিলেণ্ড (Somali-land। নামটীর

* See "The story of Geographical Discovery" (Library of useful stories) by Joseph Jacob's p 99. "He then turned to Sofala and obtained news of the Island of the moon, now known as Madagascar."

সহিত এই সৌম্য দ্বীপেরই সম্বন্ধ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। "সোমালি" নামটীর মূলে 'সোম' নামেরই রূপ ও অর্থ বর্ত্তমান ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। ইহা হইতে নীল-নদের উৎপত্তি-প্রদেশের "চন্দ্রিস্থান", তথাকার লোকের "চন্দ্রের লোক" (men of the moon) বলিয়া যে উল্লেখ আমরা পাইয়াছি, এবং চন্দ্রের পর্ব্বত (mountain of the Moon) বলিয়া পর্ব্বত-শ্রেণীর উল্লেখ পাইয়াছি, তাহারও সুব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে। "সৌম্যদ্বীপ" সম্ভবতঃ ভারতের চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগেরই আবিষ্কৃত এবং তাঁহাদের দ্বারাই উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তাহাতেই তাঁহাদের বংশ-প্রবর্ত্তক চন্দ্রের নামে ইহার নামকরণ হইয়াছিল। এই দ্বীপ হইতেই তাঁহারা সম্ভবতঃ ক্রমে ক্রমে আফ্রিকার উপকূল-প্রদেশে ও অভ্যন্তর ভাগেও যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং চন্দ্র নামের দ্বারাই ঐ সমস্ত স্থানের নামকরণ করেন। দক্ষিণ-ভারতের পাণ্ড্যরাজ্যের সহিত চন্দ্রবংশীয় পাণ্ডুসন্তানদিগের যোগ বিশেষ রূপেই স্পষ্টীকৃত। ইহাঁদের দ্বারা এই সমস্ত উপনিবেশ স্থাপন অসম্ভাবিত বোধ হয় না।

পক্ষান্তরে ঈজিপ্টের সহিত সূর্য্যবংশীয়দিগের যোগও অসম্ভাবিত নহে। ঈজিপ্টের রাজাদিগের "রামসেস্" নামে যেমন সূর্য্যবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা রামচন্দ্রেরই রূপান্তর লক্ষিত হয়, তেমনই ঈজিপ্টের সন্নিকট নিউবিয়া দেশের প্রথম রাজ-নামেও রাম-তনয় কুশ নামের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট রূপেই লক্ষিত হয়। নিউবিয়া রাজ্য-সম্বন্ধে একটী প্রামাণিক ইংরাজী গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :—

"Under the Pharaohs the country was known as the kingdom of Cush," (Beeton's Dictionary of universal Information,), শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়ের পর আর্য্যেরা আরও দূরতর দেশ বিজয়ে সমুৎসাহিত হইয়াছিলেন, ইহা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। লঙ্কার পশ্চাতে দূরতর দেশ আফ্রিকাই হয়। সুতরাং রামচন্দ্রের বংশধরেরা বিজয়াভিযান লইয়া ঈজিপ্টে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাতে অসম্ভাব্য কিছুই দেখা যায় না। ইহা হইতে রামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়েই যে আফ্রিকার সহিত সংস্রবের প্রকৃত সূত্র পাওয়া যায়, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণই দেখা যাইতেছে।

ধর্ম্মের বিকৃতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় এম-এ

সেদিন দিল্লীতে যে দাঙ্গা হইয়া গেল, তাহাতে কেবল যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা সাময়িক বিরোধ প্রকাশ পাইল তাহা নহে। উভয় জাতির মধ্যে মনে-মনে যে একটা দাঙ্গা সর্ব্বদাই চলিতেছে, দিল্লীর দাঙ্গা তাহারই একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বাংলাদেশে এ প্রকার দাঙ্গা দেখা যায় না সত্য, কিন্তু এ দাঙ্গার অভাবের কারণ পরস্পরের মধ্যে একান্ত ভ্রাতৃভাব নহে, ইহার কারণ উভয়ের শক্তি ও সাহসের অভাব, শারীরিক কষ্টের ভয় এবং যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির অভাব। যদি দুই জাতির মধ্যে বাংলায় নিতান্ত ভ্রাতৃভাব থাকিত, তাহা হইলে চাকরীর ভাগের জন্য ব্যবস্থাপক-সভায় এত প্রশ্ন এবং খবরের কাগজে এত চিঠি বাহির হইত না এবং প্যাক্টের প্রয়োজন বাংলায়ই প্রথম হইত না। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পরস্পর বিরোধের গোড়ায় তাহাদের বিভিন্ন ধর্ম্ম।

গোঁড়া-খৃষ্টানরা মনে করেন, যাঁহারা খৃষ্টান নন, তাঁহারা চিরদিন নরকে বাস করিবেন। তাই তাঁহারা অখৃষ্টান জাতিদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ব্যস্ত। প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মের লোকের ধারণাই এইরূপ এবং সেই জন্যই প্রত্যেক ধর্ম্মের মিশনারীরা—যাঁহারা ধর্ম্মের রক্ষয়িতা বলিয়া নিজদিগকে মনে করেন তাঁহারা সকলেই পর-ধর্ম্মের লোককে নিজের ধর্ম্মে আনিতে চান। মিশনারীরা এই প্রকারে স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রচার করেন এবং প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে অন্য সমস্ত ধর্ম্মকে কুধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত করেন। হিন্দুধর্ম্মে মিশনারী নাই, কিন্তু হিন্দু পুরোহিত বা পণ্ডিতেরা এই প্রকার কথাই বিশেষ করিয়া প্রচার করেন। ভারতে অধুনা যে সব সমাজ হইয়াছে, তাহারাও প্রাচীন সমাজেরই অনুকরণ করিয়া নিজ নিজ মহিমা প্রচারে ব্যস্ত।

কোন ধর্ম্ম বড়, কোন ধর্ম্ম ছোট, তাহা বলা সহজ নয়। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্; আমরা তাহার কি বুঝিব? কিন্তু এ কথা সহজেই বুঝিতে পারি যে, সাধারণ কাজে অন্যের উপরে নিজের প্রাধান্য দেখাইতে গেলে যেমন একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, ধর্ম্মের বেলায়ও তেমনই। নিজ নিজ জিনিষের প্রাধান্য প্রমাণ করিতে যাইয়া যেমন দোকানদারদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও শেষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়, ধর্ম্মসমূহের মধ্যেও তেমনি।

ধর্ম্মের প্রচার অর্থাৎ প্রাধান্য-প্রচার যে মানব-সমাজের পক্ষে কত অহিতকর, তাহা দুই এক কথায় বলা অসম্ভব। এই প্রচার হইতেই হিন্দু শেখে, মুসলমান যবন, অস্পৃশ্য। মুসলমান শেখে হিন্দু অপবিত্র, কাফের; খৃষ্টান ভাবে সে ধর্ম্মের অমৃত পান করিতেছে এবং আর সকলেই শয়তানদত্ত ক্লেদ-ভোজী। এই প্রচার হইতেই ব্রাহ্ম-সমাজ ও আর্য্য-সমাজ ভাবিতে শেখেন, তাঁহারা ভারতের পাপী-তাপী-দিগের উদ্ধারের জন্য একটা মিশন লইয়া ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহারা অনেকেই কেবল আত্মার মঙ্গলের জন্যই ব্যস্ত; দেহ যদি আহার অভাবে লয় পাইবারও উপক্রম হয়, তথাপি ইহারা তাহার দিকে মনোযোগ না দিয়া কেবল আত্মার উদ্ধারের জন্যই কর্ম্মরত থাকেন।

এই উদ্ধার করিবার ক্ষমতার অহঙ্কারই সব ধর্ম্মের সার শুকাইয়া দেয়। প্রচারকদিগের অহঙ্কার সমাজস্থ অন্য লোকে সংক্রামিত হয়। পরিণামে ধর্ম্ম হয় অহঙ্কারের ধর্ম্ম, সমাজ হয় গর্ব্বিত লোকের সমাজ। সমাজের এই দুরবস্থা দূর করিবার জন্য মোল্লা, মুন্সী, মিশনারী, প্রচারক, পুরোহিত, পণ্ডিতদিগের কার্য্য কলাপ বন্ধ করিয়া দেওয়াই আপাতঃদৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় মনে হয়। কিন্তু তাহা

সম্ভব নয় বলিয়া তাহাদের মতিগতি বদলাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা সঙ্গত। ইঁহারা আত্মার উদ্ধারের স্পর্দ্ধা করিতে যাইয়া, মানুষকে বিগ্‌ড়াইয়া দেন। রাম যে রহিমকে, ও রহিম যে রামকে ভালবাসিতে পারে না, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা উভয়েই এই শিক্ষা পাইয়াছে যে, পরের ধর্ম্ম মাত্রই কু-ধর্ম্ম। এই ধারণার জন্য পরিশেষে তথাকথিত ধর্ম্ম-সংরক্ষয়িতারা দায়ী নন কি ?

সমাজ-বিশেষের উপর ধর্ম্ম যে কুফল প্রসব করিয়াছে, তাহা দেখান হইল। এখন ব্যক্তি বিশেষের উপর ধর্ম্মের অনিষ্টের কথা বলিব।

ব্যক্তি-বিশেষের উপর ধর্ম্ম যে অনিষ্ট করে, তাহা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। (১) অহঙ্কারের সৃষ্টি। (২) সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি। উভয়েরই ফল পরের প্রতি ঘৃণা।

(১) অনেক হিন্দু যখন বাড়ীতে খুব আড়ম্বর করিয়া পূজা-পার্ব্বণ করেন বা দ্বারকা, কেদারনাথ, সেতুবন্ধ, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহাদের কতটুকু ধর্ম্ম হয় সে কথা বলা শক্ত, কিন্তু তাঁহাদের যে বিশ্বাস হয় যে ধর্ম্ম কিছু নিশ্চয়ই উপার্জ্জিত হইয়াছে, সে কথা বলা শক্ত নয়; তাঁহাদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলিয়াই তাহা প্রতীত হয়। এই বিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে যাহারা এই সকল তীর্থ ভ্রমণ করে নাই, তাহারা যে নিতান্ত 'গরীব-বেচারা' এ জ্ঞানটাও বেশ হয়। মুসলমানের মক্কা-ভ্রমণ সম্বন্ধেও তাই। তাঁহার আবার নিয়ম এই যে, তিনি মক্কা-ভ্রমণ করিলে একটা উপাধিও পান, তিনি হন হাজী। যাঁহারা সমাজে বা গীর্জ্জায় যাতায়াত করেন, তাঁহাদের মধ্যেও যে এই অহঙ্কারটী কম তাহা নহে। তাঁহাদের এই গুণের জন্য তাঁহারা সম্মান প্রত্যাশা করেন, এবং না পাইলে প্রচারও করেন।

এই প্রকারে লক্ষপতি যেমন তাঁহার লক্ষের দাবীতে সমাজে recognition চান ও অহঙ্কার করেন, ধার্ম্মিকও তেমনি তাঁহার ধর্ম্ম-ধনের জোরে সাধারণ মানুষ হইতে উচ্চ আসন চান। ধর্ম্ম এই প্রকারে ভগবানকে ছাড়িয়া ভগবানের দোহাই-এ পরিণত হইয়াছে, আর ধার্ম্মিক মধ্যযুগের রোমের পোপের মত ভগবানের কাছারীর চাপরাশধারী বেয়াদব পেয়াদা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ধর্ম্ম বাহিরের খোসায় পরিণত হইয়া সবাইকে জ্বালাতন করিতেছে, ভিতরের রসের খোঁজ কেউ পাইতেছে না, কেউ তার স্বাদের আনন্দ পাইতেছে না।

(২) সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি এই ধরণের ধর্ম্ম-চর্চ্চার দ্বিতীয় কুফল। প্রথমতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি, বিশেষতঃ প্রচারক, মিশনারী প্রভৃতি, বুঝিতেই পারেন না যে তাঁহার ধর্ম্ম সাধন ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম্ম সাধনে জীবন উন্নত হইতে পারে। তাহা বুঝিতে পারিলে, তিনি নিজের দলের জন্য লোক খুঁজিয়া না বেড়াইয়া সকলকে নিজ-নিজ ধর্ম্ম সাধন করিতে বলিতেন। বর্ত্তমান সভ্য-সমাজের বিভিন্ন ধর্ম্মের নৃশংস ভাব প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে, নরবলি এখন আর চলিত নাই, জীববলির অন্যায্যতা সম্বন্ধেও লোকে ভাবিতে শিখিয়াছে। এখন প্রায় সব ধর্ম্মই সুমার্জ্জিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তরে টানাটানি করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। যাহা হউক, নিজ-ধর্ম্মের সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ ধারণা ভিন্ন তাঁহাদের আরও একটী সঙ্কীর্ণতার কারণ তাঁহাদের নীতি-জ্ঞান! ধার্ম্মিকরা ধর্ম্মের সঙ্গে নীতিকে বেশ করিয়া জড়াইয়া লইয়া ভাবেন, তাঁহাদের নীতিই জগতে শ্রেষ্ঠ নীতি, আর সেই নীতি যে অনুসরণ করে না সেই কুনীতি-পরায়ণ। কেবল নীতি-বিষয়েই বা কেন? দৈনন্দিন আচার ব্যবহার বিষয়েও তাঁহারা চান যে সমস্ত দুনিয়ার লোক তাঁহাদের মত আচার-ব্যবহার করুক। যে তেমন আচার-ব্যবহার করিবে না, সে অসদাচারী। যে ধার্ম্মিক ব্যক্তি সুপারী খান, তিনি হয়ত পান-খোরকে পাপী বলিয়া স্থির করেন, আর যিনি গরীব স্ত্রী-লোক, দাসী বা চাকরাণীর উপর গালাগালি বর্ষণ করিতে ইতস্ততঃ করেন না, তিনি হয়ত ভদ্র-স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের কিছু অল্পতা দেখিলেই বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রকার ধার্ম্মিক লোকেরাই সমাজে বেশ সম্মান পাইয়া আসিতেছেন। সাধারণ লোকের সমাজে যেমন তিলক-নামধারী বৈরাগী গৃহস্থ হইলেও বেশ ভিক্ষা ও ভক্তি পায়, ভদ্র-লোকের সমাজেও তথা-কথিত ধর্ম্মরত নীতিজ্ঞান-পরায়ণ ব্যক্তির প্রতিই লোকে মস্তক অবনত করে। আজ কাল যেমন বিনা-মূলধনেও মহাজন হওয়া চলে, বেশ ব্যবসায় চালান যায়, তেমনি তোমার যদি কোন সদ্‌গুণ নাও থাকে তবু দুই-চারিটী Negative Virtue-কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে দশজনের সেলাম পাইবেই পাইবে।

ধর্ম্ম এখন হইয়াছে বাহিরের জিনিষ। আজকাল যাঁহারা বেশী কোষা-কুষী নাড়াচাড়া করিতে পারেন বা মন্দির, মস্‌জীদ বা গীর্জ্জায় বেশী-বেশী যাতায়াত করিতে পারেন, তাঁহারাই নিজেদের কাছে ও পরের কাছে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এদের ধর্ম্ম-হীনতা ধরা পড়ে সামান্য-সামান্য ব্যাপারে। গৃহ-স্বামীর কোষা-কুষী যদি ঠিক সময়ে সাজান না হয় তবেই তিনি চেঁচামেচি করিয়া বাড়ী মাথায় করেন। ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া মন্দির বা গীর্জ্জায় যাইতে যদি নিজের দোষে দেরী হয়, তবুও ঘোড়াই শাস্তি পায়,—ধার্ম্মিক হুকুম করেন, "কোচম্যান, জোরে হাঁকাও, চাবুক মার।" যাঁহারা দেব পূজায় পশু বধের নিন্দা করিতে করিতে দুই চক্ষে জল আনেন, তাঁহারাই দেবপূজার পথে ঘোড়াকে মারিতে মারিতে লইয়া চলেন। জাতিভেদ যে অমানুষিক এ কথা যাঁহারা বলেন, নিম্নশ্রেণীর প্রতি উচ্চ বর্ণের ব্যবহারকে যাঁহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া উঠাইয়া দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন, এরকম লোককেও দেখা যায়, তাঁহারা ভীষণ বৃষ্টিপাতের মধ্যে গাড়ীর ভিতরে সুরক্ষিত হইয়া যাইতেছেন, আর তাঁহার চাপরাশী কোচম্যানের পাশে বসিয়া ভিজিতে ভিজিতে যাইতেছে। অথচ গাড়ীতে আরও তিন জনের বসিবার মত স্থান রহিয়াছে।

তাই বলিতেছি, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম একটা accomplishment বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম্ম হৃদয়ের অংশ স্বরূপ হইয়া সমস্ত আচার

ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত না করিয়া বাহিরের মতবাদ ও routine work হইয়াছে। ধর্ম্ম যদি মনের রংকে তাহার নিজের রংএ পরিণত না করিল, যদি তাহার একটা atmosphere তৈরী করিয়া না লইল, তবে সে ধর্ম্ম বৃথা জিনিষ। মাতৃভাষার মত এ ধর্ম্ম নিজের জিনিষ নয়; এ ধর্ম্ম আরবী, পার্শী, গ্রীক বা হিব্রু ভাষার মত। দরকার হইলে ইহা শিখিয়া কথাবার্ত্তা বলা চলে, কিন্তু জীবনের প্রতিক্ষণের কাজ-কর্ম্মে, চিন্তায়, কল্পনায় বা স্বপ্নে ইহার ব্যবহার নাই। যে ধর্ম্ম তোমার নিজের হইয়া গিয়াছে, তাহার স্ফূর্ত্তি হইবে তোমার প্রতি কার্য্যে, প্রতি ভাবনায়, প্রতি আচার ব্যবহারে—প্রতি মুহূর্ত্তে; সে মাতৃভাষার মত; তোমার অজ্ঞাতে, অনিচ্ছায়—সর্ব্বক্ষণ সে তাহার নিজের রূপ লইয়া বাহির হইয়া পড়িবে।

আজকাল ধর্ম্মের নামে সাধারণতঃ যাহা চলিতেছে তাহার হাত হইতে সমাজ তথা ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে হইলে ধর্ম্মকে বাহির হইতে সরাইয়া লইয়া অন্তরে বসাইতে হইবে। সেজন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া দরকার—তাহার যে ভাবে ইচ্ছা সে ভাবে সে তাহার ধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিবে ও আচরণ করিবে! ধর্ম্ম বিষয়ে কাহারও প্রতি জোরজবরদস্তি করা যেমন অসঙ্গত, নিজের ব্যক্তিত্বের গুরুভারও অন্যের উপর চাপাইয়া দেওয়া সেইরূপ অন্যায়। ইহাতে মানুষের নিজের ব্যক্তিত্ব অঙ্কুরেই বিনাশ হয়, মানুষ সারহীন, মেরুদণ্ডবিহীন হইয়া যায়। এ প্রকার ক্ষতি কাহারও করা উচিত নয়। এই স্বাধীনতা দান বিষয়ে হিন্দু সমাজ সর্ব্বাপেক্ষা উদার। নব্য হিন্দু সমাজের লোকেরা আজ যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে চিন্তা করিতে পারিতেছেন, যেমন ইচ্ছা তেমন অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছেন। তাঁহারা একেশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন, অথচ প্রতিমাপূজা দেখিলে পাপ হয় এমন কুসংস্কারও তাঁহাদের নাই, কাশী বৃন্দাবনের তীর্থ দেখিলেও তাঁহাদের জাত মারা যায় না। এ সব ব্যাপারে তাঁহাদের জনমতের অত্যাচারও (Tyranny of public opinion) সহ্য করিতে হয় না। মতামতের জন্য তাঁহাদের কোন বাঁধা ফরম নাই, যাহার নির্দ্দেশের বাহিরে যাইবার অধিকার থাকে না। আজকাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোকেরাও যেমন ইচ্ছা হইলে কমিউনিষ্টিক ভাবে চিন্তা করিবার অধিকার চান, তেমনি বিভিন্ন সমাজের লোকদিগকেও ইচ্ছা হইলে নাস্তিকভাবে বা সন্দেহবাদীভাবে চিন্তা করিবার অধিকার দেওয়া উচিত।

ভবিষ্যতের ধর্ম্ম কেমন হওয়া উচিত তাহা মনে হইলে, এই কথাই সঙ্গে-সঙ্গে মনে হয় যে, আমাদিগকে খাঁটী হিন্দু, খাঁটী ব্রাহ্ম, খাঁটী মুসলমান বা খাঁটী খৃষ্টান হইবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া খাঁটী মানুষ হইবার ইচ্ছা করাই উচিত। তুমি যে সমাজেই থাক না কেন, তোমার গায় যে Trade mark-ই থাকুক না কেন, তোমার লক্ষ্য করা দরকার তুমি খাঁটী মাল কিনা। জীবনে সত্যের সাধন ও প্রেমের সাধনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যাঁর জীবনে এই দুইটী সাধিত হয় নাই, তাঁহার সব সাধনই বৃথা। জলজীবের জীবন ধারণ পক্ষে যেমন জলের প্রয়োজন, মানব সমাজে সুখ শান্তির জন্য তেমনি সত্য এবং ভালবাসার দরকার। ভবিষ্যতের মিশনারী বা প্রচারকের কর্ম্ম হইবে মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে প্রীতির প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন ধর্ম্মের মিলনভূমি নির্দ্দেশ। ভবিষ্যতের ধার্ম্মিক কেবল লোককে উপদেশ দিবেন না, কেবল নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী মন্ত্র লইয়া জপ করিতে থাকিবেন না। তিনি সবাইকে ভালবাসিবেন, সবাইকে ভালবাসায় অনুপ্রাণিত করিবেন। তিনি যে পথে বিচরণ করিবেন সে পথের সবাই উপকৃত হইবে, তিনি ভ্রমণ করিবেন "বসন্ত বল্লোকহিতং চরন্তম্"—বসন্তের বায়ুর মত তিনি সকলের আনন্দ বিধান করিবেন। ভবিষ্যতের ধর্ম্মে লোকের ভগবান বিষয়ে যে ধারণাই থাকুক না কেন, তাহাদের জীবনে যত প্রকার বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষাই থাকুক না কেন, একটা সাধারণ জিনিষ তাহাদের থাকিবে—সেটা পরস্পরের প্রতি প্রেম ও তাহার সাধন।

দুঃখ

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

এই যে ঘিরিয়া মোরে নাচে ঢেউগুলি
গরজি গভীর হাহাকারে,
আঁকড়ি রাখিতে চাহে ধরণীর ধূলি
কিনারে আছাড়ি বারে বারে—
তুমি যে অন্তরে মোরে রয়েছ আগুলি
ওরা কি তা' পারে জানিবারে ?

এ মোরে করালে খেলা এই সারারাত
সাগরের সাথ,
এ পারে যে দিয়েছ প্রভাত !

চিঠির মাশুল

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সর্ব্বেশ্বর ভোল ছিল পঞ্চাশ টাকা বেতনের সাব্‌পোষ্ট-মাষ্টার। বেশ সুস্থ সবলকায়, বয়স মাত্র আটত্রিশ। ডাকঘরের অন্যান্য পোষ্টমাষ্টারদের জীবন যেমন একঘেয়ে, সর্ব্বেশ্বরের তাহা ছিল না। সে প্রত্যহ সন্ধ্যায় সেতার বাজাইত, ছেলে-মেয়েদের হার্ম্মোনিয়ম সংযোগে গান শিখাইত, স্থানীয় ভদ্রলোকদের বাড়ী বেড়াইতে যাইত, গল্প করিত, হাসিত এবং এমন কি সুযোগ পাইলে থিয়েটারের রিহার্সল পর্য্যন্ত দিত। এই সব কারণে, যেখানেই সে থাকিত, সেইখানেই অতি অল্প দিনের মধ্যেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজন-পরিচিত হইয়া পড়িত। সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

হঠাৎ সর্ব্বেশ্বরের এক দিন একটু জ্বর হয়; এক দিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন গেল, জ্বর ছাড়িল না। জ্বর লইয়াই আফিসের কার্য্য করে, কার্য্য শেষে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়ে। যেখানে এই পোষ্ট আফিস, সে একটা মহকুমা। সরকারী ডাক্তার আছে। ডাক্তার বাবু সংবাদ পাইবামাত্র আসিলেন। চিকিৎসা আরম্ভ হইল। সাত দিন কাটিল। জ্বর ছাড়া দূরে থাকুক্, আরও অন্যান্য অনেক উপসর্গ আসিয়া জুটিল। সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রী দামিনী বড় ব্যস্ত ও চিন্তিত হইয়া পড়িল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, ছুটির দরখাস্ত করুন। দরখাস্ত হইল। ৩।৪ দিনে নিউমোনিয়া স্পষ্ট রূপে যখন আত্ম-প্রকাশ করিল, তখন টেলিগ্রাফ্ করা হইল, ক্রমে ডাকঘরের কায বন্ধ হইল—কারণ এ আফিসে সর্ব্বেশ্বরই সর্ব্বেশ্বর ছিল; আর তাহার অধীনে তিনটি পিয়ন ও দুইটি ডাক-হরকরা ছিল। প্রায় রোজই একখানি করিয়া টেলিগ্রাম হইতে লাগিল, কিন্তু ডাকঘরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নীরব। এগার দিনে সর্ব্বেশ্বর জন্মের মত চক্ষু বুজিল, সংসারের সব বাঁধন কাটাইল, কিন্তু ডাকঘরের বাঁধনটি আর কাটিল না। তিনটি ছোট ছোট মেয়ে, কোলে একটি শিশু পুত্র ও ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র গোকুলচন্দ্রকে লইয়া দামিনী চক্ষে অন্ধকার দেখিল। একে অর্থাভাব, তার উপর এই মহাবিপদ, আর এই বিদেশ,—কি যে করিবে ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। আপনার বলিতে সর্ব্বেশ্বরের কেহই ছিল না। দেশে বর্দ্ধমান্ জেলার কাটোয়া মহকুমার সুদূর পল্লীতে এক-খানি কাঁচা মাটীর বাড়ী আছে মাত্র—তাহাও বোধ হয় এত দিনে পড়িয়া গিয়াছে! কারণ বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে সর্ব্বেশ্বর দেশেও যায় নাই, বাড়ীখানির মেরামতও হয় নাই।

স্থানীয় ভদ্রলোকেরা সকলেই এই দুর্দ্দিনে এই বজ্রাহত পরিবারটিকে সান্ত্বনা দিতে আসিলেন। অনেক বাড়ীর মেয়েরাও আসিলেন। নানা কথায় সকলেই প্রবোধ দিতে লাগিলেন; প্রবোধ দেওয়া যত সহজ, প্রবোধ পাওয়া ততোধিক শক্ত। কিন্তু তবুও মানুষ বন্ধু বান্ধবকে চিরদিনই দিয়া থাকে। দশজনের সহানুভূতিতে অশ্রু-জলে ও সমবেদনায়—বুকের ভার কতকটা হাল্কা হয় বৈ কি!

"বল হরি, হরিবোল্"! গোকুল পিতার শেষ কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহে ফিরিল। আবার দ্বিগুণ বেগে শোক বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এমন সময়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তার আসিল—"send medical certificate" (অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাও।) গোকুল টেলিগ্রাম-খানি পড়িয়া, বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। পিয়ন দুইজন বুঝাইতে লাগিল। তখন বেলা প্রায় চারিটা। অগ্রহায়ণ মাস। শীতের আমেজ পড়িয়াছে।

চতুর্থ দিনে নূতন পোষ্টমাষ্টার আসিল। চার্জ্জ লইয়া বলিল ৪৩২৷৷৶৯ পাই তহবিলে কম। বিপদের উপর

বিপদ। হাতে নগদ মোটে সতেরটি টাকা আছে। সাতখানি পাশ বইয়ে সর্ব্বসাকুল্যে ৬১৸৶১০ ও এই উনিশ দিনের বেতন মাত্র সম্বল। পিয়ন বলিল যে পাশ বইয়ের টাকা ও এই কয় দিনের বেতন পাইতে এখনও বহু দেরী; কারণ, এ সবের তদন্ত ইত্যাদি করিতে অন্ততঃ তিন মাস সময় তো লাগিবেই। এসব ইনেস্‌পেক্টার বাবুর দয়া!

সরকারী তহবিলে টাকা কি করিয়া কম হইল, কি দিয়া এ পূরণ হইবে—শোক অপেক্ষা এই চিন্তাই দামিনীর বুকে চাপিয়া বসিল। এই তো সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! ভগবান কি আবার নূতন সর্ব্বনাশের বীজ বপন করিলেন? কে জানে!

নূতন পোষ্টমাষ্টার বাবু বেহারী! তিনিও "ফ্যামিলি"—অর্থাৎ তিনি বিপত্নীক তাঁর এক কাহারিন্ অবিদ্যা—লইয়া আসিয়াছেন। কোয়ার্টার তাঁর চাইই। দামিনী স্বামীর সঙ্গে বহু দিন হইতে ঘুরিতেছে,—সে জানে যে, এ ঘর-দুয়ারে তাহার আর অধিকার নাই। কিন্তু কোথায় যায়? এই সব ছেলেপুলে লইয়া কোথায় গিয়া দাঁড়ায়? নূতন বাবু আসিয়া প্রথম দিন হইতেই কোয়ার্টার খালি করিয়া দিতে বলিতেছেন, অথচ আজ দুই দিন হইয়া গেল।

গোপেন্দ্র মিত্র বড় উকীল, মস্ত বাড়ী—গোকুল মাতার নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার কাছে গিয়া একটু আশ্রয় ভিক্ষা করিল। তিনি দয়া করিলেন। এই হতভাগ্য পরিবার স্থান পাইয়া যত না খুসী হইল, পোষ্ট আফিসের ঘর ছাড়ায় তার চেয়ে অনেক বেশী সোয়াস্তি অনুভব করিল; কারণ, নবাগতা গৃহাধিকারিণীটি এই দুই দিনেই ইহাদিগকে বড়ই উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

গোপেন্দ্রবাবু বার লাইব্রেরীতে গিয়া অন্যান্য উকিলদের নিকট হইতে কিছু কিছু চাঁদা তুলিয়া দিলেন—কোনও রকমে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা হইল। ওদিকে গ্রামে যাঁহারা সর্ব্বেশ্বরের জামিন ছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বেশ্বরের পৈত্রিক ভিটাটি বিক্রয় করাইয়া সরকারী তহবিলের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিয়াছেন—সংবাদ আসিল। শেষ যে একটু আশ্রয় ছিল, তাহাও গেল। এখন উপায়?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোকুলের স্কন্ধে এখন বিধবা মাতা, পাঁচ, সাত ও নয় বৎসরের তিনটি ভগিনী ও দেড় বৎসরের একটি ভাই। তাহার বয়স মাত্র তের, সে হাই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিল। বাড়ী নাই, ঘর নাই, দেশ নাই, অর্থ নাই—একেবারে নিরাশ্রয়। গোপেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে বাস করিতেছে, তিনিই খাইতেও দিতেছেন; কিন্তু এ যেন তাহাদের উপবাসের যন্ত্রণা হইতেও অধিক যাতনা-দায়ক মনে হইতে লাগিল। কিন্তু এ যাতনার হাত এড়াইবারও উপায় নাই। পেটের জ্বালা যে পৃথিবীর সকল জ্বালার চেয়ে বড়।

দামিনী গোপেন্দ্র বাবুর পত্নীর নিকট প্রস্তাব করিল—"মা, তিনটে ঝি আর কি জন্যে? একটা ছাড়িয়ে দাও। ওর কায আমিই কর্‌ব।"

গৃহিণী খুব হিসাবী; প্রকৃত পক্ষে এই সংসারের, এবং গোপেন্দ্র বাবুরও, তিনিই একমাত্র কর্ণধার। তিনি যদি একমুহূর্ত্ত অন্যমনস্ক থাকেন, তবে গোপেন্দ্র বাবুর মত কিস্তিও বান্‌চাল্ হয়ে যায়। বলিলেন—"না না, তা'ও কি কখনো হয়? তোমরা আর কদ্দিনই বা আছ, আর কদ্দিনই বা থাক্‌বে এখানে?" কথা কয়টি তিনি খুব উদাসীন ভাবেই বলিলেন।

দামিনী বলিল—"না মা, যখন আপনারা ছিচরণে ঠাঁই দিয়েচেন, তখন আর ঠেল্‌বেন্ না। আপনাদের বাড়ীর এঁটো মাজ্‌লে আর আমাদের তো জাত যাবে না। আপনাদের পাতের চোতের দুটো ভাত কুড়িয়ে খেয়ে গোকুলের একটা হিল্লে লাগুক্। অবিশ্যি আপনারা রাজা মানুষ—আপনাদের নর্দ্দামায় যে ভাত পড়ে থাকে, তাই খেয়ে আমাদের মতন একটা গেরস্ত মানুষ হয়ে যেতে পারে।" দামিনীর বুক ফাটিয়া কান্না আসিল।

প্রথম কথা কয়টি শুনিয়া গৃহিণীর মনটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা কি তবে আর উঠিবে না না কি? কিন্তু শেষের মিষ্ট কথাগুলি শুনিয়া মনটা নরম হইয়া পড়িল। মনে মনে বলিলেন—"থাক্ গে না হয়। আহা, বাড়ীও বিকিয়ে গেল, যায়ই বা কোথা?" তোষামোদ না পারে, এমন কার্য্য সংসারে কি আছে? ভগবানই যখন চাটুবাক্যে গলিয়া বর দিয়ে ফেলেন, তখন মানুষের মন ভিজিবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

দামিনী তৃতীয় দাসীর স্থানে নিযুক্ত হইল। গোকুলকে

হেডমাষ্টার ছাড়িলেন না—বিনা বেতনে স্কুলে নাম লিখিয়া লইলেন। নিজের বাসায় তাহাকে রাখিয়া দিলেন।

গোকুল সচ্চরিত্র ঠাণ্ডা ও খুব মেধাবী বালক ছিল। শিক্ষকেরা সকলেই তাহাকে ভালবাসিতেন—এবং সম্প্রতি তাহার পিতৃ-বিয়োগের পর একেবারে নিরাশ্রয় হওয়ায় সকলেই তাহাকে অনুকম্পার চক্ষে দেখিত।

গোকুল কিন্তু সর্ব্বদাই অত্যন্ত বিমর্ষ থাকিত। মুখখানা অস্বাভাবিক রকমে ভার করিয়া কি চিন্তা করিত, কথা-বার্ত্তা নিতান্ত যাহা না বলিলে নয় তাহাই বলিত, এবং সর্ব্বদাই কেমন বড় অন্যমনস্ক থাকিত। এই শহরে যখন তাহার পিতা পোষ্টমাষ্টার ছিল, তখন তাহার কতই না সম্মান ছিল। আজ সেইখানেই তাহার জননী দাসী ও সে অন্য একজনের অন্নদাস গলগ্রহ ও বিনা বেতনের ছাত্র। সকলেই তাহাকে যে অযাচিত ভাবে দয়া করিতে আসে, তাহাতেই গোকুল বড় মর্ম্মাহত হয় ও লজ্জা অনুভব করে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া তো বলিতে পারে না যে, ওগো তোমরা আমায় দয়া করে অনুকম্পা করো না। যে কথা মুখ ফুটিয়া বলা যায় না, তাহার ব্যথা বড় নিদারুণ। গোকুল তাই এই লজ্জা, এই দুঃখ ও এই সব অপমান নীরবে সহ্য করে। আশা, যদি কখনও সে অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, যদি কখনও তাহার নিরাশ্রয়া স্নেহময়ী জননীর ব্যথা-ম্লান সতত অশ্রুনিষিক্ত মুখে আবার হাসি ফুটাইতে পারে। ভগবান সেদিন কি কখনও দিবেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিন বৎসর কাটিয়া গেল। গোকুলচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইল। এইবার একটা চাকরী চাই।

দামিনী এখনও গোপেন্দ্র বাবুর বাড়ীতেই কন্যা তিনটি ও শিশু পুত্রটি সহ দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত। দামিনী ছেলে মেয়েগুলি লইয়া গোয়ালঘরের পাশে ছোট একটা চালায় বাস করে ও দিবারাত্রি সংসারের কায করে। মেয়েগুলিও এই সংসারের ফাই ফরমাশ খাটে। গোকুল রোজ সন্ধ্যায় আসে, ছুটির দিন দুপুর বেলায় আসিয়া মায়ের চালায় বসে; ভগিনীদের সঙ্গে দুই চারিটি কথা বলে, মাতার কোলে মাথা রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে শয়ন করে; তার পর আস্তে আস্তে নীরবে উঠিয়া চলিয়া যায়। কথা খুব কম বলে, হাসি তামাসা তো সে যেন জানেই না। এই অকাল ও অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য জন্য সহপাঠী মহলে গোকুল একেবারে একঘরে। সকলেই বলে, "ভাল ছেলে বলে' ওর গরবে আর মাটিতে পা পড়ে না।" গোকুল শুনিত তবু কিছুই বলিত না। সে বরং একাকী থাকিয়া সুখীই হইত।

পাশের খবর আসিল। গোকুলের মুখ ভাব একটুও পরিবর্ত্তিত হইল না। হেড মাষ্টার যতীন বাবু ও তাঁহার পত্নী কত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, কত আশীর্ব্বাদ করিলেন—গোকুলের মুখ হইতে কোনও কথা নিঃসৃত হইল না, কেবল তাহার নিষ্প্রভ নয়ন যুগল হইতে দরদর ধারে কয়েক ফোঁটা বড় বড় তপ্ত অশ্রুবিন্দু ভূপতিত হইল মাত্র।

দামিনী শুনিল; শুনিয়া কুটীর মধ্যে আসিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিল। আজ কোথায় সে, যাহার পুত্র আজ পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে? সে যে শুধু দুঃখের বোঝাই চিরদিন বহিয়া গিয়াছে, এ সুখের দিনে কোথায় সে—কোথায় সে? ওগো—

দামিনীর ডাক পড়িল উপরে গিন্নির ঘরে। তাড়াতাড়ি সে চোখ মুছিয়া চলিয়া গেল। গরীবের শোকেরও যে সময় নাই। এ আনন্দ নয়, এ শোক! এ তরঙ্গিনীর নয়ন-সুভগ ঊর্ম্মিবিলাস নয়, এ যে জলোচ্ছ্বাসের পূর্ব্বরাগ! এ চন্দনগিরির দক্ষিণানিল নহে, এ যে প্রলয়ের প্রারম্ভের ঝঞ্ঝাদূত! গোকুল পাশ হইয়াছে, কিন্তু শোকসিন্ধু বহুদিন পরে আবার উথলিয়া উঠিল। এ গূঢ় রহস্য দুঃখী ছাড়া কে বুঝিবে?

গিন্নী আনন্দ প্রকাশ করিলেন, দামিনী কাঁদিয়া ফেলিল। গিন্নী গোকুলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—দামিনীর অশ্রুভারনত ছল ছল চক্ষু দুইটি কৃতজ্ঞতায় জ্বলিয়া উঠিল। দাদার পাশের খবরে মায়ের এত কান্না কিসের, বড় মেয়ে তুলসী কিছুতেই অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে না পারিয়া, যেন কেমন হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

গোকুল আসিলে কর্ত্তা গিন্নি হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর অন্যান্য চাকর-বাকরেরা পর্য্যন্ত গোকুলের পাশের খবরে আনন্দ প্রকাশ করিল, আশীর্ব্বাদ করিল ও অবিলম্বে শুভদিনের প্রত্যাগমন কামনা করিল—কিন্তু গোকুলের দৈন-ম্লান সঙ্কুচিত মুখখানিতে কোন রকম বৈচিত্র্য

পরিলক্ষিত হইল না। সে তাড়াতাড়ি মায়ের ঘরে ঢুকিয়া যেন আত্মগোপন করিয়া বাঁচিল। শতছিন্ন অতি মলিন একখানি কাঁথার উপর আসিয়া ধপ করিয়া শুইয়া পড়িল, যেন কতই ক্লান্ত।

হর্ষে, বিষাদে, উত্তেজনায় ও ক্ষীণ ভরসার পুলকে দামিনীর আর সেদিন আহারে রুচি রহিল না—সে তাড়াতাড়ি আপনার ঘরে ঢুকিয়াই শত চুম্বনে ও নীরব অকারণ অশ্রুনিষেকে গোকুলকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে, মাতা পুত্রে অনেক পরামর্শ হইল। স্থির হইল যে যাহা হয় একটা চাকরী পাইলেই এই হীন দাস্য-বৃত্তি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়! চাকরী একটা চাই-ই।

গোকুল চাকরীর চেষ্টায় লাগিয়া গেল। সকাল হইতে দুপুর, আর বিকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুরিয়াও কোনও সুরাহা করিতে পারিল না। সকলে বলিল—কলিকাতায় যাও, সেখানে বহুৎ কায। বাইরে এ সব মফঃস্বলে, তাতে এই উড়ে ও মেড়োর দেশে, কি বাঙালীর ছেলের চাকরী হয় হে বাপু?

গোকুল গোপেন্দ্র বাবুকে বলিল। তিনি গাড়ীভাড়া দিলেন ও কলিকাতায় তাঁহার নিজ বাড়ীতে থাকিবার আদেশ দিয়া পত্র লিখিয়া দিলেন।

মাতার অশ্রুসিক্ত আশীর্ব্বাদ ও কম্পিত চরণের ধূলি লইয়া গোকুল শুভদিনে কলিকাতায় যাত্রা করিল। দামিনীর আহার নিদ্রা ছুটিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠিক হেদোর ধারেই গোপেন্দ্র বাবুর বাড়ী। বড়লোক—চাকর দারোয়ান বেয়ারা মোটর সবই আছে। কলিকাতার বাসায় খবর পৌঁছিয়াছে যে, দামিনী ঝির ছেলে গোকুল চাকরীর চেষ্টায় কলিকাতায় আসিতেছে। বাঙালী ঝি চাকর মহলে ফিস্ ফিস্ চলিতে সুরু হইল।

গোকুল আসিয়া পৌঁছিল। গোবিন্দ খান্‌সামা, প্রথম নজরেই ভাবিল—এ একটা কি উৎপাত জুটল এসে? এ-ও হুকুম করবে না কি?

ভরত চাকর ঠিক করিল—সে ইহাকে "আপনি" বলিবে না; "তুমি"ই বলিবে।

ঝি অনুচ্চ কণ্ঠে কলতলায় বাসন মাজিতে মাজিতে এক নজর দেখিয়া লইয়া বলিল—"আমর, খেঁদীর বেটা পদ্দলোচন! মা খায় ভাড়া ভেনে—বেটা খায় এলাচ কিনে।"

গোকুল সপ্রতিভ। দুঃখেই সে মানুষ। জীবনের কৈশোর হইতে সে নিরাশ্রয়, জননী তাহার দাসী, ভগিনীরা তাহার পরান্নপালিতা, তাহাদের দুঃখ তাহাকে ঘুচাইতে হইবে,—হইবেই। অনেক দুঃখ অনেক লাঞ্ছনা সে সহ্য করিয়াছে, এখনও তাহার মা ও ভগিনী করিতেছে—সে কি দমিতে পারে। প্রথম দিনেই গোকুল বাড়ীর সকলেরই মনোভাব বুঝিয়া লইল। সে যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিত, খুব সাবধানে চলিত।

ঝি-চাকরেরাও তাহার নম্র ও সপ্রতিভ ব্যবহারে অবাক্ হইয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার সহিত কোন্দল বাধাইতে সক্ষম হইল না।

দাসী-পুত্র যে পাশ করিয়াছে এবং বাবু হইয়া কলিকাতায় চাকরী করিতে আসিয়াছে, এই চিন্তাটাকে কিছুতেই তাহারা হজম করিতে পারিতেছিল না। কাযেই তাহাকে খোঁচা মারিয়া উত্যক্ত করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিতে সকলেই আশ্চর্য্য রকমে একমত হইয়া উঠিল।

উপেন্দ্র বাবু বাড়ীর কর্ত্তা। তিনি গোপেন্দ্র বাবুর মামা; চিরকুমার, সদাচারী ও পরোপকারী—বয়স প্রায় ষাট বৎসর। তিনি এই ছোকরাকে বড় সুনজরে দেখিলেন। গরীবের ছেলে লেখা পড়া শিখিয়াছে—ভদ্র ব্যবহার, অমায়িক স্বভাব, নম্র ধীর—তাঁহার বড় পছন্দ হইয়াছিল। এই জন্য চাকর বাকর প্রচণ্ড ইচ্ছা সত্ত্বেও গোকুলকে ইচ্ছানুরূপ আঘাত করিতে পারিতেছিল না।

গোকুল দশটায় আহারাদি করিয়া বাহির হয়, রাত্রি নয়টা দশটায় বাড়ী ফিরে। এ আফিস ও আফিস যায়, বড় বাবু, ছোট বাবু, মেজ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে—কোনও সুফল তো ফলেই না, বরং কিছু অপমান ও গলা ধাক্কা প্রত্যহই সঞ্চয় করিয়া হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরে।

এক মাস কাটিয়া গেল, কোনও কিছুই হইল না। গোকুল হাল ছাড়িল না। দামিনীকে লেখে—এখনও কিছু হয় নাই, তবে শীঘ্রই একটা কিছু হইবে, আশা করিতেছে। মাকে আশ্বস্ত করিতে হইবে তো?

আশার আলোক দেখা গেল। তখন যুদ্ধ চলিতেছে। মেসোপোটেমিয়ার জন্য লোক সংগ্রহ হইতেছে!

গোকুল রিক্রুটিং আফিসে আসিয়া হাজির। তৎক্ষণাৎ তাহাকে মাসিক এক শত টাকা বেতনের চাকরীতে নিয়োগ করা হইল।

গোকুল পথে আসিয়া মাকে পত্র দিল, বোম্বায়ের নিকট এক স্থানে মাসিক এক শত টাকা বেতনের এক চাকরী ঠিক হইয়াছে, এক সপ্তাহ মধ্যেই সেখানে যাইতে হইবে। মেসোপোটেমিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যে যাইতে হইবে, এ কথাটি জননীকে গোকুল গোপন করিল।

এদিকের সমস্ত ঠিক করিয়া, এক দিনের মত গিয়া সে মাকে দেখিয়া আসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, গোকুল মেসোপোটেমিয়ায় কার্য্য করিতেছে। এখন তাহার বেতন হইয়াছে দুই শত টাকা। বেতনের সমস্ত টাকা তাহার মাতার নিকট যায়, সে শুধু সরকারী খোরাক পোষাকে কার্য্য করিতেছে।

গোকুলের এখন মুখে হাসি ফুটিয়াছে। দিবারাত্রি সে অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করে, অবসর পাইলেই সেই সুদূর ভারত সাগরের পরপারে বাঙ্গালী বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজবে চিত্ত বিনোদন করে। কেবল তাহার দুঃখিনী মায়ের কথা মনে পড়িলেই, তাহার চিত্ত অকারণ বিষণ্ণ হইয়া পড়ে এবং মাকে দেখিবার জন্য তাহার সর্ব্বশরীর সেই মুহূর্ত্তে অদৃষ্টপূর্ব্ব গৃহের প্রাঙ্গণে ছুটিয়া যাইতে চায়।

প্রতি ডাকে সে তাহার মাতার, ভগিনীর ও সাত বৎসরের ছোট ভাইয়ের বড় বড় লেখা পত্র পায়, হাজার-বার করিয়া পড়ে, পড়িয়া আপনার খাকী উর্দ্দির পকেটে রাখিয়া দেয়, অবকাশ পাইলে আবার পড়ে। যত দিন না পুনরায় পত্র পায়, তত দিন শেষ পত্রগুলি এইভাবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পকেটে পকেটেই থাকে।

মাতার পত্রে সে অবগত হইয়াছে যে, সুদ সমেত টাকা মিটাইয়া দিয়া, দামিনী তাহার স্বামীর ভিটাটি পুনরায় হস্তগত করিয়াছে—বড় কন্যা তুলসীর বিবাহ দিয়াছে জামাই রেলে ছোটবাবু। আবার তুলসী সন্তান-সম্ভবা—শীঘ্রই সে মাতার কাছে আসিবে। মধ্যমা সরসীর বিবাহ হইয়াছে, জামাই জামশেদপুরে টাটা কোম্পানিতে ৪৫৲ টাকা বেতনে কায করে; ছোট ছেলে বৃন্দাবন গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িতেছে, বড় দুষ্ট হইয়াছে।

শেষ পত্রে আর একটি খবর আছে। দীর্ঘ দুই বৎসর অদর্শন জন্য জননী বড়ই চিন্তিত ও একবার পুত্রের চন্দ্রবদন দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার বড় সাধ, যেন গোকুল একবার অন্ততঃ এক মাসেরও ছুটি লইয়া বাড়ী আসে! আর তিনি গ্রাম সন্নিকটস্থ আদিত্যপুর গ্রামের শ্রীহরিবাবুর কন্যার সঙ্গে গোকুলের বিবাহ সম্বন্ধ পাকাপাকি করিয়া রাখিয়াছেন। মেয়েটি বড় লক্ষ্মী ও টুকটুকে, যেন সরস্বতী ঠাকুরাণী।

শেষের কথা কয়টি গোকুলের প্রাণে এক অশ্রুতপূর্ব্ব মধুময় সঙ্গীতের সমারোহ রচনা করিয়া দিয়াছিল। প্রথম যৌবনের দৃপ্ত বাসনার বহ্নি মুখে এ এক নবীন ইন্ধন-সম্ভার। গোকুলের মনটা অকস্মাৎ অকারণ একটা পুলকের শিহরণে মুহুর্মুহু কম্পিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

এ উত্তেজনা ক্ষণিক। মাতার ব্যাকুলতায় গোকুলের চিত্তও অধীর হইয়া উঠিল। সে আবার তাহার মাকে দেখিবে, আবার মাতার ক্রোড়ে শিশুর মত লুটাইয়া পড়িবে, দুঃখিনী জননীর শেষ দৃষ্ট ম্লান মুখে তৃপ্তি শান্তি ও সুখের হাসি দেখিবে। নিজের বাড়ী যাইবে, নিজের ঘরে বাস করিবে, নিজের অর্জ্জিত অর্থের অন্নজল গ্রহণ করিবে—এ কি সাধারণ সুখ? তাহার নিজের বাড়ী, তাহার মাতা সেই গৃহের কর্ত্রী! স্নেহময়ী জননীর কর্তৃত্বাধীনে সে বাস করিবে। ভগিনীরা তাহাকে মুক্ত-হৃদয়ে আদর করিবে। জ্ঞান হইয়া অবধি এ সুখসৌভাগ্য গোকুলের কৈ হইয়াছে? গোকুল বাড়ী যাইবার জন্য, মাকে দেখিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল। এতটুকু বিলম্ব আর তাহার সহিতেছে না।

সে ছুটির দরখাস্ত করিল। ছুটি মঞ্জুরও হইল। মাকে পত্র দিল যে, তাহার ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে, শীঘ্রই বাড়ী পৌঁছিবে।

হঠাৎ আরবদিগের সঙ্গে গোলমাল বাধিয়া উঠিল। ছুটি কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখা হইল, বাড়ী যাওয়া হইল না। অথচ গোকুল তাহার মাকে লিখিয়াছে যে, সে মাঘ মাসের ৭।৮ই নিশ্চয় বাড়ী পৌঁছিবে।

দামিনী হাতে স্বর্গ পাইল। বাড়ীতে বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ হইল!

* * * *

আজ তিন দিন হইতে শত্রুপক্ষ বড়ই উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। দিবারাত্রি সমস্ত শিবির শত্রুভয়ে সন্ত্রস্ত। দিনেও কেহ তাম্বুর বাহির হইতে পারিতেছে না। সৈন্য ও শস্ত্র সংখ্যা হঠাৎ কম পড়িয়া যাওয়ায়, শত্রুপক্ষের খুবই সুবিধা হইয়াছিল। এদিকে বেস্ আফিসে তার করা হইয়াছে, এখনও সৈন্য ও শস্ত্রাদি আসিয়া পৌঁছায় নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই সকলে আশা করিতেছে—এই এল, এই এল। (O.C) সেনাপতি সাহেব ম্লানমুখে তারঘরে বসিয়া অনবরত তার পাঠাইতেছেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ জ্বলিয়া ঘর আলো হইয়া উঠিল। শত্রুরা টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিল। টেলিগ্রাফের দফা রফা!

সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনিও আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যে ভরসায় ডাকঘরে বসিয়া ছিলেন, সে ভরসাও বিনষ্ট হইল।

অপরাহ্ণ। মাঘমাস। দারুণ শীত। সাহেব নিজ তাম্বুতে গিয়াই হুকুম দিলেন যে, পুনরায় হুকুম না দেওয়া পর্য্যন্ত বেলা ছয়টার পর শিবিরের কোনও স্থানে যেন কেহ কোনও প্রকার আগুন না জ্বালে। সমস্ত শিবির অন্ধকার। রান্না-খাওয়া অতএব সব ছয়টার পূর্ব্বেই শেষ করিতে হইবে। ঠিক ছয়টার সময় বিগল্ বাজিবে। অমনি সমস্ত আগুন, সমস্ত আলো এক সঙ্গে নিভিয়া যাইবে।

ছয়টা বাজিল, সঙ্গে সঙ্গে বিগল্ ধ্বনিয়া উঠিল। সমস্ত আলো নিভিয়া গেল। বিপুল শিবির আশঙ্কায় ও অন্ধকারে ভয়াল হইয়া উঠিল। একটু শব্দ পর্য্যন্ত হইবার হুকুম নাই। সকলেই আপন আপন তাম্বুতে নীরবে অন্ধকারে মৃত্যুবিভীষিকা দেখিতে লাগিল। কেবল রক্ষী সৈন্যগুলি কালো পোষাক পরিয়া অন্ধকারে এখানে ওখানে শিবির রক্ষায় নিযুক্ত রহিল। বিরাট বিস্তৃত মরু প্রান্তর—বাহিরে জনমানব নাই। সৈন্যগণ সশস্ত্র অবস্থায় শিবির মধ্যে আদেশের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া আছে। দেশ্‌লাই জ্বালিয়া একটি সিগারেট খাইবার হুকুম পর্য্যন্ত নাই।

মধ্যে মধ্যে হঠাৎ লুক্কায়িত শত্রুদিগের গুলি আসিয়া তাম্বুতে, প্রাচীরে ও লৌহস্তম্ভে ঠং ঠং করিয়া লাগিতেছে। আর কোনও শব্দ নাই। এ মরু মধ্যে ঝিল্লি নাই, নৈশ বিহঙ্গের ভীত চীৎকার নাই, বৃক্ষপত্রের শন শন শব্দ নাই। এমন শব্দহীন গাঢ় অন্ধকারে নিদারুণ শীতে প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর আশঙ্কায় প্রায় দশ সহস্র মানব-নন্দন জীবন্মৃত অবস্থায় বসিয়া আছে।

সেনাপতি সাহেব শিবির পরিদর্শনে বাহির হইয়াছেন। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তিনি ফিরিতেছেন—দেখিতেছেন যে সৈন্যগণ ঠিক প্রস্তুত হইয়া আছে কি না, রক্ষী পাহারা সব যথাযথ আছে কি না, শিবির মধ্যে কেহ কোনও সামরিক বিধান বহির্ভূত কার্য্যে লিপ্ত আছে কি না!

হঠাৎ গোকুলের শিবির দুয়ারে আসিতেই দেখিলেন একটু আলোকচ্ছটা তাহার দুয়ার-পর্দ্দার ফাঁক দিয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে। সাহেব দাঁড়াইলেন। কাণ পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলেন—ভিতরে কোনও শব্দ নাই। দুয়ারে মৃদু শব্দ করিবামাত্র গোকুল পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়াই দেখিল—O.C. (সেনাপতি সাহেব)!

গোকুলের বুকের রক্ত জমিয়া হিম বরফ হইয়া গেল। মাথা ঘুরিয়া উঠিল। হঠাৎ বাক্যনিঃসরণ হইল না।

সাহেব পর্দ্দা ঠেলিয়া তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটি মোমবাতী জ্বালাইয়া গোকুল পত্র লিখিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলেন,

—"কি করিতেছিলে?"

গোকুলের কণ্ঠ তালু বক্ষ পর্য্যন্ত শুখাইয়া পদতলস্থ মরু-বালুকার মত হইয়া উঠিয়াছিল। অতি কষ্টে উত্তর দিল—"আগামী কল্য প্রত্যূষে ভারতের ডাক যাইবে, তাই আমার দুঃখিনী মাকে একখানা পত্র দিতেছি। সারা দিন আমি ডিউটিতে ছিলাম, সময় পাই নাই। গত মেলেও আমার ডিউটি ছিল, পত্র দিতে পারি নাই। এবারেও যদি পত্র না দিই, তবে আমার মা হয় ত আশঙ্কায় মারাই যাইবেন। তাই—"

সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন—"আজকের হুকুম কি?"

গোকুল কাঁপিতে লাগিল। কহিল—"ছয়টার পর কোনও আলো জ্বলিবে না। আমার—"

সাহেব বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন—"এ হুকুমের অর্থ কি জান?"

গোকুলের মাথা ঘুরিতেছিল—কহিল—"অর্থ এই যে শত্রু ক্ষ না জানিতে পারে, কোথায় শিবির। জানিলে উড়োজাহাজে বোমা ফেলিয়া শিবির ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতে পারে।"

সাহেব বলিলেন—"ঠিক্ তাই। কত দিন তুমি এখানে আছ ?"

গোকুল উত্তর দিল—"তুই বৎসরের উপর।"

সাহেব বলিলেন—"আচ্ছা, চিঠি শেষ করিয়া ফেল, আমি দাঁড়াইতেছি।"

গোকুল কহিল—"শেষ হইয়াছে। কেবল ঠিকানাটা বাকী।"

সাহেব কহিলেন—"শীঘ্র লিখিয়া আমায় দাও।"

গোকুল কি বুঝিল জানে না. মন্ত্রচালিতের ন্যায় ঠিকানাটী লিখিয়া ত্রখানি হাতে করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল. সাহেব গোকুলের হাত হইতে খপ করিয়া পত্রখানি লইয়া বলিলেন—"দাও, আমি ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিব। এ চিঠিতে তো মাশুল লাগিবে না। আজ তোমার জন্য এই দশহাজার লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইত, তাহা বুঝিতে পারিতেছ কি ?"

গোকুল সাহেবের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাতর স্বরে বলিল "সাহেব, আমার অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইয়াছে, এইবারকার মত আমায় মার্জ্জনা কর।"

সাহেব বলিলেন—"বাতি নিভাও। দাঁড়াও, এইপত্রে বরং লিখিয়া দাও যে, এই তোমার শেষ পত্র এবং আগামী কল্য প্রাতে তোমায় (Court Martial) সামরিক বিচারে গুলি করা হইবে।"

গোকুল ফুৎকারে বাতি নিভাইয়াই অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। সাহেব চিঠিখানি লইয়াই বাহিরে গেলেন।

* * * *

ভোর পাঁচটায় বিগ্‌ল বাজিল। সমস্ত সৈন্যগণ নিমেষে আসিয়া ময়দানে সারি দিয়া দাঁড়াইল। সেনাপতি সাহেব গত রাত্রের গোকুলের কাণ্ড বুঝাইয়া দিলেন, সামরিক হুকুম অমান্যের শাস্তিও যে কি, তাহাও জানাইয়া দিলেন।

সৈন্যগণের মুখে একটা চাঞ্চল্য ফুটিয়া উঠিল।

প্রহরী-বেষ্টিত গোকুল তথায় নীত হইল। বিগ্‌ল বাজিল। এগারজন সৈনিক গুলিভরা বন্দুক হস্তে গোকুলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাঁশী বাজিল, যুগপৎ এগারটি বন্দুকের শব্দ হইল। যাহারা গুলি করিল এবং যাহারা দেখিবার জন্য আনীত হইয়াছিল—তাহারা কেহই দেখিল না, কি হইল! কেবল বন্দুকের শব্দ শুনিল মাত্র!

শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হুকুম "Ri [illegible] Quick march। (দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া, দ্রুত চলিয়া যাও।)

চন্দননগরের বাঙ্গালী সৈনিক

শ্রীহরিহর শেঠ

সুবর্ণপুরী ভারতে বৃটিশ অভ্যুদয়ের প্রথম সোপান এই চন্দননগর। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে অর্লেয়াঁ দুর্গের পাদমূলে এই ভূমিতেই ইংরাজের তথা বাঙ্গলার ভাগ্য নির্ণীত হইয়াছিল। আর কে জানে, ইংরাজি ১৯১৬ সালের ৬ই এপ্রেলের চিরস্মরণীয় শুভ দিনে কুড়ি জন বাঙ্গলার স্বেচ্ছা-সৈনিক সন্তান মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইয়া চন্দননগর হইতে ফ্রান্সে যাইয়া যে ব্রতের উদ্বোধন পূর্ব্বক ভার্দ্দুণের সমর-প্রাঙ্গণে বল পরীক্ষার পর জয়মাল্য লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহারা ভবিষ্য বাঙ্গালীর জন্য কোন্ সোণার পুরীর রুদ্ধ অর্গল খুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন! ইয়োরোপের মহাসাগর রূপ মহাসমরে জলবুদ্বুদ্‌সম এখানকার কয়জন বাঙ্গালী যুবকের যোগদানে ফরাসীদের কতটুকু বল বৃদ্ধি হইয়াছিল, জানি না। কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গলার ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে একটি মহিমময় পরিচ্ছেদের যোজনা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইয়োরোপে সমরানল প্রজ্জলিত হইবার পর বৎসর ৩০শে ডিসেম্বর ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সভাপতি প্রথম তাঁহাদের ফরাসী ভারতের অধিবাসীদের যুদ্ধাধিকার প্রদান করেন। তৎপরে ১৯১৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী

ফরাসী-ভারতের তৎকালীন গভর্ণর মসিয়ে মার্তিনো (M. A. Martineau) দ্বারা উহা এখানে প্রচারিত ও বিধিবদ্ধ হয়; এবং ৭ই ফেব্রুয়ারি সহরের বহু স্থানে সুদীর্ঘ বিজ্ঞাপন দ্বারা ফ্রান্সের সহায়তার জন্য যুদ্ধার্থী নাগরিকদিগকে আহ্বান করা হয়।

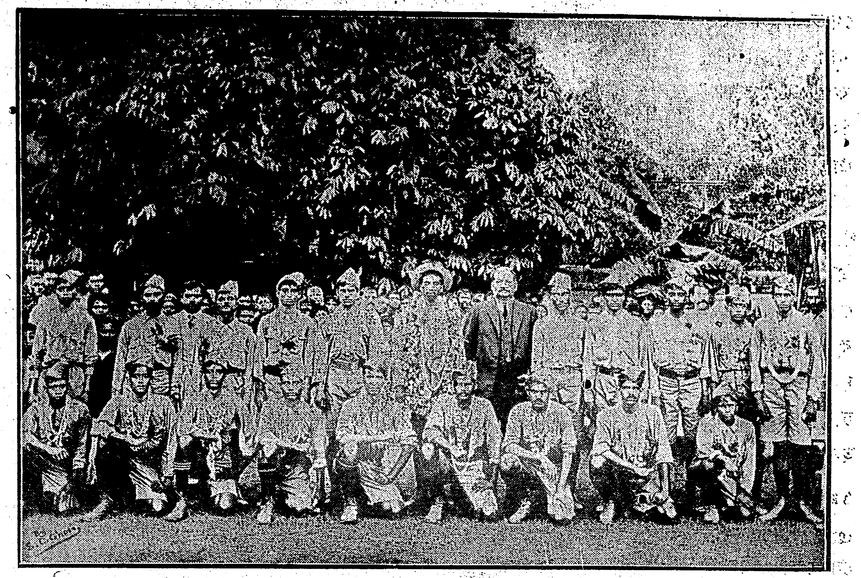

প্রথমে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫ জন যুবক

স্বেচ্ছা সৈনিক প্রথম দল—যাত্রার পূর্ব্বে

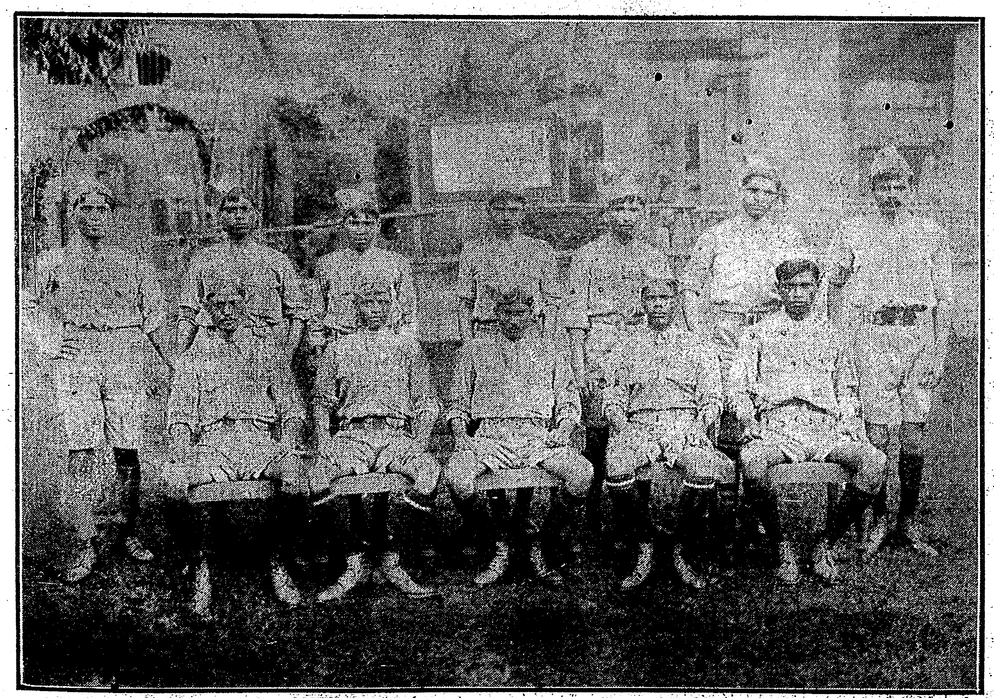

স্বেচ্ছা সৈনিক দ্বিতীয় দলের আবেদনকারিগণ

স্বেচ্ছা-সৈনিক হইবার জন্য আবেদন করেন। তন্মধ্যে ১২ জন আবেদন প্রত্যাহার করেন। ৪৩ জন ডাক্তারি পরীক্ষায় অনুপস্থিত এবং অনুত্তীর্ণ হন। শেষে অবশিষ্ট কুড়ি জন প্রথম দলভুক্ত হইয়া পণ্ডিচারীতে প্রেরিত হন। সেদিন ইং ১৯১৬ সালের ১৬ই এপ্রেলের অপরাহ্ণ। সে একটি স্মরণীয়

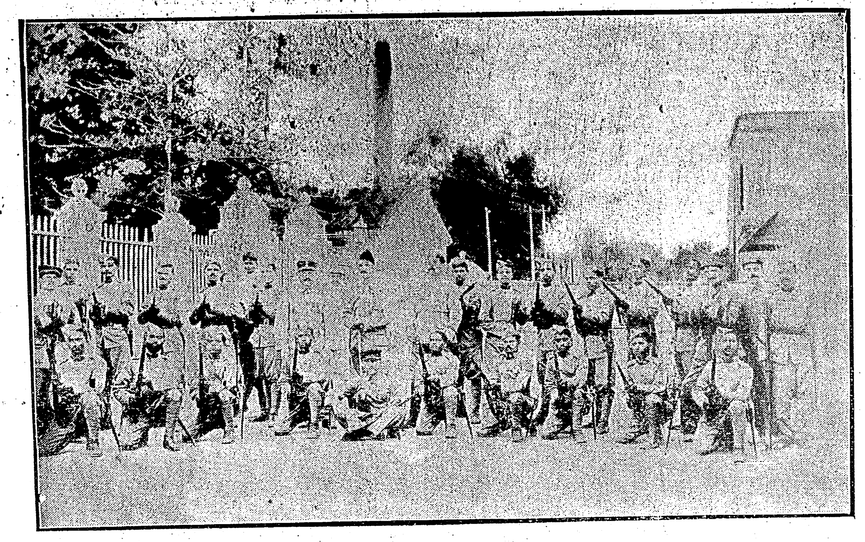

স্বেচ্ছা সৈনিক প্রথম দল পণ্ডিচারীতে

স্বর্গীয় মনোরঞ্জন দাস (ইনি বিজার (Bizerte) নগরে মারা যান)

দিন; চন্দননগরের পক্ষে ত বটেই, সারা বাঙ্গলার পক্ষেও তাহা চিরস্মরণীয়। সেই মাল্য-চন্দন-বিভূষিত, জনসাধারণের উল্লাস ও পুরমহিলাগণের শঙ্খধ্বনি-মুখরিত, বিপুল জনসংঘের পুরোভাগে বিংশতি সংখ্যক বাঙ্গালী যুবকের ফরাসী ত্রিবর্ণ পতাকা হস্তে ফ্রান্সের উদ্দেশে রেল ষ্টেশনে যাত্রা যিনি দেখিয়াছেন তিনি কখন ভুলিতে পারিবেন না। সে দিন সহরের চাঞ্চল্য ও উল্লাস এবং সহস্র সহস্র নরনারীদের দ্বারা সৈন্যগণের সংবর্দ্ধনা, এবং সহরের ও দূরাগত সম্ভ্রান্ত জনগণের বিপুল সমাবেশ বর্ণনার অতীত। এই দলে ছিলেন,—

ফণীন্দ্রনাথ বসু, তারাপদ গুপ্ত, রমাপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সরকার, বিপিনবিহারী ঘোষ, হারাধন বক্সী, সিদ্ধেশ্বর মল্লিক (ঘোষাল) করুণাময় মুখার্জ্জি, জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ, অমিতাভ ঘোষ, বলাইচন্দ্র নাথ, মনোরঞ্জন দাস, রাধাকিশোর সিংহ, সন্তোষচন্দ্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ রায়, অনীলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, আশুতোষ ঘোষ, পাঁচকড়ি দাস, ব্রহ্মমোহন দত্ত ও হাবুলচন্দ্র দাস।

প্রথম দল চলিয়া যাইবার দুই মাস পরে যতীন্দ্রনাথ দে, সতীশচন্দ্র শেঠ, অজয়প্রসাদ বসু, কানাইলাল ভট্টাচার্য্য, অনিলচন্দ্র চাটার্জ্জি, ললিতমোহন দে,

পরেশনাথ চাটার্জ্জি ও গোবর্দ্ধনচন্দ্র দাস নামক আর আট জন যুবক যাত্রা করেন। এই উভয় দল পণ্ডিচারী

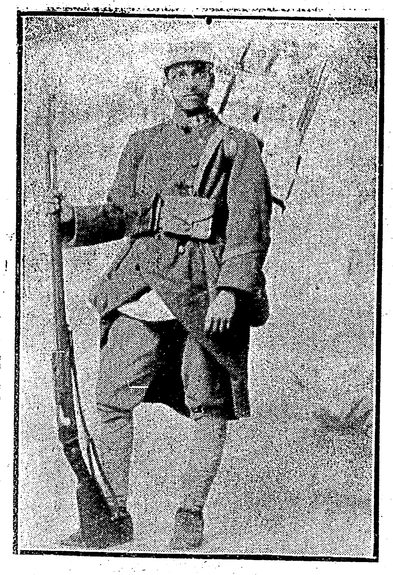

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক

শ্রীযুক্ত হারাধন বক্সী

পৌঁছিবার পর তথায় সকলের পুনরায় ডাক্তারি পরীক্ষা হয়। ইহাতে অনুত্তীর্ণ হওয়ায় আশুতোষ ঘোষ ও পাঁচকড়ি দত্ত বর্জ্জিত হন। বাকি ২৬ জন ঐ মাসের শেষেই ফ্রান্সে যাত্রা করেন। এই সকল যুবকই ভদ্রবংশীয়। তাঁহাদের বয়স ১৬ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে। ইহাদের মধ্যে বলাইচন্দ্র নাথ ও গোবর্দ্ধন দাস অন্য সকলের অপেক্ষা ছোট। বলাইয়ের বয়স তখন ১১ বৎসর মাত্র। নরেন্দ্রনাথ সরকারের বয়স সকলের অপেক্ষা অধিক ছিল।

পণ্ডিচারীতে যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ

শ্রীযুক্ত অমিতাভ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ

করিবার পর তাঁহারা ফ্রান্সে প্রেরিত হন। তথায় কিছু দিবস ফরাসী সামরিক বিদ্যালয়ে সমর কৌশল শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহারা একেবারে রণক্ষেত্রে প্রেরিত হন। এই সময় তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়, এবং তুল, বিজার্ত, ট্রিপলিটন্, আরগন্, এলসেস্ ভার্দ্দুণ, সেণ্ট্ মিহিয়েল্ প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হন। ইঁহাদের মধ্যে অনেককে গোলন্দাজের কার্য্যেও নিযুক্ত

করা হইয়াছিল। তাঁহাদের কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ফরাসীদের বিখ্যাত ৭৫ মিলিমিটার কামান পরিচালনা করিয়া জার্ম্মাণ ব্যূহভেদ কার্য্যের দায়িত্ব-ভার পর্য্যন্ত ইঁহাদের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পণ্ডিচারী হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের সকল স্থানে সর্ব্ব ক্ষেত্রেই সাহসিকতা, উদ্যম ও ত্যাগ-শীলতা দেখাইয়া বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত তারাপদ গুপ্ত

পণ্ডিচারীতে শিক্ষাকালে লেফ্‌টনাণ্ট জিলে মহোদয় ইঁহাদিগকে সকল সেনাদলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাদল বলিয়াছিলেন। ফ্রান্সে ইঁহাদের যে সুখ্যাতি লাভ হইয়াছিল, তাহা তৎকালীন সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

এই বাঙ্গালী বীরগণের যুদ্ধক্ষেত্রে সর্ব্ব বিষয়ে পার-দর্শিতা ও নির্ভীকতার কথা ভাবিলে বাঙ্গালী হৃদয়ে যে আত্মপ্রসাদ জন্মে, তাহা কেবল অনুভবযোগ্য—তাহার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তাঁহারা চন্দননগরের তথা সমগ্র বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। যাঁহারা আপন হৃদয়ের রক্তে জাতির কলঙ্ক-কালিমা বিধৌত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাছে বাঙ্গালী জাতির ঋণ শোধ হইবার নহে। বাঙ্গালী তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ

বীর যুবকদিগের কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ সকলকেই 'Victory, 'Interallie' ও 'Volunteer' নামক তিনটি করিয়া পদক দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন দত্ত

শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র নাথ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ক্রশ দে স্যার্ (Croix de Geurre) নামক বিশেষ পদক দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক ও শ্রীযুক্ত হারাধন বক্সী উভয়ে যথাক্রমে সমর বিদ্যালয়ের উচ্চ ও নিম্ন গ্রেডের পরীক্ষায় এবং অফিসারস্ প্লাটুন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই প্রথম শ্রেণীর

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার

প্রস্তাব হইয়াছিল, কেবল স্থান ও রেজিমেণ্ট বদল হওয়ার জন্য তাহা হয় নাই। তাঁহারা যে সকল সৈন্য দলভুক্ত হইয়া কাজ করিয়াছিলেন তাহার নাম,—

11 em Regiment d' Infenterie colonial
25 em Compain
7 em Groupe d' artillerie a Bizerte 8 em.
10 em Regiment d' artillerie Toulon
6 em Regiment d' artillerie 6em. Batterie
9 em. Regiment d' Infenterie colonial Dap-Co. Hue' (Annam) Indo-chine.
4 em Infenterie colonial.
154 em artillerie a pied.
6 em artillerie d Afrique.
6 em artillerie a pied.

শ্রীযুক্ত কানাইলাল ভট্টাচার্য্য

তাঁহারা মোট প্রায় তিন বৎসর ফ্রান্সে ছিলেন। মাঝে একবার মাত্র দেশে আসিবার অনুমতি পাইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। শেষে আরমিষ্টিসের পর একেবারে ফিরিয়া আইসেন। দ্বিতীয় বার কয়েকজনকে এখান হইতে ইণ্ডোচীনে পাঠান হইয়াছিল। সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, করুণাময় মুখার্জ্জি এবং হাবুলচন্দ্র সরকার যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত বরাবরই ফ্রান্সে ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, যুবকগণ ফিরিয়া আসিলে, যখন তাঁহাদের দেশবাসী তাঁহাদিগকে অতি আদরে, অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে লইয়া আসিলেন, তখন দলের মধ্যে যুবক মনোরঞ্জনকে তাঁহারা আর ফিরিয়া পাইলেন না। মনোরঞ্জন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া বিজারে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই স্থানেই তাঁহার দেহাবশেষ ফরাসী সৈনিকদের পার্শ্বে গোর দেওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দে

ভলেণ্টিয়ারদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সহায়তার জন্য এডমিনিষ্ট্রেটরের সভাপতিত্বে যে ভলেণ্টিয়ার কমিটি গঠিত

তুলঁ (Toulon) হইতে ভাহুঁন যাত্রার পূর্ব্বে

একটি ৭৫ c. m. কামান লইয়া পরীক্ষা হইতেছে (মধ্যে জ্যোতিষ)

হইয়াছিল, তাহার তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে মনোরঞ্জনের নামে তুপ্লে কলেজে, যেখানে মনোরঞ্জন বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইখানে একটি দেওয়ালে একখানি প্রস্তর-ফলক রাখা হইয়াছে। এবং প্রতি বৎসর উক্ত বিদ্যালয়ের দুইটি যোগ্য ছাত্রকে একটা মাসিক বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কার্য্যের ব্যবস্থা ও ছাত্র-দিগকে বৃত্তি দিবার জন্য স্থানীয় নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরের ট্রাষ্টীদিগের হস্তে টাকা দিয়া তাঁহাদের উপর ভারার্পিত হইয়াছে। উল্লিখিত কমিটির ভাণ্ডারে চন্দননগর ভিন্ন বাহিরের কতিপয় ভদ্রলোকও সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের উদ্যোগ ও প্রাথমিক চেষ্টায় এই কমিটি গঠিত হয়। স্বর্গীয় তিনকড়িনাথ বসু মহাশয়ও ইহার পুষ্টি সাধনে, বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এই স্বেচ্ছা-সৈনিক সংগ্রহ, দল গঠন ও প্রেরণ এবং বিদায় অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা ব্যাপারে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের চেষ্টা সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, হারাধন বক্সী ও নরেন্দ্রনাথ সরকারের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি এ কার্য্যে অগ্রসর হন। প্রথম ও শেষোক্ত যুবকই স্বেচ্ছা-

বাঙ্গালী ও ফরাসী সৈনিকেরা একত্র বিশ্রাম করিতেছেন

বাঙ্গালী ও ফরাসী সৈনিকেরা একত্র বিশ্রাম করিতেছেন

সৈনিক হইবার জন্য প্রথম আবেদন করিয়াছিলেন। উক্ত ব্যাপারে স্বর্গীয় তিনকড়িনাথ বসু, মনীন্দ্রনাথ নায়েক, রূপলাল নন্দী, হরিহর শেঠ প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

প্রথম ভলেণ্টিয়ারবৃন্দের বিদায় উপলক্ষে মাননীয় এড্‌মিনিষ্ট্রেটর মসিয়ে ভ্যাঁসা ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয় যে উদ্দীপনাপূর্ণ সময়োপযোগী সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের এখনও মনে আছে। সৈনিকদিগের বিদায় ও সম্বর্দ্ধনা ব্যাপারে বাহিরের যে সকল বিখ্যাতনামা নেতা ও সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্যার (এক্ষণে

লর্ড) শ্রীযুক্ত এস্, পি, সিংহ, শ্রীযুক্ত বি, চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার শ্রীযুক্ত এস্, কে, মল্লিক, স্বর্গীয় পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত জে, চৌধুরী, রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী, কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত বি, কে, লাহিড়ী প্রভৃতিও ছিলেন। প্রথম দল ছুটিতে আসিলে, দ্বিতীয় বার তাঁহাদের বিদায় দিবার কালে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক বিদায়-সম্বর্দ্ধনা-সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন দেশে এমন সংবাদপত্র কমই ছিল বা ছিল না, যাহাতে এই সকল

সৈনিকদিগের মধ্যাহ্ন-ভোজন

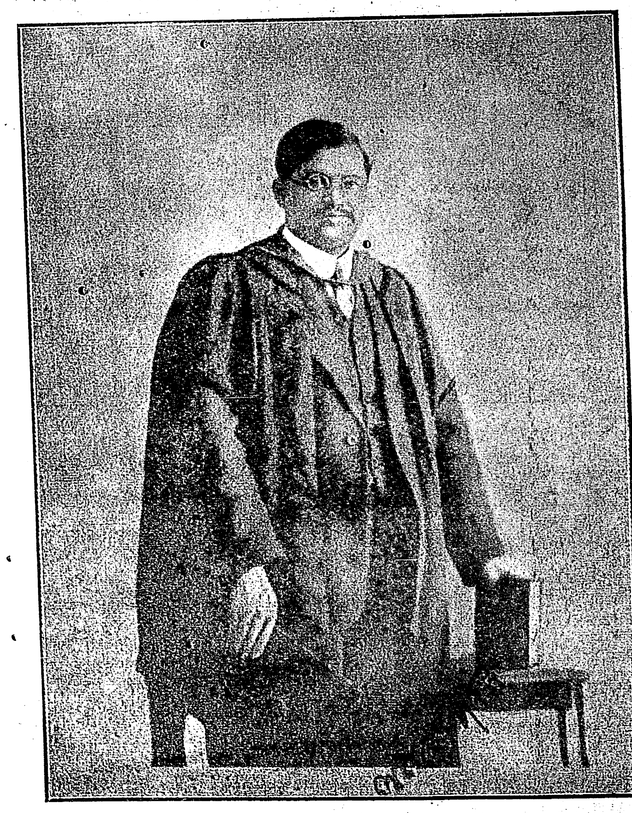

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটের বেশে স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সেন

পথ-প্রদর্শক বীর যুবকদের সাহস ও বীরত্বের কাহিনী না ঘোষিত হইয়াছিল। *

বিশেষ সংক্ষেপেই এখানকার প্রথম পথ-প্রদর্শক বাঙ্গালী স্বেচ্ছা-সৈনিকদিগের কথা বলা হইল। কিন্তু আর একটি বাঙ্গালী বীরের কথা না বলিলে এ গৌরব-কথা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। ইঁহার বিষয় শেষে ব্যক্ত হইলেও সাহসিকতা, শৌর্য্য, কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতিতে ইনি কোন অংশে কম নহেন, বরং অধিক বলিতে পারা যায়। কারণ, যখন ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পক্ষ হইতে যুদ্ধে যাইবার জন্য কোন ডাক আইসে নাই, যখন বাঙ্গালীর ছেলে যুদ্ধে যাইতে পারে, এ কথা কাহারও কল্পনায়ও আইসে নাই, ইনি তখন একাকী স্বেচ্ছায় নীরবে সৈন্যদলে যোগদান করেন। এই

* এই স্বেচ্ছা-সৈনিকদিগের কথা লিখিতে ভলেণ্টিয়ার শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিকের নিকট হইতে অনেক সহায়তা পাইয়াছি। সে জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। —লেখক।

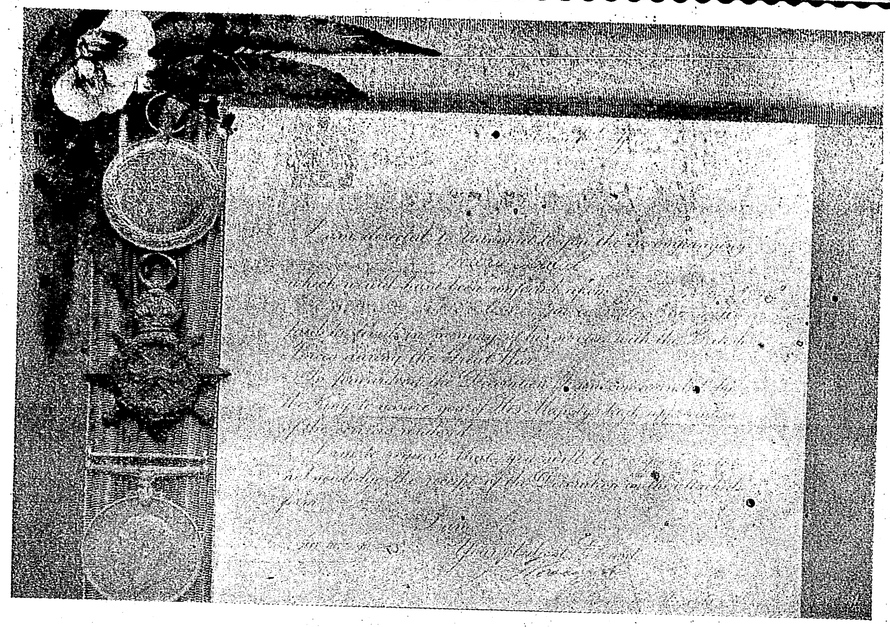

যোগীন্দ্রনাথের মেডেল

সৈন্যিক অবস্থায় স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সেন
(ইনিই প্রথম বাঙ্গালী, যিনি গত মহাযুদ্ধে হত হন।)

বীর যুবকের নাম যোগীন্দ্রনাথ সেন। ইনি শিবপুর কলেজে পড়িতে পড়িতে, উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বিলাত যান। তথায় লিড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর শিক্ষার পর বি-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এঞ্জিনিয়ার হন। তৎপরে তথায় পূর্ত্ত বিভাগে সহকারী এঞ্জিনীয়ারের পদে একটি কার্য্য গ্রহণ করেন।

এই কাজ করিতে করিতে যখন মহাসমর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন যোগীন্দ্রনাথ সমর-বিভাগে অফিসারের কার্য্যের জন্য আবেদন করেন। ভারতবাসী বলিয়া প্রথম সে আবেদন অগ্রাহ্য হয়। তৎপরে তিনি যখন বুঝিলেন, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হওয়া সহজ নয়, তখন আর কাল-বিলম্ব না করিয়া সামান্য সৈনিকের পদপ্রার্থী হইয়া পুনরায় আবেদন করেন। এই আবেদন মঞ্জুর হইল; তিনি পলস্ ব্যাটেলিয়ন্ (Pals' battalion) নামক সৈন্যদলে স্থান পাইলেন। এই ব্যাটেলিয়ন্ পরে ওয়েষ্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেণ্টের (West Yorkshire Regiment) অঙ্গীভূত হইয়া যায়। এই স্থানে নয় মাস কাল শিক্ষার পর কিছু দিনের জন্য তিনি মিশরে প্রেরিত হন, এবং তৎপরে তথা হইতে তাঁহাকে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়।

এই স্থানে তাঁহাকে প্রকৃত যুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে হয়। যোগীন্দ্রনাথ সৈনিকের যে পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার নাম প্রাইভেট্। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা এবং ন্যায়পরায়ণতার জন্য, তথাকার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তিনি বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিনটি পদক পুরস্কার দিয়াছিলেন। তাঁহার গৌরবে দেশবাসীর গৌরব বাড়িয়াছে; কিন্তু সে গৌরব বুকে ধরিয়া তিনি আর স্বদেশে ফিরিতে পারিলেন না। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২২ শে মে রাত্রে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে বীর যোগীন্দ্রনাথ ফ্রান্সের সমরক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর অস্ত্রে প্রাণ বলি দিলেন। মৃত্যুর পর তথায় ইনি

আহারের পর সংবাদ-পত্র পাঠ

সামরিক সম্মান পাইয়াছিলেন। ফ্ল্যাণ্ডারসের এলবার্ট নগরে এই বাঙ্গালী যুবকের নাম ও রেজিমেণ্টের নাম লিখিত ক্রুশ্ চিহ্নিত একটি সামান্য কবরে এই বাঙ্গালী যুবকের দেহাবশেষ প্রোথিত আছে।

যোগীন্দ্রনাথের যুদ্ধে যাইবার জন্য নাম লিখানর সংবাদ পাইয়া যখন তাঁহার বৃদ্ধ পিতার পক্ষ হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে নিবৃত্ত হইবার জন্য পত্র লেখেন, তখন তিনি অগ্রজকে লিখিয়াছিলেন,—"আমি ফিরিয়া গিয়া বাঙ্গালীর মুখে চুণ কালি দিতে পারিব না।" এই যুবকের মৃত্যুতে সম্রাটের সহানুভূতি প্রকাশের কথা, লর্ড্ কিচনার তদীয় অগ্রজ ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে জানাইয়াছেন। তাঁহার ব্যবহৃত ঘড়ি চশমা প্রভৃতি দ্রব্যাদি যত্ন সহকারে পাঠাইয়া দিয়াছেন। যোগীন্দ্রনাথের বহু গুণ-কীর্ত্তনসহ তাঁহার রেজিমেণ্টের অফিসার ও তাঁহার অধ্যাপকগণের কতিপয় পত্রও যতীন বাবু পাইয়াছিলেন।

যতদূর জানা গিয়াছে, ইনিই বিগত মহাযুদ্ধে হত বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম। এত বড় যুদ্ধে প্রথম বাঙ্গালী সন্তান যিনি বুকের রক্তে ইয়োরোপের রণাঙ্গন রঞ্জিত করিয়াছেন, তিনি চন্দননগরের অধিবাসী। চন্দননগরের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আমরা এখনও তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টিত হই নাই। তাঁহার একখানি সামান্য ভাবের প্রতিকৃতি মাত্র স্থানীয় নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত আছি।

আর সেই গৌরবের আধার বীর যুবকের প্রাণহীন নশ্বর দেহাবশেষ আত্মীয়-বন্ধুহীন দেশের জনশূন্য প্রান্তরের মৃত্তিকাতলে পড়িয়া কালের প্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। একজন সাধারণ সৈনিকের প্রাপ্য যাহা কিছু সম্মান তাহা দিতে ইংরাজরাজ একটুও কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। আর তাঁহার দেশবাসী আমরা এই নয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার যোগ্য স্মৃতি-রক্ষাকল্পে, তাঁহার মৃৎসমাধি পাকা করিবার জন্য বা সহরের কোন প্রকাশ্য স্থানে তাঁহার একটি প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপন, অথবা একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য কিছুই করিলাম না। কোন মহাপুরুষের স্মৃতির পূজা করিলে তৃপ্তি আমাদের, মুখোজ্জ্বলও আমাদেরই। নচেৎ মহাপুরুষদের কি আসিয়া যায়। চন্দননগরের স্বেচ্ছা-সৈনিকগণের উক্ত স্মৃতিমন্দিরে দুইখানি প্রতিকৃতি রক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু এ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। যে যুবকদের কার্য্যে বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষালিত হইয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল হইয়াছে বলিয়া তৎকালে বহু সংবাদপত্র ও নেতৃবর্গ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যদি তাঁহাদের যোগ্য সম্মান প্রদর্শন বা স্মৃতি রক্ষায় আমরা পরাঙ্মুখ হই, তবে আমাদের গর্ব্ব বৃথা, আমরা মনুষ্যত্ববর্জ্জিত।

কালোর আলো

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ

১

গরীব কেরাণীর সংসারটা অচল হয়ে উঠ্‌ত অনেক সময়ে। ছোট্ট বাড়ীখানি ঘিরে অর্থের অভাব একটা দারুণ অশান্তি নিয়ে এই কেরাণী পরিবারের শান্তিটা হরণ করে ফেল্‌তে চাইত। চালের অভাব, তেলের অভাব, পরিবারের সাড়ীর অভাব, খুকীর জামা-কাপড়ের অভাব, এমনি একটা না একটা অভাব গরীব তপনের মনটাকে অস্থির করে তুল্‌ত দিনের পর দিন। ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে সন্ধ্যার সময় খোলা ছাতটুকুতে শুয়ে-শুয়ে সে তার ক্লান্ত, দীর্ঘ জীবনের ইতিহাসটা আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে দেখ্‌ত। একটা বিফলতার দৈন্য সে ইতিহাসটার পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে।

তার চোখ দুটো জলে ভরে চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করে উঠ্‌ত। তার জন্মানটাই বৃথা হয়ে গিয়েছে। উচ্চ শিক্ষিত সে উচ্চ বংশের ছেলে; আজ একটা দীন কেরাণী হয়ে তার মূল্যবান জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। কত আশা, কত সুখের কল্পনা তার নবীন জীবনে উল্লাসের সঞ্চার করত; ভবিষ্যৎ সাফল্যের উজ্জ্বল চিত্র তার হৃদয় মন সঞ্জীবিত করত। কিন্তু কার্য্য-ক্ষেত্রে সে সকলই মরীচিকার মত অন্তর্হিত হ'ল। সামান্য কেরাণীগিরিই তার সম্বল হ'ল।

এই নিত্য অভাবের সংসারটায় শুধু একটুখানি হাসিভরা শান্তি আন্‌ত ললিতা। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে এই মেয়েটী তার গরীব সংসারে যতটা সাধ্য স্বাচ্ছন্দ্য আন্‌বার চেষ্টা কর্‌ত। ছেঁড়া জামায় তালি দিয়ে, ময়লা কাপড় সাবান দিয়ে কেচে পরিষ্কার করে' সমস্ত যায়গায় সে একটী লক্ষ্মীর হাতের ছাপ লাগিয়ে রাখ্‌ত। সারা দিন কঠিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় ললিতার সাহচর্য্যটুকু তপনের সমস্ত গ্লানিতে, সমস্ত ব্যথায় নিপুণ হাতের প্রলেপ লাগিয়ে দিত। তার কেরাণী-জীবনের দুঃসহ ক্লেশ এই লক্ষ্মী স্বরূপিনীর কোমল স্পর্শ যেন শীতল করে দিত। ক্ষণেকের জন্য সে তার দারিদ্র্য-দুঃখ ভুলে যেত।

গৃহে এই শান্তিটুকু না থাক্‌লে, এই মৃত-সঞ্জীবনী সুধা না থাক্‌লে তপন বোধ হয় এত দিনে পাগল হয়ে উঠ্‌ত.....

২

ন'টার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তপন তখন আফিসে যাবার জন্য তৈরী হয়ে উঠেছে; ললিতা পান দুটো দিতে দিতে বল্‌লে,—"পার ত খুকীর জন্যে কিছু বিস্কুট কিনে এনো, ওবেলা। জ্বরটা নেই, ক্ষিদে ক্ষিদে কর্‌ছে—"

—"হবে খ'ন"—বলে তপন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। দরিদ্র কেরাণীর মেয়ের আবার বিস্কুট কেনরে বাপু! টপ্ টপ্ করে দু' ফোঁটা অশ্রুজল ছেঁড়া সার্টটার উপর ঝরে পড়্‌ল। আহা, রুগ্ন মেয়েটা সামান্য দুইখানি বিস্কুট চায়! কত সঙ্কোচেই তার মা সে কথাগুলো জানিয়ে দিলে! কিন্তু, তার যে অতি কষ্টে দিন-অন্নের সংস্থান হয়। মেয়েটার রুগ্ন মুখের দিকে চেয়ে তপনের বুক ফেটে যেতে লাগল। হায় হতভাগিনি, পৃথিবীতে এত স্থান থাকতে এই হতভাগ্যের গৃহে কেন এসেছিস্ মা!

পায়ের জুতোটার তলা উঠে যাচ্ছে; যাক্, ওটা ওমাসে সারালেই চল্‌বে। ছাতার কাপড়টাও দেখ্‌ছি এমাসে বদ্‌লান হয় না। সব পড়ে থাক্; যেমন করে হোক খুকীর বিস্কুটটা কিন্তু কিন্‌তেই হবে আজ!...

একটা মোটর ভ্যাঁক্ ভ্যাঁক্ শব্দ করে তার ধোয়া কাপড়খানায় একরাশ কাদা ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেল। সেটার দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি ফেলে, একটা ছোট্ট নিশ্বাস চেপে রেখে তপন একেবারে ফুটপাথের একপাশ দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। রাস্তার একটা পেশাদার ভিখারী তার দিকে চেয়ে বল্‌লে,—"রাজাবাবু, একটা পয়সা।" কথাটা তার প্রাণে একটা ব্যঙ্গের মত ব্যথা দিলে। সমস্ত জগৎটাই তার পেছনে লেগেছে তার বিফল জীবনটাকে উপহাস করবার জন্য।

৩

সূর্য্য একেবারে ডুবে গিয়েছিল। ঘর্ম্মাক্ত তপন তাড়াতাড়ি করে বাড়ী ফিরছে। রুগ্ন মেয়েটা বিস্কুটের

জন্য পথ চেয়ে বসে আছে যে! সোনা-দানা নয়, হীরে মাণিক নয়—সামান্য দুখানি বিস্কুট! হায় হতভাগ্য জনক!

গলির মোড় ফিরতেই তপন দেখ্‌লে, তার বাড়ীর পাশের তেতলা বাড়ীটার সামনে একটা যুড়ী দাঁড়িয়ে। কদিনই এ বাড়ীতে জিনিসপত্র আস্‌ছিল—আজ বুঝি গৃহস্বামী এলেন। ঠিক তার দরিদ্র বাড়ীটার গায়েই ধনীর বিলাস লীলা চল্‌বে, এইটে ভেবেই তার মনটা যেন বিরক্ত ও সঙ্কুচিত হয়ে উঠ্‌ছিল।

তাড়াতাড়ি পাশ কাটাতেই কে একজন ডাক্‌লে,—"আরে কেও, তপন না কি?"

তপন ফিরে দেখ্‌লে, একটী মোটাসোটা ভদ্রলোক, খুব মিহি চুড়িদার পাঞ্জাবী গায়ে, পাশের কয়েকজনকে কি যেন উপদেশ দিচ্ছেন। তপন ভাল করে চেয়ে দেখ্‌লে, তারই বাল্যবন্ধু যোগেশ। স্কুলে একসঙ্গে পড়ত; বার-কয়েক মাট্রিকুলেশন ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল।

তারই হঠাৎ এত ঐশ্বর্য্য দেখে তপন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে,—"কি খবর যোগেশ, হঠাৎ রাতারাতি বড়লোক হয়ে পড়্‌লি যে?"

একটু হেসে যোগেশ বল্লে,—"আর ভাই, এক অগাধ গয়সাওয়ালা বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে কপাল ফিরে গেছে। এই বাড়ীখানা পেয়েছি। এত দিন ভাড়াটে ছিল, তাই আসা হয়নি। তুমি পাশেই থাক না কি? বেশ বেশ, পড়শী হওয়া গেল। ভাবছ কি দাদা? বরাৎ, বরাৎ, সবই বরাতে করে—" বলে লোকটি একেবারে উচ্চহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল।

—"হ্যাঁ, তা ত ঠিকই"—বলে তপন একরকম ছুটেই বাড়ীর ভিতর গিয়ে পড়্‌ল।

ললিতা জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ গা, বিস্কুট এনেছ?"

তীব্র কর্কশকণ্ঠে তপন বলে উঠ্‌ল,—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এমন অদৃষ্ট করে এসেছিলাম যে একটা পয়সা পেলুম না শ্বশুরের। আর কত লোক শ্বশুরের বিষয় পেয়ে বরাৎ ফিরিয়ে ফেল্‌ছে।"—বলে সে বিস্কুটের বাক্সটা ললিতার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

কথাগুলো ললিতাকে বড্ড জোরেই বাজল। তার দরিদ্র পিতামাতার কথা মনে পড়ল: কি করবেন তাঁরা—তাঁদের যে কিছু নেই! রুগ্ন মেয়েটাকে বুকে চেপে ধরে সে স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার রান্নাঘরটায় নীরবে বসে রইল। রুদ্ধ অশ্রু চোখ ফেটে বেরিয়ে আস্‌তে চেয়েছিল কি না কে জানে?

৪

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তপনের আজ আর কিছুই ভাল লাগছিল না। ছেঁড়া মাদুরটা পেতে সে ছাতে শুয়ে রইল। পাশের বাড়ীতে সব ঘরগুলো বিজলীর আলোতে ঝলসে যাচ্ছে। তার মনে যোগেশের উৎফুল্ল কণ্ঠটা থেকে থেকে জেগে উঠ্‌ছিল—"বরাৎ, দাদা, বরাৎ।"

পাশের বাড়ীতে যোগেশের হাঁক-ডাকটা কমে এসেছিল। তপন ভাব্‌ছিল, কি সুখী ও। যদি সে আজ একটা ওর মত ধনীর মেয়ে বিয়ে করত! জীবনটা তার নতুন করে তেতো হয়ে উঠ্‌ল।

পাশের বাড়ীর উপরের ঘর থেকে একটী নারী-কণ্ঠ তখন তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করে বল্‌ছে আর কাকে উদ্দেশ করে—"যাও, আমি ওসব কিছু দেখ্‌তে পারব না বলে দিচ্ছি। যাও, সব গুছিয়ে রাখগে। একটা গরীবের মেয়ে বিয়ে করতে পারনি, সে তাহলে তোমার দাসীর কাজ কর্‌ত। আমি তোমার দাসীগিরি করতে আসিনি। আমি কিছু করতে পারব না।".....

ললিতা এসে ডাক্‌ল,—"ওগো, খাবে এস, ভাত দিয়েছি।" একটা স্নিগ্ধ আনন্দে তপনের মনটা তখন ভরে গিয়েছিল। তার মনে হোলো কার ঐশ্বর্য্য দেখে সে হিংসায় পুড়ে মরছিল। যোগেশের চাইতে সে শতগুণে অধিক সুখী—তার গৃহে যে ললিতা একাধারে তার গৃহলক্ষ্মী, তার অঙ্কলক্ষ্মী, তার প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী! চাই না ধনীর ঐশ্বর্য্য;—আমার ললিতা! সে আবেগভরে ললিতার হাত দুটী চেপে ধরে বল্‌লে, "লতা! রাগ কোরো না। না বুঝে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি। আমার শ্বশুর আমাকে যে ধন দিয়েছেন, কুবেরের ভাণ্ডারেও তা নেই।" বলে ললিতাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে।

ললিতার দুফোঁটা চোখের জল আনন্দ হয়ে ঝরে পড়্‌ল তপনের হাতের উপর।

জীবের উৎপত্তি

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, ভাষাতত্ত্বরত্ন, এম-এ

আমাদের পাঁচটী ইন্দ্রিয় আছে। ইহাদের দ্বারাই আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতিই সকল জ্ঞানের আধার। কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা বস্তু সকলের যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান জন্মে না। কোনো বস্তুকে আমরা দেখি; এই দর্শনক্রিয়া চক্ষুর সাহায্যে হয়। যদি চক্ষু না থাকিত, তাহা হইলে ঐ বস্তুর সত্তার জ্ঞান জন্মিত না। দেখিবার কারণ, বস্তু; এবং দেখা, কার্য্য। আমরা কার্য্যের উপলব্ধি করি; কিন্তু বস্তু, যেটী কারণ, তাহার যথার্থ জ্ঞান আমাদের জন্মে না। সেটী অজ্ঞাত। এই উক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে না যে বস্তুর, অর্থাৎ কারণের, যথার্থ সত্তা নাই। বস্তুর যথার্থ সত্তা কি? বস্তুর যথার্থতার জ্ঞানও এক প্রকারের অনুভূতি। সে বস্তুর জ্ঞান অনুভূতিতে স্থায়ী হয়, তাহাই যথার্থ। সন্ধ্যাকালের অস্পষ্ট আলোকে আপনি কোন পরিচিত লোককে কোন স্থানে দেখিলেন। কিন্তু আপনার সন্দেহ হইল, তিনিই কি না। অতএব আপনি তাঁহাকে আর একবার দেখিলেন। এবারও তিনি বলিয়া বোধ হইল। আবার সন্দেহ হইল। তৃতীয়বার দেখিয়া নিশ্চয় হইল যে, তিনিই। বারম্বার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবার পর সকল অবস্থাতেই যাহার স্থিতি আছে তাহাই যথার্থ বা বাস্তব।

চিন্তা সম্বন্ধ-মূলক। সাদৃশ্য ও ভিন্নতার জ্ঞান হইতে সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মে। দুই প্রকারের সম্বন্ধ পাওয়া যায়। সূর্য্যোদয়ের পর মধ্যাহ্ন আসে, পরে সূর্য্যাস্ত হয়। ইহাতে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা হওয়া, অর্থাৎ পারম্পর্য্য পাওয়া যায়। পারম্পর্য্য এক প্রকারের সম্বন্ধ। ইহাকে কালিক সম্বন্ধ বলে। আর এক প্রকারের সম্বন্ধ আছে, যাহাতে বস্তু সকলের একত্র থাকার সম্বন্ধ পাওয়া যায়। ইহা স্থানমূলক সম্বন্ধ। ইহাকে দৈশিক সম্বন্ধ বলে।

দ্রব্য কি? দ্রব্যে স্থানের লক্ষণ পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত রোধকতাও পাওয়া যায়। রোধকতাই দ্রব্যের বিশেষ লক্ষণ। আপনি হাত বাড়াইতে বাড়াইতে দেওয়াল পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন। আপনি আর অধিক দূর যাইতে পারিবেন না, কারণ দেওয়ালে আপনার রোধ হইবে। ইহাই দেওয়ালের রোধকতা। দ্রব্যের রোধকতা ছাড়িয়া

সজীব দেহে যৌগিক পুনর্বিন্যাস হয়। জীব দুই প্রকারের—উদ্‌ভিদ্ ও প্রাণী। ইহাদের মুখ্য উপাদান—কার্ব্বন, হাই ড্রাজেন, অক্‌সিজেন, নাইট্রোজেন ও গন্ধক। কিন্তু কোনো কোনো জীবে অতি অল্প পরিমাণে ফস্‌ফরাস্, ক্লোরীন্, পোটেসিয়ম্, সোডিয়ম্ ক্যাল্‌সিয়ম্ ও ম্যাগনীসিয়ম্ পাওয়া যায়। কার্ব্বন, হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেনের যোগে শ্বেতসার, চিনি, সেলিউলোস্ ইত্যাদি কার্ব্বো-হাইড্রেটের অণু নির্ম্মিত হয়। কার্ব্বন ও হাইড্রোজেনের যোগে তেল, ঘি, চর্ব্বি ইত্যাদি স্নেহময় পদার্থের অণু নির্ম্মিত হয়। এবং কার্ব্বন, হাইড্রোজেন, অক্‌সিজেন ও নাইট্রোজেনের যোগে ডাল, মাংস ইত্যাদি প্রোটীনের অণু নির্ম্মিত হয়। প্রোটীন প্রাণীদিগের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

উপরি লিখিত মূল পদার্থগুলির পরমাণুসমূহের অসংখ্য প্রকারের সংযোগ হইতে জীব-দেহের অণু নির্ম্মিত হয়। সজীব দেহের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে সর্ব্বদা মুখ্য এবং গৌণ উভয় পুনর্বিন্যাসই হইতে থাকে। এই সকল পুনর্বিন্যাস হইতে তাহাদের দ্রব্যের এবং গতির পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবর্ত্তনকে মেটাবলিজ্‌ম্ বলে। প্রত্যেক প্রাণী কার্ব্বন-ডাইঅক্‌সাইড্ এবং শরীরের মল বাহির করিয়া দেয়। এঞ্জিনের খাদ্য কয়লা। কয়লা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। এই অগ্নির উত্তাপ দ্বারা জল হইতে বাষ্প উৎপন্ন হয়, এবং এই বাষ্পের গতি হইতে এঞ্জিনে গতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সজীব দেহে খাদ্য হইতে শক্তি উৎপন্ন হওয়া ব্যতীত দেহের পোষণোপযোগী পদার্থও উৎপন্ন হয়। এইজন্য খাদ্য ও শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজন হয়। খাদ্যে প্রধানতঃ স্নেহ পদার্থ, কার্ব্বো-হাইড্রেট ও প্রোটীন থাকে। খাদ্য যৌগিক পদার্থ। তাহাদের নির্ম্মাণের সময় উহাদের উপাদানে গতি সঞ্চিত হইয়াছিল। যখন খাদ্য জীবদেহে শরীরের পোষণোপযোগী সরল সংযুক্ত পদার্থ সমূহে বিশ্লিষ্ট হয়, তখন উহার সঞ্চিত গতি বা শক্তি হইতে কতকটা শরীরের নির্ম্মাণের নিমিত্ত আবশ্যক হয়, কতকটা তাপের আকারে উন্মুক্ত হয় এবং কতকটা জীব-দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গতি উৎপাদন করিবার জন্য সঞ্চিত হয়। প্রাণীদিগের খাদ্য হয় উদ্‌ভিদ্, না হয় অন্য প্রাণী, না হয় উদ্‌ভিজ্জ বা প্রাণিজ। মাংসভোজী প্রাণীর আহার উদ্‌ভিজ্জভোজী প্রাণী। সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত শক্তির সহায়তায় উদ্‌ভিদের খাদ্য সংগৃহীত হয়। এই গতি বা শক্তি উদ্‌ভিদে সঞ্চিত হইয়া যায়। অতএব পৃথিবীতে যত জীব আছে, তাহারা এক প্রকারে সূর্য্যের সন্তান। "সূর্য্য আত্মা জগত স্তস্থুষশ্চ"। জীব-দেহে দ্রব্য ও গতির কেবল আকারের পরিবর্ত্তন হয়, নূতন দ্রব্য বা গতির সৃষ্টি হয় না। জীব-দেহে সর্ব্বদা দ্রব্য এবং গতির যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহাকে মেটাবলিজ্‌ম্ বলে। মেটাবলিজ্‌ম্ না হইলে জীবন সম্ভব নয়, এবং জীবন না থাকিলেও মেটাবলিজ্‌ম্ হইতে পারে না। যে মেটাবলিজ্‌ম্ দ্বারা দেহে উচ্চ শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ নির্ম্মিত হইয়া গতি বা শক্তি সঞ্চিত হয় তাহাকে এনাবলিজম্ বলে, এবং যাহা দ্বারা উচ্চশ্রেণীর যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া সরল যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং শরীরের মলে পরিণত হইয়া তাপ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাকে কেটাবলিজম্ বলে। অতএব জীব-দেহে দুই প্রকারের যৌগিক পদার্থ থাকে। এক শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ শেষে উচ্চশ্রেণীর পদার্থ হইয়া শরীরে বল-সঞ্চয় করে, এবং অপর প্রকারের যৌগিক পদার্থ শেষে দেহের অনিষ্টকারী পদার্থে পরিণত হয়, যাহা হইতে বল পাওয়া যায় না।

যে পদার্থে এই উভয় প্রবাহের মিশ্রণ থাকে এবং সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, তাহা প্রোটোপ্লাজম্ বা প্রোটোপ্লাজমের সমূহ।

প্রোটোপ্লাজম্ আকারে বর্ণহীন অর্দ্ধতরল পদার্থ। অণুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে ইহা এক প্রকারের ঘন পদার্থ দ্বারা বেষ্টিত তরল পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। ইহাই সকল জীব-দেহের আধার এবং ইহাই সকল চঞ্চলতার কেন্দ্র। জীবনাভাবে প্রোটোপ্লাজম্ থাকিতে পারে না, এবং প্রোটাপ্লাজমের অভাবে জীবন থাকিতে পারে না।

প্রোটোপ্লাজম্ কোষের আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। কোষগুলি খুব ছোট, এবং প্রত্যেক কোষমধ্যস্থ দ্রব্যের একটী করিয়া কেন্দ্র (nucleus) থাকে। কোনো কোনো জীব একটী কোষ দ্বারা এবং কোনো কোনো জীব একাধিক কোষ দ্বারা নির্ম্মিত। বড় বড় বৃক্ষে এবং জীবে প্রোটোপ্লাজমের অসংখ্য কোষ থাকে। মেটাবলিজমের ক্রিয়া প্রোটোপ্লাজমের মধ্যেই হইয়া থাকে। এই ক্রিয়া দ্বারা

মুক্তির ডাক

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র

B. H. P. Works.

যখন কোষের অধিক বৃদ্ধি হয়, তখন তাহা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। কোষের কেন্দ্রও দুই খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং অংশের মধ্যস্থলে একটী পর্দ্দা পড়িয়া যায়। এই পর্দ্দা কোষের দেওয়ালের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়, এবং তখন একটীর স্থলে দুইটী কোষ হইয়া যায়। প্রত্যেক নূতন কোষেও পুরাতন কোষের ন্যায় প্রোটোপ্লাজমের কেন্দ্র ও অন্যান্য দ্রব্য বর্ত্তমান থাকে। এই প্রকারে জীব-শরীরের বৃদ্ধি হয়।

উদ্‌ভিদ্ নির্জীব বস্তু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করিতে পারে। উহা বায়ু এবং মাটী হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু প্রাণিগণের এ শক্তি নাই। ইহাকে সজীব পদার্থ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয়। প্রাণীদের দেহের নিমিত্ত প্রোটীনের প্রয়োজন। খাদ্যে প্রোটীন না থাকিলে প্রাণিগণের প্রোটোপ্লাজম্ নূতন প্রোটোপ্লাজম্ উৎপন্ন করিতে পারে না। কার্ব্বো-হাইড্রেট ও স্নেহময় পদার্থ হইতে কেবল কার্য্যকরী শক্তি সঞ্চিত হয়, দেহ বলবান্ হয় না।

সজীব পদার্থের তিনটী বিশেষ লক্ষণ—(১) উত্তেজনা দ্বারা চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়া, (২) বৃদ্ধি হওয়া, এবং (৩) উৎপাদনের শক্তি থাকা। মেটাবলিজমই এই তিনের কারণ। যদি এনাবলিজমের ক্রিয়া কেটাবলিজমের ক্রিয়া অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে প্রোটোপ্লাজমের বৃদ্ধি হয়, শরীরের পুষ্টি হয় এবং উৎপাদনের শক্তি থাকে। যদি কেটাবলিজমের ক্রিয়া এনাবলিজমের ক্রিয়া অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ক্ষয় হয় এবং শেষে মৃত্যু হয়। মেটাবলিজমের নিমিত্ত যথেষ্ট খাদ্য, জল, উন্মুক্ত অক্সিজেন এবং উপযুক্ত উত্তাপ আবশ্যক। ক্ষয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য দ্রব্যকে দ্রব করিবার জন্য জলের আবশ্যকতা। খাদ্যকে দগ্ধ করিবার জন্য উন্মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন। মেটাবলিজমের জন্য সীমাবদ্ধ উত্তাপও, অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অধিকও নয় কমও নয় এরূপ উত্তাপ, আবশ্যক। মেটাবলিজম্ ক্রিয়ার জন্য কতকগুলি বিশেষ প্রকারের প্রোটীন আবশ্যক, যাহাদের সাহায্যে রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে পারে। ইহারা বীজস্বরূপ এবং ইহাদের পরিবর্ত্তন হয় না। অতএব জীবন এমন একটী অবিশ্রান্ত ধারা, যাহাতে উচ্চ শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ নির্ম্মিত হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে, যাহার সঞ্চিত শক্তি হইতে নির্জীব দ্রব্য সজীবে পরিণত হইতেছে, এবং পুনরায় নির্জীব হইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে প্রোটোপ্লাজমের ক্রিয়ার নিমিত্ত শক্তি রাখিয়া যাইতেছে।

প্রোটোপ্লাজমের দ্রব্যে সদা পরিবর্ত্তন হয়। অতএব ইহা অস্থায়ী অবস্থায় থাকে। সেইজন্য সামান্য উত্তেজনাতেই ইহার দ্রব্য চঞ্চল হইয়া পড়ে। উত্তেজনা বাহির হইতেও আসিতে পারে এবং ভিতর হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে। উত্তেজনা হইতে নূতন নূতন পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। উত্তেজনা হইতেই নিকটস্থ দ্রব্যের সহিত প্রোটোপ্লাজমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, এ যুগে আমরা যে সকল জীব দেখিতে পাই, তাহারা কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে? ইহার পশ্চাতে একটী দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এখানকার জীবে এবং প্রাথমিক যুগের জীবে অনেক প্রভেদ। প্রোটোপ্লাজমের ক্রমিক বিবর্ত্তনে জীব-জগৎ আধুনিক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রথমের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। জীবগণের উপাদান এবং পরিবর্ত্তনের ধারার পর্য্যবেক্ষণ করিলে এরূপ অনুমান হয় যে, সুদূর অতীতে যখন পৃথিবীর অবস্থা সুবিধা-জনক ছিল, এবং এখনকার অবস্থা হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন ছিল, তখন সজীব প্রোটোপ্লাজমের উৎপত্তি হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সে অবস্থা আর ফিরিয়া আসিবে না। সে সময়ে তাপ, চাপ, আর্দ্রতা এবং অন্যান্য অবস্থা এরূপ ছিল যে, আপনা হইতেই নানা প্রকারের উচ্চশ্রেণীর যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব ছিল। যে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি অস্থায়ী ছিল,—যেমনি যেমনি উৎপন্ন হইতেছিল তেমনি তেমনি বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছিল। কতকগুলি ভাঙ্গিতেছিল, আবার গড়িতেছিল। এই অবস্থায় কতকগুলি স্থায়ী হইয়া গেল। যখন একবার স্থায়ী হইয়া গেল, তখন উহাদের মধ্যে যাহাদের টিঁকিয়া থাকিবার শক্তি অধিক ছিল, তাহারা চিরকালের জন্য স্থায়ী হইয়া গেল। নিকটের সরল যৌগিক পদার্থ হইতে তাহাদের পোষণ হইতে লাগিল। ইহারাই প্রোটোপ্লাজমে পরিণত হইল। অতএব সম্ভব যে সর্ব্বাগ্রে

সমুদ্রে জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল, কারণ প্রোটোপ্লাজমে যে যে উপাদান যে যে অনুপাতে পাওয়া যায়, সমুদ্র জলে সেই সেই উপাদান সেই সেই অনুপাতে বিদ্যমান। ইহার পর প্রোটোপ্লাজম কোষের আকার ধারণ করিল।

পূর্ব্বে যে বিবরণ দেওয়া হইল, তাহাতে এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের মতের অনুসরণ করা হইয়াছে। অন্য শ্রেণীর বিদ্বানেরা বলেন যে "না সতো বিদ্যতে ভাবঃ।" তাঁহারা বলেন অজীব হইতে সজীব উৎপন্ন হইতে পারে না। জীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয়। জীব অনন্ত কাল হইতে বিদ্যমান। এখনকার জীবগণ পূর্ব্বের জীবগণের বিবর্ত্তনের ফল।

মনের প্রতিঘাত ও কর্ম্মফল

ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার

হিন্দুশাস্ত্রে কর্ম্মফল মানিয়া লওয়া হয়। হিন্দু-শাস্ত্রকারদের মতে, যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সে এ-জন্মেই হউক বা পর-জন্মেই হউক, তাহার ফলভোগ করিবে। মনের ক্রিয়াও নিগূঢ় ভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সময়ে সংসারে যে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ঘটিয়া থাকে, তাহা অনেকটা স্বখাত সলিলে ডুবে মরার মত অবস্থা। পূর্ব্বকৃত অন্যায় কার্য্য অনেক সময়ে পরবর্ত্তী কার্য্যে এমন এক ভঙ্গী দেয়, যাহা পূর্ব্বকৃত অন্যায় কার্য্যের শাস্তি যেন অনেক স্থলে অনিবার্য্য ভাবে আনয়ন করে। সুবিখ্যাত দার্শনিক লেখক এমার্সন তাঁহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা এ-বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—

"মানবাত্মার মধ্যে এমন ন্যায়-বিচারের বীজ নিহিত আছে, যাহার ফল সদ্য-সদ্য এবং অমোঘ ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে কোনও সৎকাজ করে, সে সেই কার্য্যের দ্বারাই মহত্ব প্রাপ্ত হয়। কেহ কোনও নীচ কাজ করিলে, সেই কার্য্যের দ্বারাই সে হীন ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। যে অপবিত্রতা পরিহার করে, পবিত্র ভাব তাহাকে স্বতঃই অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে। অন্তরের সাধুতা হইতেই ঈশ্বরের তুল্যতা লাভ হয়। পরমাত্মার ভিতর যে ন্যায়-বিচারের বীজ নিহিত আছে, তাহা হইতেই সে পরমেশ্বরের বিহিত নিরাপদতা, অমরত্ব ও মহিমার অধিকারী। শঠ ব্যক্তি নিজেকেই প্রতারিত করিয়া থাকে এবং ক্রমশঃ সে নিজের সত্তার সহিতও অপরিচিত হইয়া উঠে। চরিত্র কখনও অজ্ঞাত থাকে না। চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা কেহ ধনী হইতে পারে না, ভিক্ষাদানের দ্বারা কেহ দরিদ্র হয় না। হত্যাকাণ্ড অতি সংগোপনে সংসাধিত হইলেও তাহা প্রস্তরের প্রাচীর ভেদ করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিবে।"

মনস্তত্ত্বের ঘটনা কথায় বর্ণনা করা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলে অনেক সময় বিশদ ভাবে বুঝা যায়। পূর্ব্বের দুই একটি প্রবন্ধে যেরূপ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা হইয়াছে, এই প্রবন্ধেও সেই প্রথা অবলম্বন করা যাইবে; অর্থাৎ প্রথমে বিদেশী পুস্তক হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া—তৎপরে নিজের অভিজ্ঞতা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়াস পাইব। ডাক্তার ফ্রয়েডের (Freud) Psychopathology of Every-day life হইতে দুইটি গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

(১) ঘোড়ার গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া এক যুবতী স্ত্রীলোকের জানুর নীচে পা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং ইহার ফলে তাহাকে কয়েক সপ্তাহ শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু উল্লেখ-যোগ্য কথা এই যে, ইহাতে সেই স্ত্রীলোকটি কোনও রূপ যন্ত্রণা প্রকাশ করে নাই—সে তাহার দুর্ভাগ্য ধীর ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল।

এই দুর্ঘটনার পর হইতে তাহার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য-জনিত গুরুতর পীড়া হয়। অবশেষে মানসিক চিকিৎসায় সে আরোগ্য লাভ করে। চিকিৎসার সময় ঐ দুর্ঘটনাকে ঘিরিয়া যে সমুদায় ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি আবিষ্কার করি; এবং ইহার পূর্ব্বে এই রমণীর অন্তরে কিরূপ ভাবে রেখাপাত হইয়াছিল, তাহাও অনুধাবন করিবার চেষ্টা করি। এই স্ত্রীলোকটি তাহার ঈর্ষা-পরায়ণ স্বামীর সহিত তাহার এক বিবাহিতা ভগিনীর গৃহে অপরাপর ভ্রাতা-ভগিনী

ও তাহাদের পত্নী ও স্বামীর সহিত কিছু দিন যাপন করে। এক দিন রাত্রে এই ঘনিষ্ট আত্মীয়দের সমক্ষে সে তাহার নৃত্যকলা প্রদর্শন করে। তাহার সুনিপুণ 'Cancan' নামক নৃত্য দেখিয়া আত্মীয়-স্বজনগণ প্রীত হইল বটে, কিন্তু তাহার স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে পত্নীকে চুপি-চুপি কহিল,—"আবার তুমি গণিকার ন্যায় আচরণ করিতেছ।" এ কথার ফলও ফলিল। সে রাত্রে যুবতীটি নিদ্রাতেও সুস্থির হইতে পারিল না। পর দিন বৈকালে সে অশ্বযানে বেড়াইতে বাহির হইবে মনস্থ করিল। সে নিজেই পছন্দ করিয়া গাড়ীর ঘোড়া ঠিক করিয়া দিল। তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী, তাহার শিশু ও শিশুর ধাত্রীকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলে, সে গুরুতর ভাবে তাহার অসম্মতি জানাইল। গাড়ীতেও তাহার মানসিক চাঞ্চল্য দেখা গেল। সে শকট-চালককে বলিল,—ঘোড়া ক্রমশঃই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে; এবং ঘোড়া দুইটি সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ একটু অসংযমের ভাব দেখাইতেই, সে ভীত হইয়া গাড়ী হইতে লাফ দিয়া পড়িল, এবং ইহার ফলে তাহার পা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু গাড়ীর ভিতরে যাহারা ছিল, তাহাদের কিছুই হইল না। এই ঘটনার বিবরণগুলি জানিবার পর ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় যে, এই দুর্ঘটনাটি প্রকৃত-পক্ষে স্বকৃত; এবং অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি-গ্রহণের ধরণটি দেখিয়াও বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। কারণ, ইহার পর অনেক দিন তাহার পক্ষে 'Cancan' নৃত্য করা অসম্ভব হইয়াছিল।

(২) কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এক কন্যার যথাসময়ে বিবাহ হয় এবং যথাক্রমে তিনটি পুত্র-কন্যা জন্মে। এই যুবতী স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য-জনিত পীড়ায় অল্প-অল্প ভুগিতেছিল, কিন্তু সে ইহার জন্য কোনও চিকিৎসাদি করায় নাই—কেন না, ইহাতে তাহার জীবন-যাত্রায় বিশেষ কিছু ব্যাঘাত ঘটিত না। এক দিন এই স্ত্রীলোকটি এক অসংস্কৃত রাস্তার উপর হোঁচট খাইয়া পড়ে, এবং পাশের বাড়ীর দেওয়ালে ধাক্কা খাইয়া তাহার মুখে আঘাত লাগে। তাহার মুখখানি ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, এবং চোখের পাতা নীলবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে। চোখের দৃষ্টির যদি কোনও ব্যাঘাত ঘটে, এই ভয়ে সে ডাক্তার ডাকে এবং আমি চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হই।

স্ত্রীলোকটি প্রকৃতিস্থ হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি—"কেন আপনি এই ভাবে পড়িয়া গেলেন?"

স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল—এই দুর্ঘটনার কিছু পূর্ব্বে সে তাহার স্বামীকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, যেন সে সতর্ক হইয়া রাস্তা চলে; কেন না, তাহার স্বামী তখন পায়ের গাঁটের বেদনায় ভুগিতেছিল। সে ইহাও বলিল, প্রায়ই সে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে, যে বিষয়ে সে অপরকে সাবধান করিয়া দেয়, ঠিক তাহাই তাহার নিজের পক্ষেই প্রায় ঘটিয়া থাকে।

আমি তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহা ছাড়া তাহার আর কিছু বলিবার আছে কি না।

এই স্ত্রীলোকটি বলিল—এই দুর্ঘটনার ঠিক পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে সে একটি দোকানে একখানি সুন্দর চিত্র দেখিতে পায়। ইহা দ্বারা তাহার শিশু-সন্তানের ঘর সাজাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ ছবিখানি কিনিবার তাহার ইচ্ছা হয়। সে তখন রাস্তার দিকে লক্ষ্য না করিয়া সেই দোকানটির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং এক পাথরের স্তূপে হোঁচট খাইয়া দেওয়ালের উপর পড়িয়া তাহার মুখে আঘাত প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে হাত দিয়া আত্মরক্ষা করিবার একটুও চেষ্টা করে নাই। আঘাত প্রাপ্ত হইয়াই তাহার ছবি কিনিবার ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ দূর হয় এবং সে বাড়ী ফিরিয়া আসে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন আপনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন না?"

সে উত্তর করিল—"বোধ হয় ইহা সেই ঘটনার শাস্তি, যাহা আমি আপনার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম।"

"সে ঘটনার কথা কি এখনও আপনাকে ক্লেশ দেয়?"

"হ্যাঁ। পরে আমি ইহার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হই, এবং নিজেকে অপরাধী ও দুর্নীতি-পরায়ণ বলিয়া মনে করি।"

এই রমণী যে ঘটনার কথা আমার নিকট উল্লেখ করে, তাহা তাহার গর্ভপাতের বিষয়। ইহা তাহার স্বামীর অনুমতি অনুসারেই করা হয়। কারণ, তাহারা দুইজনেই, আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য আর যাহাতে সন্তান না জন্মিতে পারে, সেই ইচ্ছা করিয়া, এরূপ পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল।

স্ত্রীলোকটি বলিল,—"আমি প্রায়ই নিজেকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতাম যে, তুই নিজের সন্তানকে হত্যা করিয়াছিস্। আমার সর্ব্বদা এই ভয় হইত যে, এমন গুরুতর পাপের শাস্তিও আমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। আপনি বলিতেছেন আমার চোখে কোনও গুরুতর আঘাত লাগে নাই। এখন আমি এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি যে, আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তিই আমার লাভ হইয়াছে।"

এই দুর্ঘটনা এক পক্ষে তাহার পাপের প্রতিফল স্বরূপ হইতে পারে; এবং অপর পক্ষে যে গুরুতর শাস্তির প্রত্যাশায় এই রমণী ভীত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা দ্বারা সে তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া গেল, এরূপও হইতে পারে। যে মুহূর্ত্তে সে ছবি কিনিবার জন্য দোকানের দিকে দৌড়িয়া গিয়াছিল, তখন তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের স্মৃতি তাহার মনের ভিতর উদিত হইয়া হয় ত এই কথাই বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল—"তোমার নিজের শিশুর ঘর সাজাইবার জন্য উদ্গ্রীব হইতে লজ্জা করে না? তুমি না নিজের সন্তানকে হত্যা করিয়াছ? তুমি হত্যাকারী—তোমার পাপের শাস্তির আর দেরী নাই।" এই চিন্তা অবশ্য তাহার জ্ঞাতসারে উদিত হয় নাই; এবং এই জন্যই সে পতনের সময় হাত দিয়া আত্মরক্ষা করিবারও চেষ্টা করে নাই।

এইবার যে দেশী ঘটনাগুলির উল্লেখ করিতেছি, তাহা কয়েকজন ডাক্তারের সম্বন্ধে।

(৩) মফস্বলের কোনও সহরে এক ডাক্তার থাকিতেন। তাঁহার স্ত্রী অতি সুন্দরী, শান্তস্বভাবা ও সুশীলা ছিলেন। কিন্তু ডাক্তারটির চরিত্র কলুষিত ছিল। তিনি প্রায়ই রাত্রে বাড়ী থাকিতেন না; অসৎসঙ্গে রাত্রি যাপন করিতেন। এক দিন তাঁহার পত্নী মনের দুঃখে Strychnia (কুঁচিলা বিষ) সেবন করিলেন। যখন সেই বিষের লক্ষণ প্রকাশ পাইল—তখন সেই ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার ডাক্তারের স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে লইয়া আসিতে বেশ্যাপল্লীতে ছুটিল। কিন্তু, ডাক্তার তখন বোধ হয় সহজ অবস্থায় ছিলেন না। অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও তিনি সে রাত্রে বাড়ী ফিরিলেন না। ফলে তাঁহার স্ত্রীর সেই রাত্রেই মৃত্যু হইল। ডাক্তার বাবুর ইহার পরও কোনও মানসিক বিকার বা চরিত্র সংশোধিত হইতে দেখা গেল না। যাহা হউক, কিছু দিন পরে তিনি পুনরায় বিবাহ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী প্রথমা স্ত্রীর ন্যায় সুন্দরী ও শান্তস্বভাবা ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ও তেজ ছিল। কারণ, তাঁহার আমলে ডাক্তার বাবুর রাত্রে বহির্বাসের অভ্যাস ত্যাগ করিতে হয়। এরূপও শোনা যায় যে, প্রয়োজন বোধ করিলে এই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ডাক্তার বাবুকে দুই এক ঘা প্রহার দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

এই উপলক্ষে প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইয়াছে, তাহার একটি কথা মনে পড়িতেছে। বঙ্গ-সাহিত্য আলোচনা করিলে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যকলাবিদ্ ভিন্ন অপর সাহিত্যিকগণের পুস্তকে প্রেমের এক রকম আলোচনাই দেখিতে পাওয়া যায়। নারীজাতি অতিশয় নম্র, পতিভক্তি-পরায়ণা—তাঁহাদের পতিসেবার আদর্শই অনেক স্থলে এই যে, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত কামুক পতিরও মনোরঞ্জনার্থ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বেশ্যালয়ে লইয়া যাইতে দ্বিধা করিলে চলিবে না। স্বামী দেবতাকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতে হইবে; এমন কি, ঈশ্বরাপেক্ষাও অধিক মান্য করিতে হইবে। তাহার সমস্ত লাঞ্ছনা, অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিতে হইবে। মোট কথা এই যে, নারীজাতির অন্যায় সহ্য করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট থাকিবে; অথচ অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা নীতি-বিরুদ্ধ বিবেচিত হইবে।

কিন্তু বাস্তবতন্ত্রী বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন যে, সংসারে প্রেমের আর একটি বিভিন্ন প্রকার আছে। স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে এইরূপ বশ্যতার ভাব প্রকাশে অনেক পুরুষের প্রেমের সম্বর্দ্ধনা হয় না। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'মৃণালিনীতে' গিরিজায়া ও দিগ্বিজয়ের প্রেম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, দিগ্বিজয় যে দিন গিরিজায়ার নিকট সম্মার্জ্জনীর আঘাত প্রাপ্ত হইত না, সে দিন তাহার মনে হইত, বোধ হয় গিরিজায়ার ভালবাসা লোপ পাইতেছে। এই আলেখ্যের মধ্যে বাস্তবিক সত্যের চিত্র আছে। অনেক পুরুষেরই স্বভাব এইরূপ যে, ভক্তি, মিনতি, স্তব-স্তুতি অপেক্ষা সম্মার্জ্জনার প্রহার বা তাহার প্রতীক কিছু তাহাদের অন্তরে শান্তি বা তৃপ্তি প্রদান করে, এবং ইহাতেই

তাহাদের যথার্থ প্রেমের বিকাশ হয়। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত অভিজ্ঞতা হইতে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এক ধনী বিধবা এক পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার এক মাত্র পুত্রের বিবাহ দেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রের মতিগতি অন্য দিকে যাইতেছে দেখিয়া, সেই বিধবাটি শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া তাঁহার পুত্রবধূকে নৃত্যগীতবাদ্যাদি অতি সুন্দর রূপে শিক্ষা দেন। তাহার পর পুত্রকে বলেন যে, বধূমাতাই যখন গীত, বাদ্য, নৃত্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছে, তখন আমোদ-প্রমোদের জন্য তাহার আর বাহিরে যাইবার প্রয়োজন কি? তাহাতে তাঁহার গুণধর পুত্রটি উত্তর করিল—তাহার স্ত্রী নৃত্যগীতাদিতে সুশিক্ষিতা হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি সে যে জাতীয় স্ত্রীলোকদের সহিত মেশে, তাহাদের মত বাপ-মা তুলিয়া অকথ্য গালিগালাজ করিতে তো আর পারিবে না। শ্বাশুড়ীটি যদি পুত্রবধূকে শিক্ষিতা করিবার বৃথা প্রয়াস না করিয়া, স্বামীকে শায়েস্তা করিবার জন্য সম্মার্জ্জনীর ব্যবহার শিক্ষা দিতেন—তাহা হইলে বোধ করি তাঁহার পুত্রের চৈতন্যোদয় হইলেও হইতে পারিত।

ফ্রান্স দেশে অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকেরা এক প্রকার রবারের চাবুক রাখে—প্রয়োজন মত তাহারা এই চাবুক ব্যবহার করে, এবং ইহার ফলে তাহাদের অনেক প্রণয়ীর তাহাদের প্রতি আকর্ষণও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

নীতি এবং ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও, অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া বা অন্যায় সহ্য করা যে যথার্থ পতিভক্তির নিদর্শন হইতে পারে—তাহা ভগবানের ন্যায়ধর্ম্মসঙ্গত বিধান বলিয়া মনে করা যায় না। এই ন্যায়ধর্ম্মের আদর্শ আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রচলনের অভাবই স্ত্রীলোকদের আত্মহত্যার বাহুল্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে যে কেরোশিনে কাপড় ভিজাইয়া পুড়িয়া মরা স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রচলিত হইতেছে—ইহার সহিত পূর্ব্বকালের সতীদাহের ভাব-সঙ্গতি (Association) আছে এইরূপ মনে হয়। কিন্তু পূর্ব্বকালের সতীরা যে পতির চিতায় আত্মদান করিতেন, এবং রাজপুত রমণীরা অগ্নিতে যেরূপ সতীত্বরক্ষার্থ আত্মাহুতি দিতেন, তাহাতে এক মহৎ আদর্শের প্রেরণা থাকিত। কিন্তু এখনকার আত্মহত্যা অধিকাংশ স্থলে পতি বা সংসারের উপর ক্রোধ বশতঃ ঘটিয়া থাকে। পতিভক্তির এই আদর্শের বিচার—যাহার জন্য স্ত্রীলোকেরা আজকাল আত্মহত্যাজনিত পাপ গ্রহণ করে—তাহার জন্য যে শাস্ত্রকার ও সাহিত্যিকগণ দায়ী নহেন, এ কথা অনেক স্থলেই বলা যায় না। যদি স্ত্রীলোকেরা আত্মহত্যা না করিয়া অন্য কোনও উপায়ে অন্যায় কার্য্যের প্রতিশোধ গ্রহণ বা ঘৃণাজনিত মনের ঝাল মিটাইতে পারিতেন—তাহা হইলে সমাজের, নিজেদের ও দুর্ভাগা পতিদের পক্ষেও মঙ্গলের কারণ হইত। আমরা উপরে যে ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছি, তাহাতে দুইটি বিভিন্ন প্রকার স্ত্রীলোকের স্বভাব তাহাদের পতির চরিত্রে কিরূপ পার্থক্য উৎপন্ন করে, তাহা বুঝা যায়।

যাহা হউক, দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার পর এই ডাক্তার বাবুর মতিগতির অনেকটা পরিবর্ত্তন হওয়ায়, তিনি ভদ্রলোকের মত বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্রকন্যাদিও হইল। ক্রমশঃ তিনি প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে অশান্তির ভাব উদিত হইত। তিনি বলিতেন, Strychnia ঔষধের স্বম্বন্ধে তাঁহার ভয়ের মাত্রা বেশী হয়। একাকী ঘরে শুইয়া থাকিতে তাঁহার অস্বস্তি বোধ হইত। এক দিন দেখা গেল, তিনি Strychnia খাইয়া মরিয়াছেন। যাহারা তাঁহার পূর্ব্ব-ইতিহাস জানিত, তাহারা ইহার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ কিছু বুঝিতে পারিল; কিন্তু সাধারণ লোক বুঝিল, ডাক্তার বাবুর মাথা খারাপ হওয়াতে, ভুল করিয়া ঘুমের ঔষধের পরিবর্ত্তে Strychnia খাইয়া মারা গিয়াছেন।

কাউণ্ট টলষ্টয়, মেরি করেলি প্রভৃতি বিলাতের ঔপন্যাসিকদের গল্পেও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। কাউণ্ট টলষ্টয়ের একটি গল্পে আছে—একজন যুবক রেলগাড়িতে আসিবার সময় সেই রেলগাড়িতে একটি লোককে কাটা পড়িয়া মারা যাইতে দেখিতে পায়। যুবকটি তাহার দয়া-পরবশতা অন্য এক বিবাহিতা যুবতীকে দেখাইবার জন্য ঐ মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করে। তাহার কপট মহাপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া সেই যুবতী এই যুবকের সহিত পরিচিত হয়। অবশেষে তাহাদের পরিচয় অবৈধ প্রণয়ে পর্য্যবসিত হইলে, যুবকটি যুবতীকে তাহার স্বামীর নিকট হইতে ভুলাইয়া লইয়া যায়। ইহার পর কোনও এক

দিন এই যুবতীটি তাহার প্রণয়ী যুবককে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে ষ্টেশনে আসিয়া—যে ট্রেণে সেই যুবকটী আসিতেছিল, সেই ট্রেণেই ইচ্ছা করিয়া কাটা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

মেরি করেলির একটি গল্পে আছে যে, এক দরিদ্রা বালিকা এক রাজাকে ভালবাসিত; কিন্তু প্রত্যাখ্যাতা হইয়া সে জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করে। পরিণামে দেখা যায়, ঐ রাজাও যে স্ত্রীলোকের সহিত শেষকালে যথার্থ প্রণয়ে পড়িয়াছিলেন, তাহার মৃতদেহ লইয়া ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেলেন—আর তাঁহার কোন সন্ধান মিলিল না।

(৪) কোনও ষ্টেশনে এক ডাক্তার থাকিতেন। সেই ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টারের পুত্রের এক জটিল দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ হয়। ডাক্তার বাবু এই ছেলেটিকে প্রত্যহ দেখিতেন। ডাক্তার বাবুর সহিত ষ্টেশনমাষ্টারের এই বন্দোবস্ত হয় যে, দরিদ্র বলিয়া তিনি প্রত্যহ ডাক্তার বাবুকে ভিজিটের টাকা দিতে পারিবেন না, তবে পুত্র আরোগ্য লাভ করিলে একবারে যাহা হয় কিছু দিবেন। ডাক্তার বাবুও ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। চিকিৎসার জন্য ডাক্তার বাবুর অনেক মূল্যবান ঔষধও খরচ হয়। অনেক দিন চিকিৎসার পর রোগীর অবস্থা একবার ভাল ও আর একবার মন্দ হইতে লাগিল। অবশেষে কিছু দিন বিনা ঔষধে থাকিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে।

পুত্রের আরোগ্য লাভের পর ষ্টেশনমাষ্টারের সহিত এক দিন ষ্টেশনে ডাক্তার বাবুর দেখা হয়। ষ্টেশনমাষ্টার ডাক্তারবাবুকে বলিলেন,—"আপনি তো ভারী চিকিৎসাই করলেন। রোগী আপনাআপনিই ভাল হইয়া গেল দেখিতেছি।" ইহার পর আর ডাক্তারবাবু তাঁহার প্রাপ্য টাকার কথার উল্লেখ না করিয়া কিছু বিরক্তি ও ঘৃণার সহিত ষ্টেশনমাষ্টারের নিকট হইতে চলিয়া আসেন।

ষ্টেশনমাষ্টার যে ষ্টেশনে ছিলেন, সেটী বেশ বড় ষ্টেশন। তাঁহার মাহিনা অল্প হইলেও, ঘুস ইত্যাদি উপরি পাওনায় তাঁহার বিস্তর লাভ হইত। যাঁহাদের ঘুস ইত্যাদি লইবার অভ্যাস আছে—তাঁহাদের মেজাজ সাধারণতঃ কিছু ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। এই ষ্টেশনমাষ্টারের এই গুণটী ছিল। কিন্তু ফি না দেওয়া উপলক্ষ করিয়া ডাক্তার বাবুর সঙ্গে তাঁহার যে দিন রূঢ় ভাবে কথা হয়, তাহার কিছু দিনের মধ্যেই একজন গার্ডের সঙ্গে ষ্টেশনমাষ্টারের বচসা হয় এবং গার্ড তাঁহার নামে রিপোর্ট করিবে বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ষ্টেশন-মাষ্টার নরম হন নাই। যাহা হউক, পরে গার্ড রিপোর্ট করে এবং তাহার ফলে ষ্টেশন-মাষ্টার একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে বদ্‌লি হন। ঐ ষ্টেশনে কোনও উপরি-প্রাপ্তির উপায় ছিল না। ডাক্তার বাবুও কিছু দিন পরে নিকটস্থ কোনও বড় ষ্টেশনে বদলি হন। তিনি এক দিন, ষ্টেশন-মাষ্টার যে ষ্টেশনে ছিলেন, সেই ষ্টেশন দিয়া ট্রেণে কোনও স্থানে যাইতেছিলেন। ষ্টেশন-মাষ্টারের Medical Certificate লইয়া সেই ষ্টেশন হইতে অন্য একটী ষ্টেশনে বদলি হইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ডাক্তারবাবু এমন গম্ভীর ও ঘৃণার ভাব দেখান যে, ষ্টেশন-মাষ্টার মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলিতে পারিলেন না। এই জন্যে মনে-মনে তিনি রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

ষ্টেশনমাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোথায় যাইতেছেন?" তাহাতে ডাক্তারবাবু জানান যে, তিনি কার্য্যস্থল হইতে অল্প দিনের ছুটি লইয়া যাইতেছেন, আবার কয়েক দিন পরে ফিরিয়া আসিবেন। ইহা শুনিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার বলেন যে, তাঁহার কথা মিথ্যা; কেন না, তিনি যখন এত জিনিষ-পত্র লইয়া যাইতেছেন, তখন আর ফিরিবেন না। দিন-দশেক পর যখন ডাক্তারবাবু ফিরিয়া আসেন, তখন ষ্টেশন-মাষ্টার ষ্টেশনে ছিলেন না। ডাক্তার-বাবু যে মিথ্যা কথা বলেন নাই, তাহা প্রমাণিত করিতে একখানি কার্ড ষ্টেশনমাষ্টারকে দিবার জন্য ষ্টেশনের কোনও কর্ম্মচারীর নিকট দিয়া যান। পরে তিনি জানিতে পারিলেন, ষ্টেশনমাষ্টারের অসুখ হইয়াছিল, এবং সেই অসুখেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

এই ঘটনায় প্রথমতঃ দেখা যায় যে, ডাক্তারবাবুর প্রাপ্য টাকা ফাঁকি দিবার মতলবে যে দিন ষ্টেশনমাষ্টার ডাক্তারবাবুর প্রতি অযথা দোষারোপ করেন, তাহার কিছু দিন পরেই গার্ডের সহিত তাঁহার গোলযোগ হয়—যাহার ফলে তিনি দুর্গম স্থানে বদলি হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এখন গার্ডের সঙ্গে ষ্টেশনমাষ্টারের যে কলহ হয়, তাহার একটি কারণ এই হইতে পারে যে, ষ্টেশনমাষ্টার ডাক্তার-

বাবুর সহিত ঝগড়া করিয়া যে অন্যায় ভাবে ফাঁকি দিতে যাইতেছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার মনের ভিতর অযথা ঝাঁঝ জমিয়া গিয়াছিল। কুকর্ম্ম করিবার সময় অনেকেই মনের ভিতর এইরূপ ঝাঁঝের ভাব জমাইয়া লন, এবং একবার ঝাঁঝ জমিয়া গেলে, আত্মসংবরণ করাও কঠিন হইয়া উঠে। এদিকে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যখন ষ্টেশন-মাষ্টার ঝগড়া করিতে গেলেন, তখন ডাক্তারবাবু কোনও তর্ক-বিতর্ক করিলেন না, ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। ডাক্তারবাবু যদি ঝগড়া করিতেন, তাহা হইলে কতকটা এই ঝাঁঝ খরচ হইয়া যাইত। হয় ত ইহার একটা মীমাংসাও হইতে পারিত। ডাক্তারবাবুকে কিছু অল্পসল্প দিয়া একটা রফা হইলে, এই ঝাঁঝের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হয় তো থাকিত না। কিন্তু তাহা হইল না—মনের ভিতর ঐ ঝাঁঝটি পূর্ণভাবে রহিয়া গেল। তাহার পর ট্রেণের গার্ড আসিয়া তাঁহার সহিত ঝগড়া করিল, তখন তাহারই উপর ঐ ঝাঁঝ পূরাপুরি বর্ষিত হইল। ডাক্তারবাবু অতি সহজে ছাড়িয়া দেওয়াতে ষ্টেশনমাষ্টারের এই ভুল ধারণা হইয়াছিল যে, গার্ডও তাহাকে ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু সকলের নিকট হইতে সমান ভাবেই উদ্ধার পাওয়া কঠিন। তাহার পর যখন পুনরায় ডাক্তারবাবুর সহিত দেখা হয়, তখনও যদি ষ্টেশনমাষ্টার নিজের অন্যায় বুঝিতেন, তাহা হইলে মনের ঝাঁঝের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা লোপ পাইয়া যাইত, পুনরায় নূতন রকমের ঝাল গড়িবার চেষ্টা করিতেন না। অন্ততঃ মরণাপন্ন অসুখের সময় তাঁহার সাহায্যও পাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার অন্যায় কর্ম্মফল তাঁহাকে ক্রমশঃ মৃত্যুর পথে লইয়া গেল।

(৫) মফস্বলের কোনও এক গভর্ণমেণ্টের ডাক্তার গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক (circular) সার্কুলার পত্র পান যে, সরকারি হাসপাতাল অনেক সময় ভিক্ষুক শ্রেণীর লোক দ্বারা পূর্ণ করা হয়; এ প্রথা গভর্ণমেণ্ট সমর্থন করেন না। সরকারি হাসপাতাল পীড়িতদের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে, এ কথা মনে রাখিতে হইবে। যাহারা খাইতে পায় না—তাহাদের খাইতে দিবার জন্য হাসপাতাল স্থাপন করা হয় নাই। রোগীরা যত পরিমাণে নিজের খাদ্য নিজ ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া হাসপাতালে থাকিতে পারিবে, এইরূপ রোগীর সংখ্যা যে হাসপাতালে বৃদ্ধি হইবে, সে হাসপাতালের পরিচালনা ততই ভাল হইতেছে—সরকার বাহাদুর তাহাই মনে করিবেন। ডাক্তারবাবুর যতদূর স্মরণ হয়, সার্কুলারটি এইরূপ ছিল।

ঐ সার্কুলার যে দিন সেই ডাক্তারটির হস্তগত হয়, তাহার দুই এক দিন পরেই একটি পশ্চিমদেশীয় যুবক সেই ডাক্তারখানায় উপস্থিত হয়। সে ডাক্তারবাবুকে বলে যে, সে দেশ হইতে চাকুরীর চেষ্টায় এখানে আসিয়াছিল; কিন্তু চাকুরী পাওয়া দূরে থাকুক, তাহার দুই দিন আহার পর্য্যন্ত জোটে নাই। তাহাতে সেই ডাক্তারবাবু গভর্ণমেণ্ট সার্কুলারের কথা মনে করিয়া বলেন যে, এরূপ লোককে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয় না। তখন সেই লোকটি খাইবার জন্য কিছু ভিক্ষা চায়। ডাক্তারবাবু তাহাকে জানান যে, Subdivisional officerএর নিকট poor fundএর টাকা আছে, সে সেখানে গেলে খাইবার জন্য ভিক্ষা পাইতে পারে। নিজে তিনি কিছু দিয়াছিলেন কি না, তাঁহার মনে নাই। মনস্তত্ত্বের নিয়মানুসারে এরূপ অসন্তোষকর স্মৃতি মনের ভিতর থাকে না—আপনা আপনি বিলুপ্ত হইয়া যায়; এবং সম্ভবতঃ ডাক্তারবাবু উপদেশ ছাড়া পয়সা দিয়া ঐ বুভুক্ষিত লোকটির কোনও উপকার করেন নাই। পর দিন পুলিস একটি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ দ্বারা পরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তারবাবুর নিকট প্রেরণ করে। সেই লাসটি রেলওয়ে লাইনে কাটা কোনও এক ব্যক্তির। লাসটি পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারবাবু স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, এই লোকটি ট্রেণ আসিবার সময় রেলওয়ে লাইনের উপর গলা রাখিয়া কাটিয়া মরিয়াছে। শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া ইহাও বুঝা গেল যে, সে লোকটির দুই এক দিন অন্নও জোটে নাই। মৃত ব্যক্তির মুখ দেখিয়া ডাক্তারবাবু বুঝিলেন যে, যে লোকটি পূর্ব্বের দিন অন্ন জোটে নাই বলিয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি হইতে আসিয়াছিল, এ লোকটি সেই। ডাক্তারবাবু তাঁহার কার্য্য অর্থাৎ শব-ব্যবচ্ছেদ, রিপোর্ট লেখা প্রভৃতি শেষ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মনের ভিতর যে দুঃখ ও অনুতাপ হইতেছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিবার জন্য এই ঘটনার কথা চাপা দিবার চেষ্টা করিলেন। নিজেকে বুঝাইলেন, ইহাতে তাঁহার আর বিশেষ দোষ কি? তিনি সরকারি নিয়ম পালন করিয়াছেন,—যাহাতে তাহার

অন্নসংস্থান হইতে পারে, সে বিষয়েও উপদেশ দিয়াছেন। সে লোকটি যদি নির্ব্বোধ হয়, তাহা হইলে সে জন্য তিনি দায়ী নহেন। নানা কাজের মধ্যে তিনি এ ঘটনার কথা মন হইতে অন্তর্হিত করিলেন। কিন্তু বোধ হয় তাঁহার ভিতরের মন হইতে সে কথা একেবারে লুপ্ত হইল না। কারণ, যখন তিনি রেলওয়ে ষ্টেশনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেন এবং ট্রেণ যখন শব্দ করিয়া আসিত—তখন তিনি একপ্রকার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ভাব (nervousness) বোধ করিতেন—ট্রেণের খুব নিকটে গিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন না। তাঁহার মনে হইত, যেন ট্রেণ তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চাকার তলে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি মধ্যে মধ্যে হত্যার স্বপ্ন দেখিতেন। নিম্নে একটি স্বপ্নের বিবরণ দেওয়া গেল।

তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, যেন তাঁহার ভগিনী একটি নদীতে স্নান করিতেছে। তিনি ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছেন। বাড়ী হইতে নদীর ঘাটে আসিবার জন্য যেন একটি বাঁশের সেতু আছে। এই সেতু দিয়া যেন একটি সাহেব ডাকাত তাঁহার ভগিনীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা দেখিয়া ডাক্তারবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার ভগিনীকে রক্ষা করিবার জন্য বাঁশের সেতুর উপর উঠিয়া এই সাহেব ডাকাতের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিলেন। ডাক্তারবাবু দেখিলেন, তাঁহার হাতে একটি ডাক্তারি ছুরি আছে। সেই ছুরি তিনি সাহেব ডাকাতের বুকে বসাইয়া দিলেন। সাহেব ডাকাতটি আহত হইয়া সেতু হইতে মাটিতে পড়িয়া মরিয়া গেল। ডাক্তারবাবু তখন বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এই ভাবিয়া যে, এখন এই মৃতদেহটী লইয়া কি করিবেন। তাঁহার উপর তো খুনের দায় চাপিল। এই মৃতদেহ সমেত ধরা পড়িলে তাঁহাকে ফাঁসি যাইতে হইবে। তিনি স্বপ্নে হত্যাকারীর যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। ইহার পরই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিবার পরও তাঁহার মনে উত্তেজনার কষ্ট রহিল—তিনি দেখিতে পাইলেন, এই দুঃস্বপ্নের জন্য তিনি ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়াছেন।

উপরি উক্ত স্বপ্নটী সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করিবার এখানে প্রয়োজন নাই; তবে কিছু কিছু বিশ্লেষণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ বাঁশের সাঁকো। ইহা হইতে এই ঘটনার কথা মনে হয়—ডাক্তারবাবু একবার নৌকা করিয়া মফস্বলে গিয়াছিলেন। মফস্বল হইতে ফিরিবার সময় নৌকার মাঝিরা বলিল যে, এখান হইতে নৌকায় বাড়ী যাইতে হইলে দেড় দিন লাগিবে; কিন্তু হাঁটিয়া যাইতে ৪।৫ ঘণ্টার বেশী লাগিবে না। সেদিন জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। জিনিষ-পত্র লইয়া মাঝিদের জল-পথে রওনা হইতে বলিয়া ডাক্তারবাবু হাঁটিয়া বাড়ী যাইবার জন্য নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। অর্দ্ধেক রাস্তায় আসিয়া দেখিলেন—নদী পার হইবার জন্য যে কাঠের সেতু ছিল, তাহা মেরামত করিবার জন্য কাঠগুলি তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এবং লোকজনের পারাপারের জন্য একটি অস্থায়ী বাঁশের সেতু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদিও সেই সেতুর উপর দিয়া সাধারণ লোক নগ্ন পদে অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু অনভ্যস্ত লোকদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ জুতা পায় দিয়া, সেই বাঁশের সেতুর উপর দিয়া পার হওয়া বড়ই বিপদসঙ্কুল। নীচে বেগবতী ভীষণ নদী—তাহার ভিতর একবার পড়িলে মৃত্যু নিশ্চয়। কিন্তু তখন আর কোনও উপায় ছিল না। নৌকাও ঘাট হইতে রওনা হইয়া গিয়াছে। এই সেতু না পার হইলে রাত্রে বাড়ী পৌছিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। অগত্যা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যে লোক ছিল—তাহার সাহায্যে সেতু পার হইলেন। কিন্তু এই নদী পার হইবার সময় তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, বাড়ীতে এত তাড়াতাড়ি আসিবার কি প্রয়োজন ছিল। রাত্রের মধ্যে বাড়ী না পৌছিয়া পরের দিন পৌছিলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত। স্বপ্নদৃষ্ট সেতুর সঙ্গেও এই ভাব জড়িত ছিল।

সাহেব ডাকাতের ঘটনায় ডাক্তারবাবুর আরও অনেক ঘটনা মনে পড়িল। তবে বিশেষ ভাবে যে ঘটনাটি মনে পড়িল তাহা এই। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া একবার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম্ দেখিতে গিয়াছিলেন। জীবতত্ত্ববিভাগে তাঁহার স্ত্রীকে তন্ময়ভাবে জীব-বিজ্ঞানের বিষয় বুঝাইতেছিলেন—এমন সময় সম্মুখে নজর পড়ায় দেখিলেন যে, একটি ফিরিঙ্গি সাহেব নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে। ইহা তাঁহার নিকট বিশেষ কুৎসিত বলিয়া বোধ হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকাতে

তিনি সেই সাহেবকে কিছু বলিতে পারিলেন না—মনের রাগ মনেই চাপিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। স্বপ্নে সাহেব হত্যা করিয়া বোধ হয় এই রাগের ঝাল মিটাইতে চাহিতেছিলেন। বোধ হয় সাহেবের ব্যবস্থার জন্যই সেই পশ্চিমদেশীয় লোকটির মৃত্যু ঘটিয়াছিল—তিনি নিজের মনকে এই কথা বুঝাইয়াছিলেন—স্বপ্নের এই চিত্রে তাহারই ইঙ্গিত ছিল।

তাঁহার হাতে যে ডাক্তারি ছুরি ছিল, তাহাতে, প্রায় সকল ডাক্তারের ভাগ্যে যাহা ঘটে, অর্থাৎ operation was successful but the patient died এইরূপ স্মৃতি জড়িত ছিল। এইরূপ স্বপ্নের প্রায় সব কয়টি ঘটনাই জীবনের অপ্রীতিকর ঘটনার দ্যোতক এবং এই স্বপ্নদর্শন-কারীর ভিতরের মনে যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহাই সূচিত করিতেছিল।

ইহার পরে ঐ সরকারি ডাক্তারটি অল্প দিনের জন্য মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালের কোনও কাজে বদ্‌লি হন। এই সময় মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে ট্রামের রাস্তার উপর ট্রাম চালাইবার জন্য যে বৈদ্যুতিক তার আছে, সেইটি ছিঁড়িয়া পড়ে। এই ঘটনা দেখিবার জন্য সেই ডাক্তার অন্য একটি ডাক্তারের সহিত রাস্তায় উপস্থিত হন। সেই সময় ঐ রাস্তায় একটি জুড়িগাড়ী বেগে দৌড়িয়া আসিতেছিল—ইহার গতিরোধ করিবার কোন উপায় ছিল না। জুড়িগাড়ী তারের নিকট পৌছিলে, ঐ গাড়ীর একটি ঘোড়ার পা যেমন বৈদ্যুতিক তারে স্পৃষ্ট হয়, ঘোড়াটি তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিক আঘাত লাগিয়া পড়িয়া যায়। জুড়িগাড়ীও উল্টাইয়া পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যায়। গাড়ীর পাশে একটী লোক আসিতেছিল, সেও চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যায়। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার বাবু বড়ই nervous হইয়া পড়িলেন। হয় ত রেলগাড়ীতে কাটিয়া যে লোকটী মরিয়াছিল, তাহার স্মৃতির খোঁচা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। তাঁহার অজ্ঞাতসারে বোধ হয় এইরূপ ভাব হইল যে, তাঁহারই দোষে একটী লোক রেলে কাটা পড়িয়া মরিয়াছে। এখন যাহাতে আর কেহ না মরে, এরূপ কাজ করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যায় কি না? এসব কথা হয় তো তাঁহার জ্ঞানের চিন্তার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয় নাই। তিনি তাঁহার সঙ্গী ডাক্তারটীকে বলিলেন যে, কম্বল non-conductor, একটী কম্বল পাইলে তারটী ধরিয়া সরাইয়া দেওয়া যাইত। এই কথাগুলি যে তিনি পরোপকার কিংবা অসীম সাহস প্রদর্শনের জন্য বলিয়া-ছিলেন—তাহা মনে হয় না। তাঁহার মনের ভিতর যে একটী খোঁচা ছিল, তাহা হইতে অন্তরে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, সেই দ্বন্দ্বের ফলে যেন কতকটা অজ্ঞাতসারেই কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল।

হয় তো তাঁহার সঙ্গী ডাক্তারটি তাঁহার কথার এই প্রত্যুত্তর দিতেন যে, দেখুন, অমন পাগলামিতে কাজ নাই। সম্মুখে অতবড় ঘোড়া এই তারের সংস্পর্শে ঐরূপ আহত হইয়া পড়িয়া গেল—আর আপনি তাহা সরাইবার ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু সে ডাক্তারটি বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই গল্পটি যে কাল্পনিক নয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য এই ডাক্তারটির নাম প্রকাশ করা যাইতে পারে যে, তিনি আজকাল কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বিলাত-ফেরত ডাক্তার—বিধানচন্দ্র রায়।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এই বয়োজ্যেষ্ঠ ডাক্তারটির কথা শুনিয়া হাসপাতাল হইতে একটি কম্বল লইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং ঐ ডাক্তার বাবুর হাতে দিলেন। ডাক্তার বাবু ঐ কম্বল দিয়া তারটি জড়াইয়া উহা সরাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বেশী ছিল বলিয়া তাঁহার তার সরাইবার চেষ্টা সফল হইল না। তখন তিনি নিজেই কম্বলটি লইয়া বেশ শৃঙ্খলার সহিত তারটি ধরিয়া রাস্তার এক পাশে সরাইয়া আনিলেন এবং মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র আনিয়া তার পাহারা দিবার জন্য ডিউটিতে বসাইয়া দিলেন। যাহা হউক, সেই ডাক্তারবাবুর মনের ভিতর যে খোঁচা ছিল, তাহা এই তার সরাইবার উপলক্ষে দূরীভূত হইল। এই কাজ করিবার জন্য তাঁহার মনে যে এক অপূর্ব্ব আনন্দ উদ্ভূত হইল, তাহাতে পূর্ব্ব জীবনের কষ্টের সমুদায় স্মৃতি মুছিয়া গেল।

বিজলী-বিকাশ*

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এ-এম-এস-ডি (ম্যানচেষ্টার)

বিশ্বের বিপুলতার কথা ভাব্‌তে গেলেই বিস্মিত হ'তে হয়; আর ততোধিক বিস্মিত হ'তে হয়, সেই বিশ্বের বিস্ময়কর যা কিছু তাদের সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে গেলে। তন্মধ্যে আজ আলোচনা কর্‌ব একটী মাত্র বিষয়ের একটী মাত্র পর্য্যায়—সে বিষয়টী "বিজলী বিকাশ"।

বাস্তবিক বিজলী সুন্দরীর বিকাশের বাহাদুরী যে কি,

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (প্রবন্ধ-লেখক)

তাহা একটী মাত্র প্রবন্ধের দ্বারা আলোচনা করা একেবারেই অসম্ভব। যে বিজলী "চকিত-চমকে চাহিয়া ক্ষণেকে ভেসে যায়" তাঁর কার্য্যক্ষমতা যে কি অসাধারণ, চকিতে যে কি অসম্ভব কাজ তিনি সম্ভব করতে পারেন, তা যাঁরা জানেন, তাঁরা ব'লবেন, কোথায় বা লাগে তার কাছে যাদুকরের ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড, অথবা আরব্য-উপন্যাসের অদ্ভুত সেই আলাদীনের প্রদীপ। সেই পলকে-প্রলয় হাসি-লাস্যের ভীমা-মধুর ক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী—ভামিনী-দামিনী-চঞ্চলা-চপলা বিজলী সুন্দরীর দাসানুদাস আমি। আজ তাঁর ক্রীড়া সম্বন্ধে ২।৪টী মাত্র কথা বলতে চাই। এবং প্রকৃষ্ট উদাহরণ সমেত ব্যাপারটী আপনাদের কর্ণ-রোচক বা দৃষ্টি-রোচক করবার জন্য টাটার বিশ্ব-বিখ্যাত লৌহ-কারখানার সহিত তাঁহার অভিন্ন সম্বন্ধ বর্ণনা করতে চাই। বিজলী সুন্দরীর সঙ্গে আমার সখ্যতা বা পরিচয় অনেক

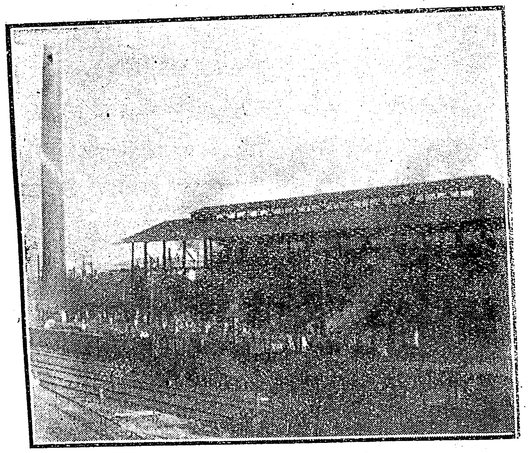

কোপার ওভেন্স (Kopper Ovens)

দিনের এবং সেই দিন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। নানা স্থানে, নানা ভাবে তাঁকে দেখ্‌বার সুযোগ আমার হ'য়েছে, কিন্তু লৌহ-কারখানার কোক্-ওভেন্স্ (কয়লা প্রস্তুতের উনুন বা কারখানায়) এ যে কিরূপ অদ্ভুত কাজ তিনি সম্পন্ন করছেন, এখন তারই একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।

লৌহ ও কোক

ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিশেষতঃ লৌহ শিল্পে আমেরিকা অতি দ্রুত অগ্রসর হ'চ্ছে। লোহার অগাধ ভাণ্ডার

* জেমসেদপুর সাহিত্য-সভার কার্ত্তিকী অধিবেশনে ছায়াচিত্র সহকারে পঠিত।

সেদেশে নানা কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। আমেরিকার বড় বড় লোহার কারখানা, শুধু বড় বড় কেন—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কারখানাগুলি, নানা দ্রব্যাদি প্রস্তুত ক'রে জগৎকে চমৎকৃত ক'রছে। কিন্তু সে দেশেও ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাই-

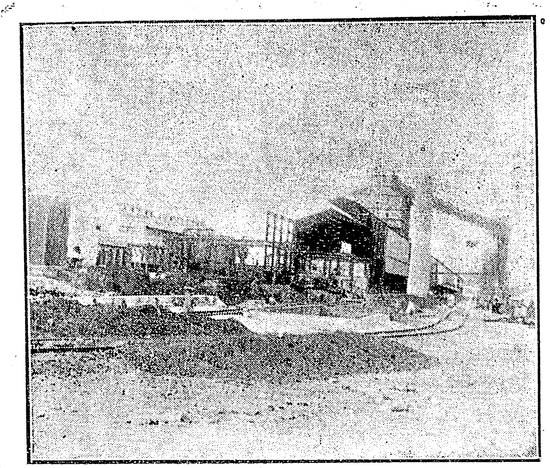

উইলপুট ওভেনস্ (Willputte Ovens)

প্রডাক্ট ওভেনগুলিতে ধাতব-কার্য্যে অথবা ব্লাষ্ট-ফারনেসে ব্যবহারোপযোগী উৎকৃষ্ট কোক প্রস্তুত হয় নাই।

১৯০৬ খৃঃ ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ ষ্টীল্ কর্‌পোরেশন লৌহ-শিল্পাভিজ্ঞ বড় বড় এঞ্জিনীয়ারগণের এক কমিটীর নিয়োগ করেন এবং সেই সূত্রেই সে প্রসঙ্গের সন্তোষজনক সমাধান হয়।

যে কোন লৌহ-কারখানায় কোক্‌ওভেন্স্ (কয়লা প্রস্তুতের কারখানা) সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কোক যত উচ্চাঙ্গের হইবে, লৌহের ঔৎকর্ষ ও পরিমাণও ততই বাড়িতে থাকিবে। পূর্ব্বে যে ধরণের কোকপ্লাণ্ট চালানো হইত, সেগুলিকে বি-হাইভ্ (Bee-hive) টাইপ বলা হইত। এখনকার বাই-প্রডাক্ট ওভেনগুলি তদপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। ইহাতে উচ্চাঙ্গের কোক পাওয়া যায়। এই সব কয়লা অধিক উত্তাপদায়ক; ওভেন্স হইতে বাহিরে আনা সহজসাধ্য ও অধিক গ্যাস ও নানাপ্রকার বাই-প্রডাক্ট প্রদায়ক। পুরাতন প্রথায় এক ক্ষেপ কয়লা প্রস্তুত করিতে ৪৮ হইতে ৭২ ঘণ্টা লাগিত, কিন্তু এই নূতন ধরণের কারখানায় মাত্র ১৮ ঘণ্টায় তাহা নির্ব্বাহিত হয়। এই কারখানা গৃহের ছাদ সংলগ্ন যে "গড়" দেখা যাইতেছে, ঐখানে প্রথমতঃ কাঁচা কয়লাগুলিকে খুব ছোট্ট করিয়া ভাঙ্গা হয়। তথা হইতে ক্রমনিম্ন নানা পথে সেগুলিকে চূর্ণ করিবার জন্য অপর এক স্থানে আনা হয়। সে স্থানের নাম হ্যামার মিল (Hammer Mill)। সেখানে সেগুলি এমন ভাবে গুঁড়া করা হয় যে, ½ ছাঁকনি জালের সেগুলি সম্পূর্ণ উপযোগী হয়। এই গুঁড়া কয়লাগুলিকে অতঃপর ওভেন্সের উপর জমা করা হয় ও পরে বৈদ্যুতিক-যান (Electric lorry) সাহায্যে প্রত্যেক ওভেনের ভিতর ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই সব ওভেন্স এক-একটী আগ্নেয়-গিরি, এবং যখন তাহার ভিতর হইতে প্রস্তুত কয়লা কল সাহায্যে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তখন মনে হয় যেন সেই সব আগ্নেয়গিরি সচল হইয়া বাহিরে আসিতেছে। এই ভাবে এগুলি প্রস্তুত হইত ১৬ হইতে ৩০ ঘণ্টা সময় ও ৯০০° হইতে ১০০০° (সেন্টিগ্রেড) উত্তাপ আবশ্যক হয়। পূর্ব্বে যেমন এই সকল অগ্নিস্তূপ বাহিরে

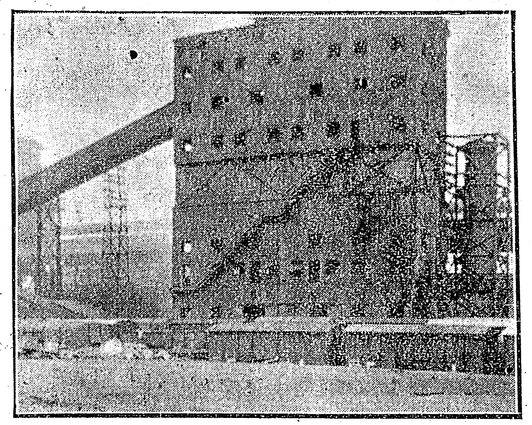

উইলপুট নিষ্পেষণ-যন্ত্র

আসিয়া প্লাটফরমের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িত, এক্ষেত্রে ঠিক সেরূপ না হইয়া সেই অগ্নিস্তূপ ঠাণ্ডি গাড়ী বা Quenching Car সাহায্যে Quenching Stationএ অর্থাৎ শীতল করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনা হয়। সেখানে বড় বড় হোজ্ পাইপ (Hose-pipe) সাহায্যে তাহাদের

উপর বারি-সেচন করিয়া ঠাণ্ডা করা হয়। এখন হইতে নানা প্রক্রিয়া সাহায্যে সেই কয়লা ব্লাষ্ট-ফারনেসে নীত হয়। কুচো কয়লা বা প্রায় গুঁড়া যাহা কিছু থাকিয়া যায়, তাহা অন্য গাড়ীতে বোঝাই হইয়া থাকে। যেখানে আগুনের এইরূপ ছড়াছড়ি ব্যাপার,—অগ্নিময় পাহাড়, সবল মানুষের পক্ষে সে-সব স্থানে হাতে কাজ করা অসম্ভবেরই নামান্তর। বিজলী সে সব স্থানে তাঁর অসীম লীলাশক্তি প্রকাশ করিতেছেন। তাঁরই ক্রীড়ায় উক্ত কলকব্জা স্ব-স্ব কাজ যথানিয়মে করিয়া যাইতেছে।

কয়লা পুড়িবার সময় তাহা হইতে যে গ্যাস উৎপন্ন হয়, তা গ্যাস-পাইপ সাহায্যে বরাবর Primary coolerএ গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে তাহা আল্‌কাতরায় পরিণত হয়, এবং বাকী অংশ হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় গন্ধক-লবণ (ammonium sulphate) প্রস্তুত হয়। কিরূপে, তাহা পরে বলিতেছি। ইহা খুব ভাল সার (manure)। ইহার পরও যে গ্যাস থাকিয়া যায়,

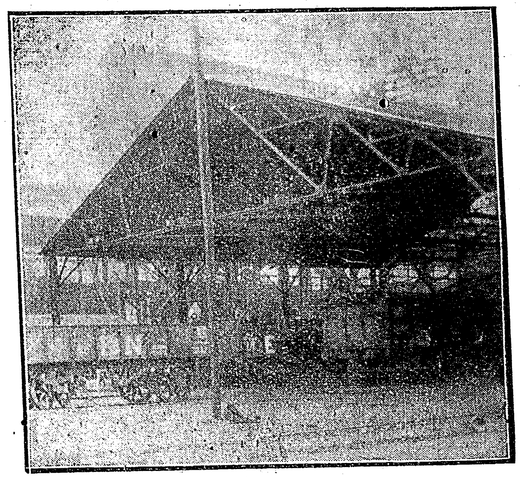

কয়লা আমদানীর ষ্টেসন

তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া কোক্ প্রস্তুতে এবং অবশিষ্টাংশ বয়লার, সোকিং পিট ও লোহার কারখানার নানা স্থানে ইন্ধনরূপে ব্যবহার করা হয়।

জেমসেদপুর কোক ও বাই-প্রডাক্ট কারখানা

জেমসেদপুর লৌহ কারখানায় মোট ৩৮০টী কোক-ওভেন্স আছে। তন্মধ্যে (১) ১৮০টী বাইপ্রডাক্ট বিহীন (Non-recovery Coke ovens). (২), ৫০টী বাই-প্রডাক্ট (Bye Product ovens) এবং (৩) প্রতিস্তরে

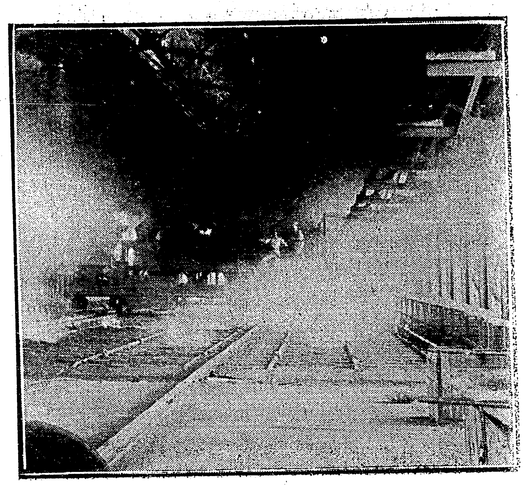

চার্জ্জ লরি

৫০টী হিসাবে তিনটী স্তরে ১৫০টী Willputte Bye Product ovens। ৪২০০ টন কাঁচা কয়লা এই ওভেন-গুলিতে রোজ খরচ হয় ও ২৩৩৫ টন কোক তাহা হইতে প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত ৫৫ টন আল্‌কাতরা এবং ২৫ টন গন্ধক-লবণ ও (ammonium sulphate) প্রত্যহ প্রস্তুত হয়। ইহাই Coke plant ও Bye-Product কারখানার একটা মোটামুটি আভাষ। কিন্তু এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা কিছু কাজের কথা বলা হইল, তাহা সমস্তই সম্পাদিত হয় অতি অক্লেশে এবং প্রায় হস্ত-শ্রম ব্যতিরেকে, কেবলমাত্র বিজলী-সুন্দরীর লীলাখেলায়। কিরূপে, এখন তাহাই বলিতেছি। তবে এটুকু আপনাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহা কিছু কলকব্জা বা মোটরের কথা বলা হইবে, সে সমস্তই বিজলী বা বিদ্যুচ্চালিত।

খনি হইতে কাঁচা কয়লা গাড়া বোঝাই হইয়া আসিয়া কারখানার একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রকাণ্ড এক আধারের মধ্যে জমা হয়। তথা হইতে বিদ্যুচ্চালিত কয়লাগুলি ১৫ অশ্বশক্তি ৪৪০ ভোল্ট, ৭৫০ আবর্ত্তন (R. P. M.) ইস্‌ডাকশান্ মোটর (Induction Motor) কর্ত্তৃক চালিত এক গাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথা হইতে পুনরায় সেগুলি এরূপ বিবরণের ১০০

অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ইনডাক্‌শান্ মোটর-চালিত আর একখানি গাড়ীতে আসে। এই গাড়ীখানি কয়লাগুলিকে প্রায় ১০০ ফুট উচ্চে যথাস্থানে চূর্ণিত হইবার জন্য লইয়া যায়।

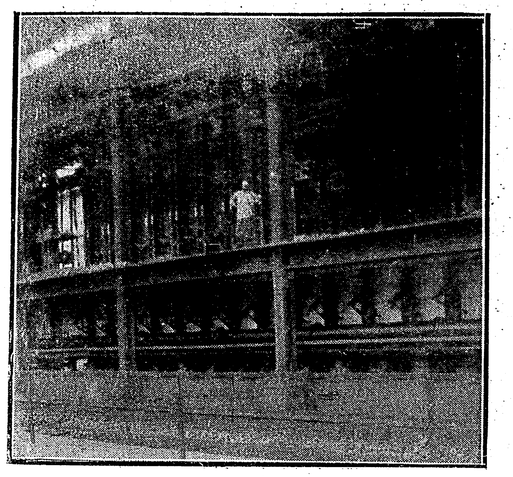

দ্বার নিষ্কাষণ যন্ত্র

তথায় চূর্ণীকৃত হইলে চুম্বক-শক্তি দ্বারা, তাহার মধ্যে কোনরূপ লৌহ থাকিলে তাহা পৃথক করা হয়। এই যে কয়লা চূর্ণ করিবার যন্ত্রাদি, এগুলি ৩৫ অশ্বশক্তি ৪৪০

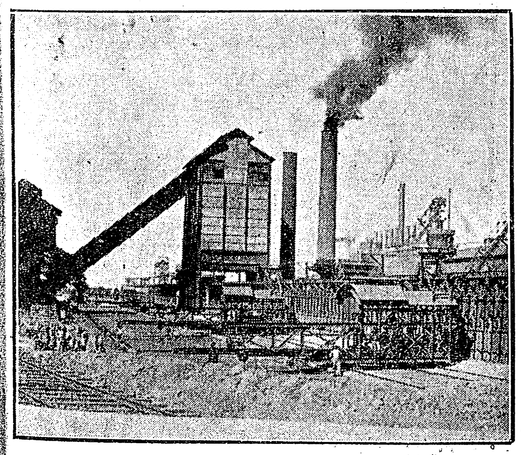

পুরাতন কোক পুসার

ভোল্ট ৩০০ আবর্ত্তনশীল স্লিপ্‌রিং ইনডাক্‌শান্ মোটর কর্ত্তৃক চালিত হয়। চূর্ণ হইবার পর গুঁড়া কয়লা ১০

অশ্বশক্তির ঐরূপ একটী মোটর চালিত মিক্সিং কনভেয়ার (Mixing Conveyor) মারফত হ্যামার মিলে (Hammer Mill) উপস্থিত হয়। এই মিলটী

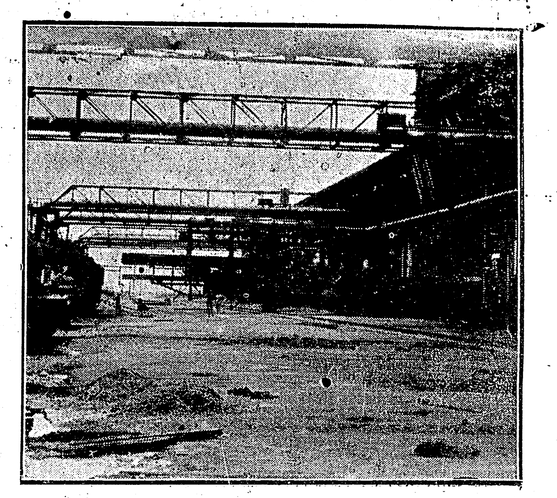

কোক পুসার

৩০০ অশ্বশক্তি ৩০০০ ভোল্ট ৭৫০ আবর্ত্তনশীল স্লিপরিং মোটর কর্ত্তৃক চালিত হয়।

হ্যামার মিল হইতে এই সব কয়লা আর একটী

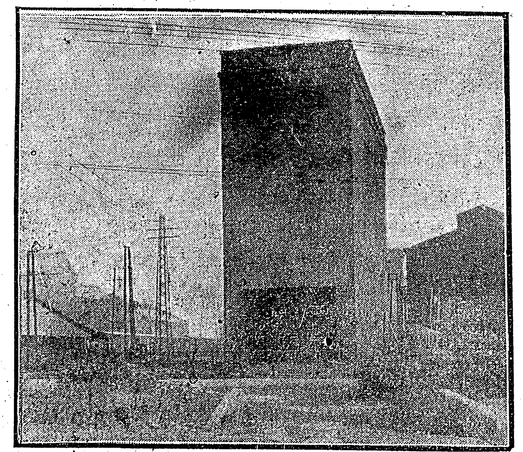

শীতল করিবার ষ্টেসন

Conveyorএ উপস্থিত হয়। এই কনভেয়ার ৭৫ অশ্বশক্তি ৪৪০ ভোল্ট, ৭৫০ আবর্ত্তনশীল এ, সি (A. C.) মোটর

শেষে এই কনভেয়ার তাহার সমস্ত দ্রব্যাদি

কোকের স্থান

ী কনভেয়ারএ গিয়া নিঃশেষ করে এবং এ
বিদ্যুচ্চালিত হইয়া ওভেনগুলির উপরিভাগে
৫০০ টনের একটী আধার মধ্যে সমস্ত দ্রব্যাদি
দেয়। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কলকব্জার কথা
, যদি কোন ক্রমে তাহাদের কোন একটী একটুও
হইয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ এক স্থানে দাঁড়াইয়া
টিপিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সবগুলি নিশ্চল করা যাইতে

াগুলি সেই প্রকাণ্ড আধার হইতে ৩০ অশ্বশক্তি
াণ্ট ৬২৫ আবর্ত্তনশীল মোটর-চালিত একখানি
বোঝাই হইয়া ওভেনের উপর দিয়া চলিতে
এজন্য রেলপথ পাতা আছে। গাড়ীখানি চারি

ওভেনগুলির মুখ বন্ধ করা হয়। ভিতরে কয়লাগুলি পুড়িয়া যখন কোকে পরিণত হয়, তখন তিনটী মোটর কর্ত্তৃক চালিত কল-সাহায্যে ওভেনের পশ্চাৎবর্ত্তী দরজাগুলি খোলা হয়। এই কলের নাম Door Extracting machine. অন্য এক কল-সাহায্যে সম্মুখবর্ত্তী দরজাও উন্মুক্ত হয়। তৎপর একটী প্রকাণ্ড লৌহশলাকা (Ram) কল দ্বারা চালিত হইয়া পশ্চাৎভাগ হইতে ঠেলিয়া সমুদয় কোক সম্মুখভাগে বাহির করিয়া দেয়। এই জ্বলন্ত কোক তখন সচল আগ্নেয়গিরির মত তথায় রক্ষিত ঠাণ্ডি গাড়ীতে (Quenching Car) আসিয়া পড়ে। সেই গাড়ী এঞ্জিন কর্ত্তৃক পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়ে কোয়েঞ্চিং ষ্টেশনে (Quenching Station) নীত হয়।

ওভেনগুলির মোটামুটী আকার—লম্বা ৩৯´-৫´´, উচ্চতা ১১´ ও পাশে ১৯´´ হইতে ঠেলিবার লৌহশলাকার

ঘড়ির কল

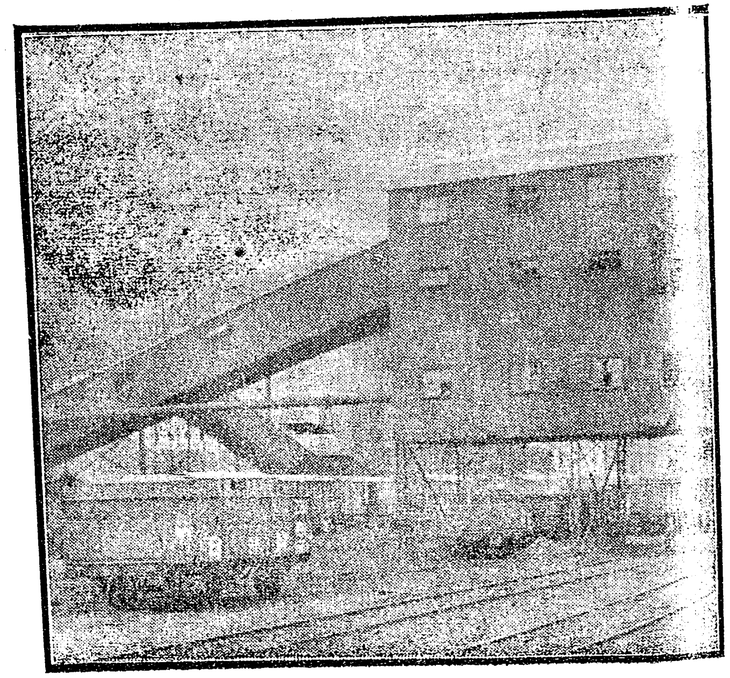

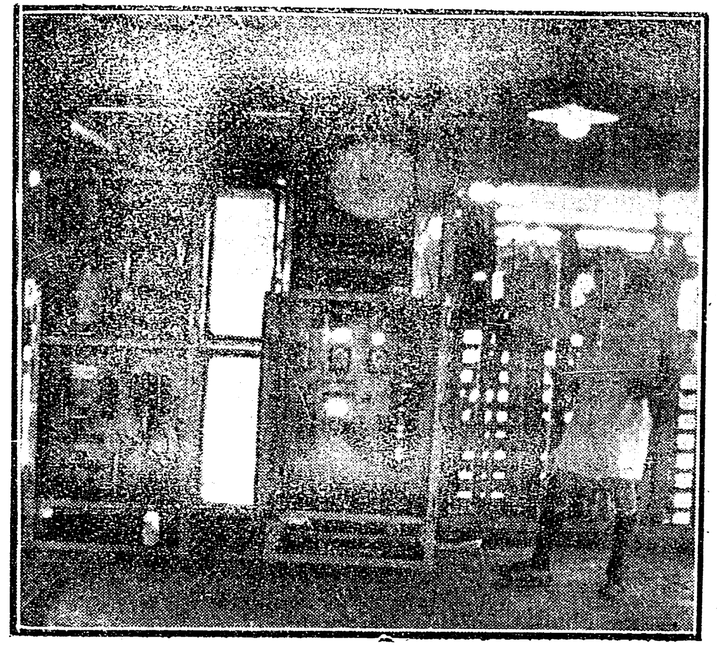

হয় (Ram Motor) সেইটীই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ করে।

পুনরায় কাজের কথায় আসা যাক। আগুনের

মোটর চালিত কল দ্বারা কন
হয়। এখান হইতে কো
(Screening Station) আ
করিয়া আর একটি ক্রমনিম্ন
হয়। সেখান হইতে সেগুলি
ও যথাসময়ে ব্লাষ্ট ফারনেসে (

আলকাতরা ও

(ammonium

ওভেন মধ্যে কোক প্রস্তুত
তাহার উত্তাপ ৩০০০ সেন্টিগ্রেড।
ও গন্ধকলবণ বাহির করিয়া লই
স্থানে ঠাণ্ডা জলের ভিতর দিয়া
গ্যাসের উত্তাপ কমিতে কমিতে
উপস্থিত হয়, তখন তাহা হইতে
densation) কতকাংশ আলক
গ্যাস বাষ্পীয় নিষ্কাশন যন্ত্র (Ste
সাহায্যে নিষ্কাশিত হইয়া বৈদ্যু

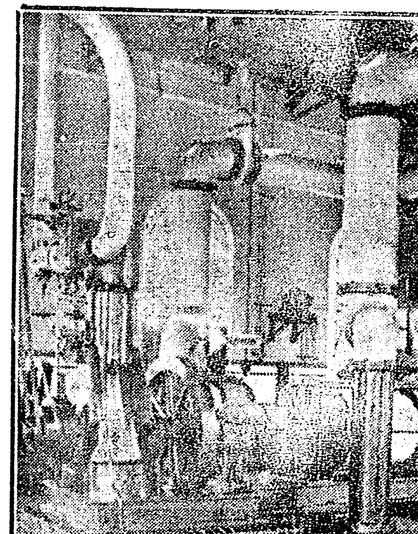

নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। এই গ্যাস পুনরায় ৮০ সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া পরিশোধন যন্ত্রে (Saturator) গন্ধক-দ্রাবক মিশ্রিত জলে বুদ্বুদ্ করিলে পর গন্ধক-লবণ (ammonium sulphate) পাওয়া যায়।

গ্যাস

ইহার পরও যে গ্যাস অবশিষ্ট থাকে, তাহার কতকাংশ ওভেনসকে উত্তাপ দিবার জন্য ফিরাইয়া আনা হয় এবং অপরাংশ বৈদ্যুতিক বুষ্টার ষ্টেশনে প্রেরিত হয়। এই বৈদ্যুতিক বুষ্টার ষ্টেশন হইতে ঐ গ্যাস প্লেট মিলের রিং-হিটিং ফারনেস্ (Re heating furnace) এ, এবং ব্লুমিং মিলের সোকিং পিট (Soaking Pit) এ ইন্ধন-রূপে ব্যবহার করা হয়। Booster station 3000 volts, 300 H P. 700 R. P. M. মোটর দ্বারা চালিত হয়।

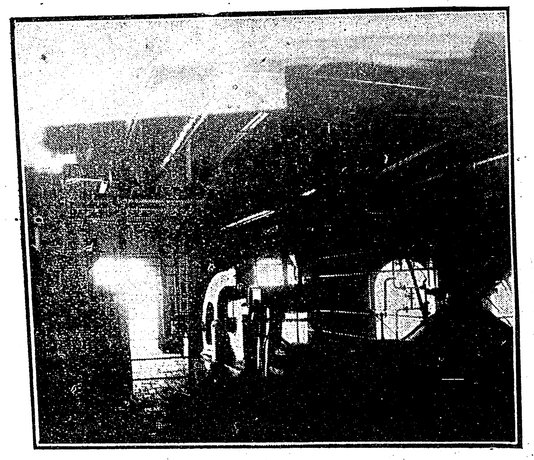

সেন্ট্রিফিউগ্যাল ড্রাইয়ার

Bye Product coke ovensএ কি ভাবে কাজ হয়, তাহার মোটামুটি বিবরণ ইহাই।

আমাদের coke ovensএ 3000 volts H. T. বিজলী ২ নম্বর Power House হতে দেওয়া হয়। 220 volts D. C. Plate mill substation হতে পাওয়া যায়। আর 440 volts A. C. coke oven switch houseএ অবস্থিত 500 K. V. A. Transformer হতে লওয়া হয়। এই Coke

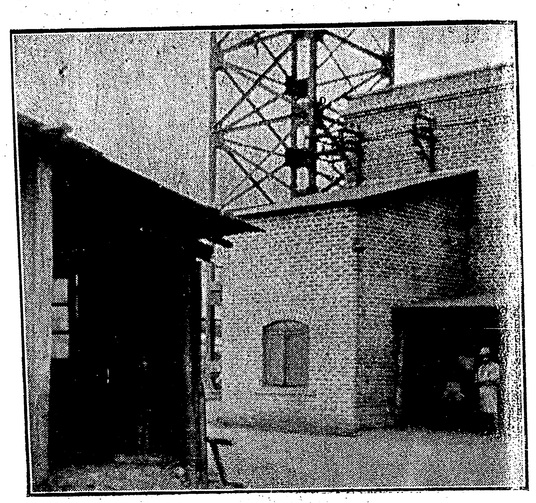

সুইচ্ হাউস্

Plantএ মোট ১০৭টী মোটর চলিতেছে ; ইহাদের মোট H. P. 3690।

Coke Plant এ বিজলীকে কি ভাবে কাজে লাগান সুবিধাজনক তাহা স্থান হিসাবে বিচার্য্য। D. C. series motor এবং Three Phase Induction motor—এই দুই প্রকার মোটরই সাধারণতঃ Coke Plantএ ব্যবহৃত হয়। এখন দেখিতে হইবে, কোন্ প্রকার মোটর কোন্ কাজের উপযুক্ত। D. C. series motor চলিবা-মাত্রই পুরাদমে চলিতে পারে, আর গতির বেগ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই কম current খরচ করে। D. C. series motorএর গতি-বেগ currentএর অপব্যয় না করে' ইচ্ছামত বাড়ান কমান যাইতে পারে। Three Phase Induction motorএর গতি-বেগ প্রায় সমান ভাবেই থাকে, খুব সামান্যই কম-বেশী করিতে পারা যায়। আর যদি করা হয়, তবে যথেষ্ট current অপব্যয় হয়। A. C. motor, D. C. series motorএর মত তাড়াতাড়ি গতি-বেগ বৃদ্ধি, বা বন্ধ করা অথবা উল্টা দিকে চালান যায় না। এই কারণে আমার মতে যে সব machine ঘন ঘন চালান, বন্ধ করা, অথবা উল্টা দিকে চালাইবার দরকার হয়, যেমন charging crane, Ram machine, Door extracting machine এবং crane

ইত্যাদি, সেই জায়গাতে D. C. series motor ব্যবহার করা সঙ্গত। যে সব machine একদিকেই সমান গতি-বেগে দিনরাত চলে—যেমন Line shaft, conveyor, Hammer mill motor সেই সব machine এ A. C. induction motorই ব্যবহার করা উচিত।

আমাদের কারখানায় এই দুই প্রকার মোটরই ব্যবহার করা হয়।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, বিজলী-চালিত যন্ত্রাদি যেরূপ প্রসার লাভ করিতেছে, এবং যেরূপ সহজসাধ্য হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, শীঘ্রই লোহার কারখানায় এ রকম coke plant সম্ভবপর হইতে পারে, যাহাতে কারখানায় কাঁচা কয়লা ব্যবহারের পরিবর্ত্তে সমস্ত কয়লা coke এ পরিণত করিয়া ব্যবহার করা যাইবে। এই Coke Blast furnace এ, Coke Breeze Boilerএ গ্যাস ও coal Tar, open Hearth Furnaceএ এবং Blast Furnaceএর গ্যাস gas engineএ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা সম্ভবপর হইলে steel এর দামও খুব সস্তা হইবে আশা করা যাইতে পারে।

আমাদের এই নূতন সহরের প্রকৃত অধিষ্ঠাত্রী বিজলী। এখানকার যা কিছু সবই তাঁর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। তিনি একটু বাঁকিয়া বসিলেই চারিদিক অন্ধকার ও সঙ্গে সঙ্গে সব গোলযোগ ও হাহাকার! এখানকার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম, শিল্পকলা, বিভিন্ন কারখানা সমস্তই "তৎপ্রসাদাৎ"। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আজ বক্তব্যের পালা শেষ করি। বিজলী-সুন্দরীর সহিত আমার সেব্য-সেবক সম্বন্ধ বহু দিনের। এ বক্তব্য তাঁহার বিকাশের সামান্য মাত্র পরিচয়। তাই বিজলী-সুন্দরীর অন্যান্য বড় বড় বিষয় পরে আপনাদের সকাশে নিবেদন করিবার ইচ্ছা রহিল। *

* বর্ত্তমান প্রবন্ধের রচনায় শ্রীযুক্ত গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট নানাপ্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, এ জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

শাহজাদী বা-দা-বুম্ এর অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী *

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আমার তখন যৌবনের ভরা উদ্যম। সুতরাং যা খুসী কর্‌বার ও যা-তা ভাব্‌বার পূর্ণ অধিকার তখন আমার। হঠাৎ খেয়াল হল—একটা ভয়ানক আশ্চর্য্য রকমের গল্প লিখ্‌তে হবে। গল্পের মোট কথাটাও মাথায় জুটে গেল। তবে এখন স্বীকার কর্‌তে রাজী আছি যে, 'প্লট'টা আমার একান্ত নিজস্ব নয়।

এক দিন রাস্তায় যেতে যেতে একখানা ছেঁড়া বই কুড়িয়ে পেলাম। দেখি, সেটা আরবীতে ছাপা, আর অতি পুরাতন। অমনি প্রেরণা হল—এর অর্থ উদ্ধার কর্‌তে হবে।

প্রথমে ইচ্ছা গেল, আরবী ভাষাটা শিখি। কিন্তু দেখতে বিলম্ব হল না যে, তাতে বাধা রয়েছে বিস্তর। গোড়াতেই এক বন্ধু বল্‌লেন যে, আরবীভাষায় মোটেই স্বরবর্ণ নাই। আর এক বন্ধু তেমনি নিঃসন্দেহে খবর দিলেন যে, আরবীতে স্বরবর্ণই শুধু আছে ; ব্যঞ্জনবর্ণগুলি লেখা হয় না। তৃতীয় একজন উপদেশ দিলেন, মাষ্টার রেখে রীতি-মত পড়্‌তে। এই শেষ কথা শুনেই আমার ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির হয়ে গেল। বইখানির অর্থোদ্ধার করার একটা সহজ পন্থা আমি আবিষ্কার করে ফেললাম। আমার সৌভাগ্য-বশতঃ বইখানার পূর্ব্বাধিকারী সেখানা ভাল করে পড়েছেন দেখলাম। প্রমাণ, আশে পাশে বাঙ্‌লায় যথেষ্ট টীকা টিপ্পনী তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সুতরাং এই-গুলিই পড়তে সুরু করে দিলাম।

পড়্‌তে পড়্‌তে যা আমি আবিষ্কার করতে লাগলাম, সে এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য ব্যাপার।

একেবারে আরম্ভ থেকেই গল্পটা বড় অপূর্ব্ব বোধ হল। অবশ্য গল্পের সবটাই টীকা টিপ্পনীতে ছিল না ; কিন্তু যে সব নির্দ্দেশ ছিল, তার ফাঁকে ফাঁকে আমার কল্পনা এমন সহজেই রঙ্ ফলিয়ে ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, যে, যতই পড়ে যেতে লাগলাম, ততই কাহিনীটা অদ্ভুত হতে অদ্ভুত হয়ে চললো।

গল্পটার গোড়ায় আছে, এক স্থবিরা বাদশাজাদীর কথা,—নাম তার বা-দা-বুম্। কয়েক পাতা পরে দেখা গেল, বাদশাজাদী বিবাহ করলেন বোগদাদের এক ধনী বণিককে। আর বইখানির শেষে পেলাম যে, নায়িকার বয়স তখন সাড়ে পাঁচ বছর।

সুতরাং মোট কথা দাঁড়াল এই যে, কোন পরী বা জিনের যাদুবিদ্যার দৌলতে আমাদের বাদশাজাদী প্রাকৃতিক ধারার ঠিক উল্টো পথ ধরে ধরে ক্রমেই নব যৌবন

* একটি ফরাসী গল্পের অনুসরণে।

পেয়ে চলেছিলেন। ছোট হতে হতে শেষে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনলীলা—বইএর পাতা ও গল্পের বইর থেকে তা সুদীর্ঘই মনে হলো—তিনি সাঙ্গ করলেন গিয়ে তাঁর জন্মকালে।

মূল গ্রন্থে এই কাহিনীটি কবি যে কি ভঙ্গীতে বিবৃত করে থাকবেন, তা আরব্যোপন্যাস যাঁদের পড়া আছে, তাঁদের অনুমান করে নিতে কোন কষ্টই হবে না। এই রূপকের মর্ম্ম বুধমণ্ডলীর বুদ্ধিতে সহজেই ধরা পড়বে।

বাদশাজাদী বা-দা-বুম্‌এর আত্মা পৃথিবীতে অবির্ভূত হওয়ার আগে খোদাতালার কাছে নিশ্চয়ই এই ভাবের প্রার্থনা করেছিলেন—

"হে আল্লা! তোমার হুকুমে দুনিয়ায় গিয়ে আমায় যখন দীর্ঘজীবন ধরে একটি স্ত্রীলোকের দেহ অনুপ্রাণিত করে রাখ্‌তে হবে, তখন তোমায় মিনতি করি—এই প্রার্থনা আমার মঞ্জুর কর, যেন তোমার সৃষ্ট জীবেরা তাদের জীবনকাল যে ভাবে কাটিয়ে চলে, আমি তার বিপরীত দিকে চল্‌তে পারি। বুড়ী করেই আমায় জন্ম দাও, আর জীবনের শেষ পর্য্যন্ত যেন আমি ক্রমেই বয়সে ছোট হয়ে হয়ে চলি।"

আর উত্তরে আল্লাও নিশ্চয় বলেছিলেন—

"এ বড় আজব খেয়াল। তোমার আরজি মঞ্জুর। কিন্তু এক কথা, হে আত্মা! শেষে কিন্তু অনুতাপ করতে পারবে না। এখন তবে যাও, জন্ম নাও গিয়ে।"

এই আজগুবী মৎলবটিকে আরব মহা-কবি যে কি ভাবে ফুটিয়ে ফুলিয়ে ফুলিয়ে ধরেছিলেন—আমি আবার বলি—তা হৃদয়ঙ্গম করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়।

বাদশাজাদী বা-দা-বুম প্রথমেই হলেন অতি বুড়ী—কেউ তাঁর দিকে নজরও দিত না, তিনি থাক্‌তেন নির্জ্জনে একলা একলা। বৃদ্ধ বয়সে অতীতের কথা স্মরণে যে আনন্দ, যে তৃপ্তি, তাও তাঁর ছিল না; কারণ, বুড়ী হ'লেও তাঁর অতীত বলে কিছু ছিল না। তাঁর জবুথবু অবস্থা দেখে আশপাশের লোকেরা তাঁকে অবহেলাই করে আস্‌ত। তার পর ক্রমে যখন তিনি যুবতী হয়ে চললেন, তখন তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে কত লোকেই না তাঁর পাণিপ্রার্থী হয়ে পড়ল। শেষে আল্লার মর্জ্জিমতে তাঁকে বিয়ে করল ইস্পাহান থেকে আগত জহর-ব্যবসায়ী মহাধনী আলি তোরব।

কিন্তু যৌবন পার হয়ে তিনি যখন বালিকা হতে চললেন, তখন তিনি বড়ই বিপদে পড়ে গেলেন,—তাঁর বিষম অনুতাপ উপস্থিত হলো। হারেমের মধ্যে বসে, বাঁদীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, তিনি রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নিশ্চয়ই মুখে অনেক সব অঙ্গরাগ ঘষাঘষি করতেন—একটু-খানি বেশী বয়সের হবার জন্যে।

হায়, বৃথা যত্ন! শৈশব যে আস্‌বেই। তাঁর শরীরের আয়তনও দিন দিন ছোট হয়েই চল্‌লো। দারুণ ভীতি তাঁকে পেয়ে বস্‌ল। তিনি স্পষ্ট দেখলেন যে, তাঁর জন্মের অর্থাৎ মৃত্যুর কাল উপস্থিত-প্রায়।

তাঁর স্বামী, স্বামীর বন্ধুরা সকলে তাঁকে দোষ দিতে আরম্ভ করলো যে, তিনি এখন ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েকে তাঁর অসৎসঙ্গের সঙ্গী করে নিতে চাচ্ছেন। আর সহ্য করতে না পেরে, স্বামী তাঁকে পরিত্যাগ করলে। অভাগী বা-দা-বুম ক্রমে শিশু হয়ে পড়ল। অবশেষে এক দিন যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মাতৃজঠরে গিয়ে প্রবেশ করলো—অন্তিমে, শূন্যে মিশে গেল।

এই অদ্ভুত অপূর্ব্ব কল্পনা আমার মস্তিষ্ককে এমন ভাবে আলোড়িত করে তুল্‌ল যে, শেষটা আর থাক্‌তে না পেরে একজন বুড়ো মৌলবীকে ধরে পড়লাম—বইখানার আদ্যোপান্ত অনুবাদের জন্য। অবশ্য আমার ধারণার কথাও সব তাঁকে আগেই খুলে বল্‌লাম।

বইখানা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে মৌলবী সাহেব আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—

"আপনি প্রত্নতাত্ত্বিক—আরব সভ্যতার-গবেষণায় নিযুক্ত?"

আমি নাকচোখ বুজে খুব জোর করে বলে ফেললাম,—"আজ্ঞে হাঁ"।

শুনে বুড়ো অসভ্যের মত কি বল্‌লে জানেন? বল্‌লে—"মশাই, আমি ত মনে করি আপনি একটা অজ।"

আমি হাঁ করে রইলাম। বুড়ো একটু থেমে বলে চল্‌লো—"এটা একটা অতি পুরাতন গল্প। শাহজাদী বা-দা-বুম্‌এর কথা সকলেই জানে—আপনি ছাড়া। "জিরাফা জিরাফ" বংশের যে দ্বিতীয় শাখা আজর্-বেন-করক্-মিস্তাল বংশ, তার যে তৃতীয় উপশাখা (আমার মুণ্ডপাত করবার জন্য এই রকম কত যে দুষ্পাচ্য নাম বুড়ো উচ্চারণ করে গেল তার ঠিক ঠিকানা নেই) তাঁর প্রপৌত্রী হচ্ছে বা-দা-বুম্। আর সকল মানুষে যেমন জীবন যাপন করে, ইনিও ঠিক তেমনি করেছিলেন (কথা কয়টি মৌলবী সাহেব অসম্ভব রকম বিশ্রী রাগের সঙ্গে মোটা হরফে বললেন)। গল্পটা নেহাৎ বাজে—কোন বিশেষত্ব এর মধ্যে নাই। একটা কথা শুধু এই, আরবীর প্রত্নতাত্ত্বিক বলে যিনি আপনাকে জাহির করতে চান, তাঁর অন্ততঃ এইটুকু জানা উচিত যে, আরবী কেতাব উল্টাভাবে পড়তে হয়। আমাদের বইএ যেটা শেষ পাতা, আরবীতে হচ্ছে সেইটেই প্রথম পাতা, আরবীতে ডাইনে থেকে বাঁয়ে নয়, বাঁয়ে থেকে ডাইনে পাতা উল্‌টিয়ে যেতে হয়। বুঝলেন এখন আপনার গল্পের রহস্য?"

এর পর থেকে আমি সঙ্কল্প করেছি, আরবী ভাষা আর কখন শিখ্‌ব না। আমার স্থির সিদ্ধান্ত এখন যে, যতক্ষণ গল্প বোধগম্য নয়, ততক্ষণই চমৎকার। বোধগম্য হ'লেই গল্পের চমৎকারিত্ব মাটি হয়ে যায়।

বার্টরাণ্ড রাসেল্

BERTRAND RUSSEL

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সুইটজরলণ্ডে লুগানো সহরটিতে ইতালীয়ানদের বসবাস। দৃশ্য-সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব। Women's League of Peace and Freedomএ আমাকে রোলাঁ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিতে যেতে হয়েছিল। আমরা শতাধিক নিমন্ত্রিত ছিলাম। তার মধ্যে মহিলাবর্গ বেশি।

এরূপ স্থলে বিদেশে এসে সকলেই একটা স্ব-স্ব দেশের এটিকেটের জগদ্দলন পাথরের চাপ হ'তে মুক্ত বোধ করেছিলেন। কাজেই এখানে আমাদের মধ্যে অবাধে মেলামেশাটা ভারি উপভোগ্য ছিল। সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার দরুণ নিয়মকানুন-আনুগত্য ও কায়দা-দুরস্ত হওয়ার সমীচীনতা সম্বন্ধে বিজ্ঞজন অনেক সুযুক্তিই প্রয়োগ কর্ত্তে পারেন। তবে যেহেতু আমি অন্ততঃ এখনও অবধি নিজে এ শেষোক্ত সম্প্রদায়ের অন্যতম বলে গণ্য হই নি, সেহেতু আমার এ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ কথা বলা নিরর্থক শোনাবার সম্ভাবনাই পনর আনা। তাই আমি শুধু এ প্রসঙ্গে বলতে চাই এই কথাটি মাত্র, যে পনর দিন ব্যাপী এ অবাধ মেলামেশার ফলে আমার এক ডেনিশ বন্ধু এক সুইস তরুণীর প্রেমে পড়ে মাস কয়েকের মধ্যে তার পাণিগ্রহণ করেন। এ ছাড়া এ সমিতির অবাধ মেলামেশার আর কোনও কুফল (?) অন্ততঃ আমার গোচরে ত আসে নি।

সান্ধ্যভোজনে বসেছি। হট্টগোলটা বেশ ভারত-সুলভই লাগ্‌ছিল। এমন সময়ে আমাদের টেবিলের এক ফরাসী মহিলা আমাকে বললেন যে রাসেল এসেছেন। যাঁর বই তখন খুবই পড়তাম; যাঁর চিন্তাধারা তখন আমাদের মনে প্রথম এক নূতন আলোর খবর এনে দিয়েছিল; যাঁর নাম য়ুরোপের চিন্তাজগতে প্রখ্যাত; যাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমার এ সমিতিতে আসার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল;—তাঁর আগমন সংবাদে যে আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠবে এ কথা বোধ হয় বলাই বেশি। আমি চারিধারে তাকাতে লাগলাম।

একটী টেবিলে এক ঘনশ্বেতকেশ গুম্ফশ্মশ্রুমণ্ডিত, প্রৌঢ়ত্ব ও বৃদ্ধত্বের মাঝামাঝি এক ভদ্রলোককে দেখ্‌লাম। তীক্ষ্ণ নাসিকা। ততোধিক তীক্ষ্ণ চক্ষু। মাথাটী আয়তনে প্রকাণ্ড। ক্ষীণ কলেবর। হীন বেশ, এমন কি ময়লা কলার—যা য়ুরোপে সভ্য-সমাজে অতি দূষণীয় বলে গণ্য। ইনিই বার্টরাণ্ড রাসেল! নাঃ, চেহারাটি প্রথমে যে আমাকে চমক লাগিয়ে দেয় নি সে কথা অস্বীকার কর্লে সত্যের অপলাপ হবে।

আহারের পরই তাড়াতাড়ি রাসেলের কাছে গিয়ে তাঁকে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধার কথা বললাম। রাসেলের মুখখানি আন্তরিক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি অত্যন্ত সহৃদয় ও সরলভাবে বললেন "Oh it is very kind of you indeed to say so!" তাঁর এ কথার মধ্যে যে য়ুরোপ-সুলভ কপটশীলতা বা অত্যুক্তি ছিল না তা বুঝতে বেশি অন্তর্দৃষ্টির দরকার হয় নি। তাঁর হাসিটী তাঁর দৃশ্যতঃ শুষ্ক চেহারার মধ্যে সব প্রথম আমার ভাল লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আর একবার যেন নূতন করে উপলব্ধি করলাম, মহৎ লোকও আন্তরিক তারিফ পেলে কতটা খুসি হ'ন—যদিও মহত্ত্ব যে এ তারিফের অপেক্ষা

রাখে না এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে সতর্কীর মহত্ত্ব শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পেলে যে আনন্দিত হয় দেখা যায়, সে আনন্দের মূল কারণ বোধ হয় অভিমান নয়। মানুষের হৃদয় সহানুভূতির মধ্য দিয়ে এই দৃশ্যতঃ অনৈক্যের মধ্যেও একটা ঐক্যের পরশ পেয়ে থাকে। এ ঐক্যের অনুভূতির মূল্য আমাদের কাছে খুব বেশি বলে উপলব্ধিটিরও আমরা বেশি দাম না দিয়েই পারি না।

দুঃখের বিষয় রাসেল আমাদের সমিতিতে তিন দিনের বেশি থাকতে পারেন নি। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আশ মিটিয়ে আলাপ করার সুযোগও ঘটে নি। তবে আমার সাধ্যমত আমি নানান্ সময়ে নানান্ বিষয়ে এঁর সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ খুঁজে নিতাম। কেননা আমার বিশ্বাস যে এ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একটু নিকট-সংস্পর্শের দাম আমাদের জীবনে খুব স্থায়ী হয়ে থাকে। কারণ মহত্ত্ব—তা সে যে দিকেই হোক্ না কেন—আমাদের মনের উপর একটা গভীর ছাপ অঙ্কিত না করেই পারে না, যদি এ মহত্ত্ব বোঝবার একটু ক্ষমতা অর্জ্জন করা যায়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে রাসেল সম্বন্ধে দু'চারটে কথা লিখবার ও সেই সূত্রে তাঁর Philosophy of Life সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবার অভিপ্রায় নিয়ে কলম ধরা গেছে। তবে তাঁর Philosophy of Life সম্বন্ধে এত কথাই বলা যেতে পারে যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সব কথার কোনও সন্তোষজনক আলোচনা হওয়াই সম্ভব নয়। তবে তা সত্ত্বেও যে আজ রাসেলকে নিয়ে সাধ্যমত একটু আলোচনা কর্ত্তে প্রবৃত্ত হয়েছি সেটা কেবল এই কথা ভেবে যে আমাদের দেশবাসীর তাঁর মতন লোকের সম্বন্ধে খবর রাখা নানান্ কারণে বাঞ্ছনীয়।

রাসেলের প্রতিভা বহুমুখী। তিনি একজন অনন্যসাধারণ গণিতবিৎ। তাঁর Principia Mathematica নাকি খুবই গভীর মৌলিকতার পরিচায়ক। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বিশেষ করে য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহের একজন উৎকৃষ্ট সমালোচক। তিনি একজন মনোহারী বক্তা। সরস আলাপী। উচ্চদরের রসিক। চমৎকার অর্থশাস্ত্রবিৎ ও শেষতঃ একজন প্রথমশ্রেণীর Political Philosopher.

রাসেলের লেখার মধ্যে আমি তাঁর অনেক গুণেরই অনুরাগী। যথা, তাঁর গভীরতা, পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতা, প্রাঞ্জল ভাষা, সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি। কিন্তু বোধ হয় সব চেয়ে ভালবেসেছিলাম—জগতের দুঃখ-কষ্টে তাঁর ব্যথা বোধ করার ক্ষমতাকে।

বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি গুণ সাধারণ না হ'লেও অনেকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে পরদুঃখ-কাতরতার যোগাযোগ বড় দেখা যায় না। রাসেল তাঁর এই গুণের জন্যই অন্ততঃ আমার কাছে এত উচ্চদরের মানুষ বলে গণ্য হয়েছিলেন। কারণ বুদ্ধির বিকাশ কর্ত্তে গিয়ে হৃদয়কে উপবাসী রেখে চলার দৃষ্টান্ত সংসারে বোধ হয় একটু বেশি দেখতে পাওয়া যায়। হয়ত বা বুদ্ধি ও হৃদয় এ দুয়ের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ সম্পর্ক আছে, যাতে করে' একের বিকাশে অপরের একটু খর্ব্বতা সাধন না হয়েই পারে না। তবে সে যাই হোক্, এটা কিন্তু ঠিক যে এ দুই গুণের মিলনে মানুষের যে মনোজ্ঞ বিকাশটী হ'য়ে থাকে তার মূল্য সত্যসত্যই খুব বেশি।

রাসেলের মহত্ত্বের পরিমাপ সম্বন্ধে একটা কথা প্রথমেই ব'লে রাখা মন্দ নয়। যদি অনুরাগী বা ভক্তের সংখ্যা দিয়ে মানুষের মহত্ত্বের মূল্য ধার্য্য কর্ত্তে হয় তা'হলে প্রিন্স ক্রপটকিন, রাসেল, বাকুনিন প্রমুখ মহাজনকে বড়লোক বলা চলে না। কারণ এরা তাঁদের উদারতা ও পরদুঃখকাতরতার জন্যই স্বদেশে উৎপীড়িত ও বিদেশে অবজ্ঞাত হ'য়ে থাকেন,—এক সমমতাবলম্বী দু'চারজনের কাছে ছাড়া। তার কারণ জগতের সাধারণ মানুষ অন্ততঃ আজ অবধি উচ্চতম চিন্তাশীলতা বা মহত্ত্বের দাম দিতে শেখেনি—যদি সমাজ বিশেষ করে' তাদের সে দাম দিতে না বলে। এ বিষয়ে মানুষ বড়ই সমাজ-মুখাপেক্ষী। কারণ গতানুগতিকতাই হচ্ছে শতকরা নব্বই জনের ধর্ম্ম। তাই যেহেতু রাসেল ক্রপটকিন্ প্রভৃতি মহাপ্রাণ লোক স্বদেশে লোকপ্রিয় নন, সেহেতু স্ব স্ব দেশবাসীদের অধিকাংশের কাছেই এরা হয় ভ্রান্ত না হয় গোঁড়া, না হয় অন্ধ ও না হয় দুষ্ট লোক বলে গণ্য হ'য়ে থাকেন। সুতরাং রাসেল যে ইংলণ্ডে লোকপ্রিয় নন এ সংবাদে ভেবে দেখলে বিশেষ আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

রাসেলকে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম ইংলণ্ডে তাঁর সম্বন্ধে লোকমত কি রকম। রাসেল একটু সবিদ্রূপ হেসে বলেছিলেন, "৩৫ বৎসরের নীচে যারা, তারা আমার পক্ষে; তবে ৩৫ বৎসরের বেশি যাঁদের বয়স তাঁরা এ অধীনের প্রতি মোটেই সদয় নন।" কারণটা দুর্ব্বোধ্য নয়। রাসেল পুরাতন-পন্থী নন। তার ওপর তিনি একজন Socialist (খুব বাড়াবাড়ি রকমের Socialist না হ'লেও Capitalismএর বিরুদ্ধ খড়্গহস্ত)। কাজেই প্রবীণরা (যাঁরা সংসারে একটা গতানুগতিকতার খাঁজে চলায় অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন তাঁরা) রাসেলকে দেখতে পারেন না। তবে নবীনেরাই চিরকাল নূতনের পতাকা নিয়ে জীবন-পথে চলে থাকেন। তাই রাসেলকে এই নবীন-সম্প্রদায় যেমন শ্রদ্ধা করে, তেমন শ্রদ্ধা বোধ হয় আর কউ ক'রে না বা কর্ত্তে পারেও না।

রাসেল মস্ত ঘরের ছেলে। তাঁর পিতামহ দুবার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। রাসেল অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হন। আমাকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, "তারপর আমি আমার পিতামহের ঘরেই মানুষ হই।.....২২ বৎসর বয়সে আমি একটী আমেরিকান মেয়েকে বিবাহ করি।" এ বিবাহ অসুখী হয়েছিল ও এমন কি বিবাহ ভঙ্গও হয়। তারপর রাসেল কেম্ব্রিজের গার্টন কলেজের একটী ছাত্রীকে বিবাহ করেন।

রাসেল যুদ্ধের সময় যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখার জন্য কয়েক মাস জেলে আবদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধের শেষে ইংলণ্ডে তাঁর প্রতি সাধারণের বিরাগ এতই বেড়ে উঠেছিল যে তিনি একবার একটি ভাড়াবাড়ী হ'তে

তাঁর মতামতের জন্য তাড়িত হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে যদি আজ ইংলণ্ডের সব বাড়ী Stateএর হাতে থাকত তাহলে ইংলণ্ডে আমার বাস অসম্ভব হ'ত। (Prospects of Industrial Civilization)

নিজের স্বাধীন মতামতের জন্য অনেকবারই তাঁকে এরূপ ছোট বড় নির্য্যাতন সইতে হ'য়েছে। বোধ হয় এই জন্যই তিনি State বা কোন সম্প্রদায়ের হাতেই বেশি ক্ষমতা অর্পণের বিরোধী। কারণ রাসেল বলেন যে বেশি ক্ষমতা একজন মানুষের হাতে ন্যস্ত হ'লে তার অপব্যবহার হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেড়ে যাবেই যাবে।

রাসেল শান্তির একজন মস্ত পুরোহিত। যুদ্ধ বিগ্রহ যে শুধু হৃদয়হীনতা নয় মানুষের বুদ্ধিহীনতার ও অজ্ঞানতার ফল, এ কথা ইনি তাঁর প্রায় সব পুস্তকেই বলেছেন ও বার বার প্রমাণ কর্ব্বার চেষ্টা পেয়েছেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে লেখার জন্য এঁকে কেম্ব্রিজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সে সম্বন্ধে রাসেল লিখেছেন:—"যদি কেম্ব্রিজের চাকরির উপরই আমার ভরণপোষণ নির্ভর করত তাহলে এ সময়ে আমি অন্নচিন্তা চমৎকারায় বুদ্ধিহারা হতাম নিশ্চয়।" (Free Thought and Official Propaganda)

কেম্ব্রিজ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে ইনি বৎসরখানেকের জন্য পিকিনে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়ে গিয়েছিলেন। চীনদেশ ও চৈনদের এঁর এত ভাল লেগেছিল যে রাসেল আমাকে বলেছিলেন যে চীনদেশের জল হাওয়া তাঁর সহ্য হ'লে তিনি কখনই আর য়ুরোপে ফিরে আসতেন না। চীনকে রাসেল সত্যিই ভালবেসেছিলেন। এ কথা যিনিই তাঁর চীনসমস্যার উপর বইখানি পড়েছেন তিনিই জানেন। চৈনদের শান্তিপ্রিয়তা, সৈনিকজাতির প্রতি অবজ্ঞা, সাহিত্যানুরাগ, কলাপ্রিয়তা প্রভৃতি রাসেলের বড় ভাল লেগেছিল। এ সূত্রে তাঁর জাতীয়ত্ব-অভিমানরাহিত্যের বড় সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। চীনদেশ হতে ফিরে অবধি রাসেল নানাস্থানে বক্তৃতাদি দেওয়া এবং দর্শন ও গণিতের চর্চ্চাতেই কালাতিপাত কর্ত্তে মনস্থ করেছেন। আমাকে লিখেছিলেন যে, "বিশুদ্ধ বুদ্ধির চর্চ্চাই তাঁর কাছে সব চেয়ে বড় জিনিষ হ'লেও তিনি অর্দ্ধেক সময় রাজনীতি ও সমাজধর্ম্ম প্রভৃতির চর্চ্চায় নিয়োজিত করবেন স্থির করেছেন।" তার কারণ—তাঁর মানুষের দুঃখে গভীর সহানুভূতি। দর্শন, গণিত প্রভৃতির চর্চ্চার সময়েও যে তিনি ব্যবহারিক জগতে মানুষের অসীম দুঃখকষ্টের কথা ভেবে কি তীব্র ব্যথা বোধ কর্ত্তেন সে পরিচয় তার Mysticism and Logic বইখানিতে পাওয়া যায়। কি শিল্পী, কি বৈজ্ঞানিক, কি সাহিত্যিক এরা সকলেই প্রায়শঃ স্বীয় শিল্পকলা বা বিজ্ঞানের চর্চ্চার আনন্দেই বিভোর থাকেন ও অনেক সময়ে এত বিভোর থাকেন যে মানুষ বা তার সুখ দুঃখের সমস্যা তাঁদের চিন্তা-জগতে বড় একটা প্রবেশাধিকার পায় না। শিল্পী বা বৈজ্ঞানিকের মধ্যেও মানুষের দুঃখ-দৈন্যের চিরন্তন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানর দৃষ্টান্ত বড় বেশি দেখা যায় না। এরা হয়ত মনে করেন এ মাথাঘামান উদ্দেশ্যহীন, নিরর্থক; কিন্তু জগতের চিরন্তন সমস্যাগুলি যাঁদের আদর্শবাদ বা কর্ম্মজগতের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার কর্ত্তে পারে না, তাঁরা অন্যদিকে হাজারই মহত্ত্বের শিখরে উঠুন না কেন, স্বীয় চরিত্রের একটা মনোজ্ঞ সম্পূর্ণতা সাধন কর্ত্তে পারেন না বলেই আমার মনে হয়। তাই অরবিন্দ বড় সুন্দর বলেছেন "All problems of existence are problems of harmony" (Life Divine) তিনি আরও দেখিয়েছেন যে সংসারকে খাঁরিজ ক'রে যে harmonyতে পৌঁছান যায় সেটা কত দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ। রাসেল, রোলা, ক্রপটকিন, প্রভৃতির চরিত্রের গভীরতর ও তৃপ্তিদায়ক সম্পূর্ণতা দেখলে এ কথার যথার্থতা যেন আরও বেশি ক'রে উপলব্ধি করা যায়।

এ সূত্রে আমার এক ইংরাজ বন্ধু আমাকে ইংলণ্ডে বলেছিলেন যে যাঁরা জগতে বড়লোক বলে গণ্য হয়ে থাকেন তাঁরা স্ব স্ব বিষয় ছাড়া বড় একটা আর কোন বিষয়েই বিশেষ কোনও interest নেন না। তাঁর মতে এ রকম হওয়াটা মোটের উপর বাঞ্ছনীয়। অনেক বিষয়ে interest নিলে নিজের বিষয়ে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। আমার কিন্তু মনে হয় যে এ কথা সাধারণ মানুষের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সত্য হলেও মহৎ মানুষের পক্ষেও সত্য হবেই হবে বলে মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। কেন না মানুষের মস্তিষ্কর ক্ষমতাকে এ রকম সান্ত ক'রে দেখা সমীচীন বলে আমি মনে কর্ত্তে পারি না। স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন যে যেমন আমরা সচরাচর একটা লাইন পড়তে তার প্রত্যেক অক্ষর আলাদা আলাদা ক'রে পড়ি না, একসঙ্গেই তার ভাবার্থ গ্রহণ কর্ত্তে শিখি, সেই রকম এক একটা paragraphএর প্রত্যেক লাইন আলাদা না পড়েও তিনি সমস্ত paraটির ভাবার্থ বুঝে নিতে পারতেন। এ রকম ভাবে মানুষের মনের ধারণাশক্তি বোধ হয় এখনও অন্ততঃ বহুকাল ধ'রে বাড়ান যেতে পারে। ক্রপটকিন, রাসেল প্রমুখ সুধীজনের বিরাট মানসিক শক্তির কথা ভাল করে একটু ভাবতে গেলে দেখা যায় যে মানুষ চেষ্টা করলে কতখানি সম্পূর্ণতা লাভ কর্ত্তে পারে।

রাসেল বস্তুতঃ ঠিক নাস্তিক নন agnostic—অর্থাৎ ঈশ্বরকে নিয়ে মাথা ঘামানোটা তিনি নিরর্থক পরিশ্রম মনে করেন। শাস্ত্রেও তাঁর আস্থা নেই। কাজেই তিনি বলছেন "আমি কোনও জানিত ধর্ম্মেই বিশ্বাস করি না, এবং আমার আশা আছে যে সকল প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাস এক দিন লোপ পাবে। আমি বিশ্বাস করি না যে ধর্ম্ম মোটের উপর মানুষের মঙ্গল সাধন করেছে।" অপিচ "Although I am prepared to admit that in certain times and places it (i. e. religion) has some good effects, I regard it as belonging to the infancy of human reason, and to a stage of development which we are now outgrowing." (Free Thought and Official Propagnda)

তবে তিনি কিসে বিশ্বাস করেন এ প্রশ্ন মনে স্বতঃই উদয় হয়। রাসেল স্বীকার করেন যে শেষটায় প্রত্যেকেরই এমন গোটাকতক

বিশ্বাস থাকবে যার ভিত্তির উপর সে তার অন্যান্য সব বিশ্বাস ও যুক্তি প্রতিষ্ঠা কর্ব্বে। তাঁর নিজের ক্ষেত্রে এ বিশ্বাস হচ্ছে এই যে মানুষের এ জগৎকেই ভালবাসা, চিন্তা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, জীবনে-সহজ-আনন্দ ও সমাজের হিতসাধন-প্রচেষ্টা দ্বারা সুন্দর করে নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। রাসেল তজ্জন্য মানুষের অজ্ঞানতা দূর করা, মহৎ আদর্শ তাদের সামনে ধরা, স্বাধীন ভাবে ভাব্‌তে শেখা ও সমাজের অবিচার দূর করা একমাত্র উপায় মনে করেন।

রাসেল বিজ্ঞানের পূজারী। তবে বিজ্ঞান বল্‌তে তিনি এর ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সুবিধা বর্দ্ধনের জন্য যে সব আবিষ্কার হয়েছে তাদের বোঝেন না। তিনি বলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানাটাই হচ্ছে একটা মস্ত জিনিস এবং এ জ্ঞানের উপাসকরা প্রায় দেবতুল্য লোকের কাজ (Godlike thing men do) কচ্ছেন বল্‌লেও তাঁর মতে অত্যুক্তি দোষ ঘটে না।

সঙ্গে সঙ্গে রাসেল আর একটি কথা খুব জোরের সঙ্গে বলেন। সেটা হচ্ছে এই যে বিজ্ঞান বল্‌তে আমরা প্রধানতঃ বুঝি—protoplasms, electron, polarisation, radio-activity প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক কথা অজস্র ব্যবহার করার ক্ষমতা। কিন্তু বিজ্ঞানের রাজ্যে এ সব কথার সদর্থ জানার চেয়ে ঢের বড় জিনিস হচ্ছে—Scientific outlook অর্জ্জন করা। Scientific outlook বল্‌তে রাসেল বোঝেন—মানুষের স্বীয় ভাল-মন্দ নিরপেক্ষ হয়ে সত্যান্বেষণ করার সাহস ও ক্ষমতার বিকাশ। কারণ রাসেল বলেন আমরা কোন্ যুক্তিবলে ধরে নিই যে এ জগৎ মানুষের বিকাশের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, অথবা মানুষের চৈতন্য বা জ্ঞানানুসন্ধিৎসার ফলে আমাদের অমঙ্গল না হয়ে মঙ্গলই হ'বে? তাই তিনি বলেন আসল কথা হচ্ছে এই যে সত্যই আমাদের উদ্দেশ্য, তাতে আমরা মরি আর বাঁচি।

কথাটি বেশ সুন্দর শুন্‌তে বটে। কিন্তু আমার মনে হয় যে যতক্ষণ আমরা মনে করি জগতে মানুষের পরিণতি বিকাশের দিকে হতেও পারে নাও পারে, কেবল ততক্ষণই এ নিরপেক্ষ জ্ঞান-চর্চ্চায় আমাদের মন সাড়া দেয়, যেহেতু এর মধ্যে একটা মস্ত বীরত্ব ও গরিমা আছে। কিন্তু ধরুন একজন বৈজ্ঞানিকের কাছে আজ এটা অকাট্য ভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে মৃত্যুও যেমন নিশ্চিত, দশ মিনিট বাদে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শূন্যে লীন হয়ে যাওয়াও ততখানি নিশ্চিত। এ কথা যদি তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করেন তাহলে তাঁর জীবনের শেষ দশ মিনিটও কি তিনি তথাকথিত সত্যানুসন্ধানে নিরত থাক্‌বেন? অর্থাৎ তখন কি এ কাজ তাঁর কাছে নিরর্থক মনে হবে না? অবশ্য এটা হ'তে পারে যে অভ্যাসবশে তিনি শেষ দশ মিনিট সময়ও স্বকার্য্য করে যাবেন—কিন্তু সেটা যে একটা Godlike কাজ তা কি তিনি তখন সত্য সত্যই মনে প্রাণে বিশ্বাস কর্ত্তে পারবেন? তাই আমার মনে হয় যে, মুখে আমরা যতই কেন না সংশয় জানিয়ে আমাদের সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দেই, আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বোধ হয় একটা নিশ্চিত বাসনা বা বিশ্বাস না থেকেই পারে না যে, এ দৃশ্যতঃ দুঃখময় জগতের একটা না একটা মহনীয় পরিণতি আছেই আছে।

যাই হোক্ রাসেল বলেন যে মানব জীবনের বিকাশে Scientific outlook এর মূল্য অসীম। (Theory and Practice of Bolshevism এর ভূমিকা) সে জন্য রাসেল বলেন দরকার হচ্ছে—প্রধানতঃ কোন বিষয়েই দৃঢ়-নিশ্চিত না হওয়া। কারণ আমাদের কোনও বিশ্বাসই সম্পূর্ণ সত্য নয়। নিরপেক্ষ বিচার, সত্যানুসন্ধিৎসা, বিপক্ষ মতের আলোচনার প্রয়াস—এ সব উপায়ে আমরা মাত্র আমাদের মতামতের সত্যতার সম্ভাবনা বাড়াতে পারি। (Free Thought & Official Propaganda) তাই বৈজ্ঞানিকের কর্ত্তব্য—বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সত্য খুঁজতে না যাওয়া। তাঁর উচিত—অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে চলা। এবম্বিধ outlookএর সার হচ্ছে "the refusal to regard our own desires, tastes and interests as affording a key to the world." (১)

রাসেল দর্শন শাস্ত্রেরও একজন মস্ত ভক্ত, তবে আমার মনে হয় যে তার দার্শনিক মতামত অনেক সময়ে নিছক্ বিজ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার দরুণ একটু যেন অগভীর হয়ে পড়েছে। কেন না রাসেল intuitionএ বিশ্বাস কর্ত্তে চান না, সব গভীর সত্যেরই এক রকম প্রত্যক্ষ প্রমাণ চেয়ে বসেন। রাসেলের মতন যাঁরা যুক্তিতর্ক বা reasonকে একেবারে দেবতা ক'রে বসেন তাঁদের বিরুদ্ধে অরবিন্দই বোধ হয় চরম কথা বলেছেন :—"Reason is only a messenger, a representative or a shadow of a greater consciousness beyond itself which does not need to reason because it is all and knows all that is" (Life Divine) রাসেলের পরিহাস যে, "Reason is the province of man, intuition—that of beasts, birds and Bergson"—একটু সস্তা ও অগভীর মনে হয়।

রাসেল দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চার মূল্য সম্বন্ধে কিন্তু বেশ চমৎকার বলেছেন : "The true philosophic contemplation, on the contrary, finds its satisfaction in every enlargement of the not-Self, in everything that contemplates the objects contemplated and therefore the subject contemplating" (২) তবে দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চায় তিনি objectivismএর দিকে বেশি ঝোঁক দিয়ে যাবার দরুণ মানুষের চৈতন্যকেও অনেকটা Jamesএর মতন অস্বীকার করার দিকেই যেন প্রবণতা দেখিয়েছেন। এ attitude অন্ততঃ আমাদের ভারতীয় মনের কাছে প্রশস্ত মনে হয় না।

(১) Place of Science in a Liberal Education—MYSTICISM AND LOGIC.

(২) The Essay on Value of Philosophy.....THE PROBLEMS OF PHILOSOPHY.

তবে রাসেলের এরূপ ভ্রমে পড়ার প্রধান কারণ আমার মনে হয়—তাঁর mysticismকে গোড়া থেকেই একটু অবিশ্বাসের চোখে দেখা। মানুষের জীবনের গভীর রহস্য যিনি উপলব্ধি করেন তিনি জগতে সব ঘটনা বা চিন্তাস্রোতেরই জলের মত কারণ নির্দ্দেশ করে দিতে সাহসিক হন না। রাসেল যে জীবনের এ রহস্য স্বীকার করেন না তা নয়; তিনি তাঁর নানা বইয়ে নানা স্থলে মানুষের জীবনের এ অজানা, অচেনার পরশের অমৃত-রসসঞ্চারের কথার আভাষ দিয়েছেন। (৩) তবে রাসেল বলেন যে mysticism এর রাশ একটু টেনে রাখা উচিত; নৈলে তা যে আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে তা কে জানে? এ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে সব মহৎ প্রবণতারই অপচার সম্ভব। তবে তাই বলে তাদের জীবন থেকে ছেঁটে দেওয়াই কোনও পন্থা হতে পারে না। পন্থা হচ্ছে—এ সব প্রবণতাকে সুপরিচালিত ক'রে তার দ্বারা জীবনের একটা গভীরতর সামঞ্জস্য পাবার চেষ্টা করা।

রাসেলের একটা অভ্রভেদী গুণ হচ্ছে তাঁর মধ্যে কপটতার একান্ত অভাব। সব গুণের ন্যায় Sincerity বা আন্তরিকতা গুণটিরও কম বেশি আছে। তবে ঐ গুণটীর প্রাধান্য যে মহত্ত্বের একটা প্রধান নিকষ সে বিষয়ে বোধ হয় বেশি মতভেদ হবে না। তাই রাসেলের মধ্যে একটু বড় করে বোধ হয় দেখা যেতে পারে, কেননা রাসেল ও তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক মন ও কঠোর আত্মবিশ্লেষণের অভ্যাসের সাহায্যে এ sincerity গুণটিকে যতটা লাভ কর্ত্তে কৃতকার্য্য হয়েছেন, এদিক ততটা কৃতকার্য্য হওয়া বোধ হয় মহৎ লোকের মধ্যেও দুর্লভ। এঁর প্রতি বইয়েই কপটতা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও ভান-করা-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যে কশাঘাত বিদ্যমান তাঁর পরিচয় তাঁর কোন অনুরাগীর কাছেই অগোচর থাক্‌তে পারে না। তাই আমি বর্ত্তমানে তাঁর কথাবার্ত্তায় ও প্রতি ভঙ্গীতে কপটতার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গোক্তি কি ভাবে ফুটে উঠত সে সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রসঙ্গের শেষ করব। এক দিন আহারের সময় আমরা কয়জন এক টেবিলে বসেছিলাম। গল্প হচ্ছিল চীন দেশের সম্বন্ধে। কথায় কথায় চীন দেশের নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কথা উঠল। রাসেল বল্লেন যে চৈনরা এ বিষয়ে বেশ অকপট। তারা মেয়ে পুরুষ বেশ খোলাখুলি ভাবেই মেলামেশা করে ও আমরা সেরূপ আচরণকে দুর্নীতিমূলক বলে থাকি, তারা সেরূপ আচরণকে দূষণীয় বলে মনে কর্ত্তেই পারে না। আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম, "কিন্তু যারা স্ত্রীপুরুষের এরূপ অবাধ মেলামেশায় কোনও হানি আছে মনে করে না, তাদের সম্বন্ধে কি এ কথা বলা চলে না যে তাদের মধ্যে sense of moralityর তেমন বিকাশ হয় নি।" রাসেল তৎক্ষণাৎ একটু ব্যঙ্গ হাস্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন :—"If want of hypocrisy means want of moral development then the Chinese are certainly not so morally developed as we are to-day."

এরূপ রসিকতা যে রাসেলের কতদূর স্বভাবসিদ্ধ তা যে-কেউ তাঁর লেখার সঙ্গে সামান্যও পরিচিত আছেন তিনিই জানেন। এরূপ তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, সূক্ষ্ম রসিকতা এরূপ দার্শনিক ও মানব-প্রেমিকের মধ্যে বিকাশ পাওয়াটা একটু অভাবনীয়। যেমন, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের যে কি ভাবে অপব্যবহার হওয়া সম্ভব তা ভেবে রাসেল সব্যঙ্গহাস্যে লিখ্‌ছেন :—"Broadcasting is a new method (of propaganda) likely to achieve great potency as soon as people are satisfied it is not a method of propaganda." (Icarus on the future of Science) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেদিন রাসেলের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ বল্‌লেন "রাসেলের মতন witty আলাপী আমি কখনও দেখি নি।" আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় আমি রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনি কর্চ্ছি।

আমাদের মধ্যে যে একটা আত্মপূজা ও আত্মপ্রবঞ্চনার প্রবৃত্তি আছে সেটা রাসেলের চক্ষুশূল। লুগানোতে চৈনদের প্রশংসা করার সময় য়ুরোপীয়দের এ সব প্রবৃত্তিকে রাসেল যখন ব্যঙ্গ কর্‌তেন তখন অনেক সময়েই দু'চারজন য়ুরোপীয়া মহিলা তা'তে আহত বোধ কর্ত্তেন, লক্ষ্য করেছিলাম। কারণ এরূপ অপক্ষপাতিত্ব পরিপাক করারও একটা বিশেষ ক্ষমতা অর্জ্জন করা দরকার। য়ুরোপীয়েরা প্রায় সকলেই এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়ে থাকেন যে প্রাচ্য জাতিরা পাশ্চাত্যের চেয়ে হীন ও তাই white man's burden হচ্ছে—তাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার স্নেহাশীষ দান করা। রাসেল্ তাঁর "চীন সমস্যা" পুস্তকে ঠিক উল্‌টো কথাটা বলেছেন বলে গাত্রদাহে ইংলণ্ডের অনেক তথাকথিত লিবারেলও তাঁর বইখানিকে অবজ্ঞেয় বলে রায় প্রকাশ ক'রে থাকেন। কারণ অপ্রিয় সত্যকেও তারিফ করা সাধারণ মানুষের কাছে সহজ নয়। ধরুন, এ কথা শুনে কোন্ সভ্য শ্বেত মানব না চটে থাক্‌তে পরে যে, চৈনদের আশঙ্কার কথা হচ্ছে "that they may become completely westernized, retaining nothing of what has hitherto distinguished them, adding merely one more to the restless, intelligent, industrial and militaristic nations which

(৩) যেমন তাঁর Principles of Social Reconstruction পুস্তকে যেখানে তিনি বল্‌ছেন যে বালক বালিকার প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত কাজ, কে বল্‌তে পারে যে আমরা আমাদের রূঢ় ব্যবহারে অনেক সময়ে তাদের একটা মহনীয় অভূতপূর্ব্ব পরিণতির সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করি না? বা যেখানে তিনি বল্‌ছেন :—Marriage should be a spontaneous meeting of mutual instinct, filled with happiness not unmixed with a feeling akin to awe. (Roads to Freedom) এই awe কথাটিতে কতখানি ভাব নিহিত! কত শ্রদ্ধা! কত বিস্ময়! কত নম্রতা!

now afflict this unfortunate planet." মানব চরিত্রের অসারতাকে হেয় বলে দেখাবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এরকম ভাবে নানা প্রসঙ্গে স্বীয় দৃঢ়ভিত্তি আদর্শবাদ প্রচার করা বাস্তবিকই একটা মস্ত জিনিষ।

আন্তরিকতা রাসেলের প্রতি কথায় ফুটে উঠ্‌ত। কোনও ভদ্রমহিলা এক দিন চৈনদের তথাকথিত নৈতিক দোষের কথা উত্থাপন করাতে রাসেল বলেছিলেন: "আপনিই সুখী, যে হেতু আপনি সমাজে নীতির একটা সংজ্ঞা (definition) নির্দ্ধারণে সফলতা লাভ করেছেন। আমি কিন্তু আজ অবধি এ সংজ্ঞা নির্ণয় কর্ত্তে পেরে উঠ্‌লাম না। আমার ত মনে হয়, যা'কে আমরা sense of morality বলে থাকি, তা' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকমতের ভয় বা অন্য কোনও ভয়। তাই কাউকে অনচ্চরিত্র বল্‌তে আমি সহজে মনকে রাজী কর্‌তে পারি না।"

রাসেল বল্‌শেভিজমের বিপক্ষে। তার সব কারণ এখানে বিবৃত করা সম্ভব নয়। সে জন্য তাঁর Theory and Practice of Bolshevism নামে পুস্তকটি দ্রষ্টব্য। তবে তার প্রধান কারণ তিনি বলেন—Bolshevismএর ব্যক্তিগত স্বাধীন মতামতকে উড়িয়ে দেওয়া বা দাবিয়ে রাখার চেষ্টা। সভ্যতার একটা চরম ফল—মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্মান কর্ত্তে শেখা। এই জন্য ইনি Bolshevismকে "a splendid attempt without which ultimate success would have been very improbable"(৪) বলে লিখ্‌লেও কার্য্যতঃ তার সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন নি। রাসেল আমাদের এক দিন লুগানোতে বলেছিলেন যে, রুষ দেশে তিনি যে কয়দিন ছিলেন, সে কয়দিন এমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য তাঁকে ছেয়ে রাখ্‌ত যে, সেটা ঠিক বর্ণনা ক'রে বোঝান মুস্কিল। 'কেন' জিজ্ঞাসা করাতে রাসেল বলেছিলেন—"ধর তুমি এমন একটা দেশে এসে পড়েছ, যেখানে প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমার জীবন-সংশয় হ'তে পারে। এরকম স্থলে তোমার মনের অবস্থাটা যে বিশেষ রঙীন হ'য়ে উঠ্‌বে না, সে কথা বোধ হয় বেশি ক'রে বলার দরকার নেই।"

রুষ দেশে কোন্ লোকের ব্যক্তিত্ব রাসেলের সব চেয়ে বিরাট মনে হ'য়েছিল জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন—"O ! Lenin of course. He is undoubtedly the greatest man." কি জন্য greatest জিজ্ঞাসা করাতে রাসেল বলেছিলেন—"তাঁর দুর্দ্দম্য ইচ্ছাশক্তির জন্য।" তবে লেনিনের বুদ্ধিমত্তায় রাসেল চমৎকৃত হন নি। আমরা এ কথায় আশ্চর্য্য হ'তে রাসেল বলেছিলেন—"কথাটা কিন্তু সত্য। আমার ত মনে হ'য়েছিল আমাদের অমুক (বর্ত্তমান ইংলণ্ডের ও পাশ্চাত্যের একজন নামজাদা রাজনীতিক) লেনিনের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান্।" একজন সঙ্কীর্ণচিত্ত ইংরাজকে লেনিনের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান্ বলাতে আমরা অল্প নিরাশ হওয়াতে রাসেল সেটা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে বলে উঠলেন—"আমাকে ভুল বুঝবেন না, যেন; অমুক একজন পাষণ্ড (রাসেল villain কথাটি ব্যবহার করেছিলেন) কিন্তু বুদ্ধিমান্।" শুনে আমরা সকলেই হৃষ্ট হয়েছিলাম। তার প্রধান কারণ এই যে রাসেলের মতন চিন্তাশীল লোকের এরূপ মতামত প্রকাশ করার ও কোনও সাধারণ লোকের অনুরূপ মতামত প্রকাশ করার মধ্যে একটু তফাৎ আছে। সেটা এই যে রাসেলের মতন লোকের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান সাধারণের চেয়ে ঢের বেশি থাকে। তাই রাসেল যখন লেখেন "The present holders of power are evil men." তখন সেটা ভাববার কথা হয়ে দাঁড়ায়—যদিও ঠিক এ কথা যদি রাম-শ্যাম লিখিত তা হলে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর হয় ত বিশেষ দরকার হ'ত না।

রাসেল জীবনে বিশ্বাসবান্। তিনি মানুষের দ্বারা জগতের অশেষ দুঃখ-কষ্টের নিরাকরণ হ'তে পারে, এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন: তবে তাঁর গভীর দুঃখ এই যে, মানুষ—অন্ততঃ পাশ্চাত্য জাতি—আত্মহত্যা কর্ত্তে কৃতসঙ্কল্প। এইরূপ হওয়াটা তিনি জাগতিক নিয়মে এক মহান্ 'ট্রাজিডি' বলে বার বার তাঁর নানা পুস্তকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তা'র দরুণ তিনি বুদ্ধ বা শঙ্করের দর্শনের অনুমোদন করেন না। তিনি এ জগতে বিশ্বাস করাটা বড় জিনিষ বলে মনে করেন। জীবনে আনন্দ—Joie de vivre—তিনি একটা মস্ত কাজ জিনিষ বলে মনে করেন। অরবিন্দও জীবনে অবিশ্বাস করাটা অনুচিত মনে করেন। বোধ হয় সমস্ত স্বাস্থ্যবান্ মনই জীবনকে অবিশ্বাসের চোখে দেখার বিরোধী। রোলাঁও ঠিক এই কথাই লিখছেন;—"না,—আমরা জীবনকে যথেষ্ট ভালবাসি না। আমাদের কেউ তাকে ভালবাস্‌তে শেখায় না! আমরা যা'তে জীবনে বীতশ্রদ্ধ হই সে চেষ্টার কিন্তু ত্রুটি নেই। আমাদের শৈশব থেকে আমরা গান শুনি কিসের?—না, মৃত্যুর মহিমার ও মৃতের গৌরবের। ইতিহাস প্রশ্নোত্তরের ধারা প্রভৃতি সবই আমাদের শেখায় কি?—না, দেশের জন্য মর্‌তে। ন্যায়, সুবিচার, স্বাধীনতা—এ সবের জন্য যদি মর্‌তে চাও, বেশ ভাল কথা। কিন্তু যদি বাঁচতে চাও, তবেই গোলযোগ।" (৫)

যুদ্ধবিগ্রহের ঘোর বিরোধী হ'লেও তার আশু নির্ব্বাসন যে অসম্ভব এ কথা রাসেল স্বীকার করেন ও সেটা একটা গভীর ব্যথার

(৪) Theory & Practice of Bolshevism.....মুখবন্ধ।

(৫) Non; on ne l'aime pas assez—la vie ! On n'apprend pas à l'aimer. On fait tout oe qu'on peut pour vous en dégouter. Depuis qu'on est petit on nous chante la mort, la beaute de la mort ou bien ceux qui sont morts. L'histoire, le catéchisme "Mourir pour la patrie".....Droit, Justice, Liberté.....on peut mourir pour ea. Mourir, on ne refuse jamais. mais, vivre, c'est autre chose. —Clerambault.

সঙ্গে। এ ব্যথা তাঁর ব্যঙ্গের মধ্যে প্রায়ই প্রকাশ পায়। যথা তিনি একবার লিখছেন—এটা অসম্ভব নয় যে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ একদিন সমগ্র মানবজাতির বিনাশ সাধনে কৃতকার্য্য হবে। হয়ত এই উপায়ে যুদ্ধবিগ্রহের শেষ হওয়াই সবচেয়ে আশাপ্রদ পদ্ধতি। (Theory and Practice of Bolshevism)

যখন মানুষ ইচ্ছে কর্লেই যুদ্ধবিগ্রহের নিবারণ কর্ত্তে পারে তখন তাকে অন্ধভাবে এর দ্বারাই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হ'তে দেখাটা যে রাসেলের ন্যায় আদর্শপন্থীর কাছে কতটা দুঃখজনক তা বোধ হয় সহজেই অনুমেয়। রাসেল জীবনে অমঙ্গল, দুঃখ প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন, ও প্রকৃতির দৃশ্যতঃ অপচয়কে optimistic বিশ্বাসের দ্বারা উড়িয়ে দিতে নারাজ। কাজেই তিনি তাঁর একটি বইয়ে এক স্থলে লিখেছেন যে জান্‌ছি, বুঝছি, দেখছি যে আমরা ব্যাদিতব্যাদান অতল ধ্বংসের গহ্বরে চলেছি অথচ তার প্রতিকার কর্ত্তে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম; এ চিন্তাটা যে কত বড় ট্রাজিডি তা যিনিই আদর্শবাদী জগৎকে সুখময় কর্ত্তে প্রয়াসী তিনিই বুঝবেন। পারিসে একটি চিন্তাশীলা সুইস তরুণী আমাকে একবার ঠিক এই কথাই বলেছিল যে গত যুদ্ধের বিরাট ও অর্থহীন অপচয় ও ধ্বংসের দৃশ্য যিনিই দেখেছেন তিনিই জানেন মানুষের জীবনে এ একটা কত বড় পরিহাস ও সেটা কি হৃদয়হীন। য়ুরোপে গত যুদ্ধের দৃশ্য যে শুধু সেখানকার চিন্তাশীল লেখকদের ভাবিয়ে দিয়েছে তাই নয়, তা য়ুরোপের প্রায় সব চিন্তাশীল নরনারীকেই একটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে দিয়েছে।

ফলে রাসেল জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) নিষ্ফলতা সম্বন্ধেও প্রায় কৃত-নিশ্চিন্ত হ'য়ে পড়েছেন। এক দিন তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন:—"জাতিসঙ্ঘের দ্বারা যে বিশেষ কাজ হবে এ ভরসা আমার নেই। যুদ্ধবিগ্রহ অন্য কোনও উপায়েও যে নিবারিত হবে তারও ত কোনও সম্ভাবনা দেখছি না। ক্যাপিটালিস্‌মের আশু পতনের কোনও আশা ত নেই! তাই আমি ত বুঝতে পারছি না মানুষ এ যাত্রা আবার কি উপায়ে নবজন্ম লাভ কর্ব্বে।" বিষণ্ণভাবে রাসেল আমাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন মনে আছে। কিন্তু তার পরই রাসেল চিন্তিতভাবে বলেছিলেন:—"কিন্তু—কে জানে—হয়ত—একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। হয়ত কোনও অজ্ঞাত উপায়ে জগতের একটা গভীর পরিবর্ত্তন হবে। এ আশা যে আমি মনে একেবারে স্থান দিই না তা নয়।" সেদিন রাসেলের এ mystic কথাগুলি আমার মনের উপর একটা ছাপ অঙ্কিত করেছিল ও সেটা এই জন্য যে, রাসেল মানুষের ভবিষ্যৎ ও সুখদুঃখ নিয়ে কতটা মাথা ঘামান, এ কথাগুলি আমাকে তার একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়েছিল। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেই নিজের ক্ষুদ্র দৈনন্দিন সুখ দুঃখের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরেকে নিয়ে মাথা ঘামাতে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠেন। এবং যে অল্প কয়জন এ চেষ্টা করেন তাঁদের মধ্যেও খুব কম লোকেই মানুষের সুখ দুঃখ সত্য সত্য অনুভব করেন, যেহেতু অনেক তথাকথিত শিক্ষিত লোক এ সব নিয়ে আলোচনা করেন—ফ্যাশানের খাতির। মানুষের মনের ও কল্পনা-শক্তির খুব মহনীয় পরিণতি না হলে বিশ্বের মানুষের সুখ দুঃখ আমাদের মনে সত্যকার অনুরাগ তুল্‌তে পারে না।

ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে এক দিন রাসেলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। রাসেল বল্‌লেন:—'আমার মনে হয়, আর বৎসর কুড়ির মধ্যেই তোমরা স্বাধীনতা পাবে।'—'কেমন ক'রে?' 'আমার বোধ হয় ইংলণ্ড শীঘ্রই আর একটা ভীষণ যুদ্ধে নাম্‌বে, তখন তোমরা বোধ হয় আমাদের সহজেই তাড়িয়ে দিতে পার্‌বে।' এতটা উদারতায় আমি একটু চমৎকৃত হয়েছিলাম মনে আছে। কারণ, স্বজাতির দ্বারা উৎপীড়িত জাতির একজন লোকের কাছে স্বীয় আধিপত্যের বিনাশ কামনা প্রকাশ করার মধ্যে একটা sincerity ও ঔদার্য্য আছে, এ কথা বোধ হয় বেশি করে' বল্‌তে হবে না। যা' হোক্ আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম: 'কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ ক'রে যদি আমাদের এ স্বাধীনতা অর্জ্জন কর্‌তে হয়, তা' হ'লে আমরাও তার প্রতিক্রিয়ার দরুণ অত্যাচারী হ'য়ে উঠতে পারি, এ সম্ভাবনা আছে বলে আপনার মনে হয় কি?' রাসেল বল্‌লেন: 'তা' খুবই সম্ভব।'—'কিন্তু অনেক দিন ধরে শান্তিভোগ করার দরুণ ও য়ুরোপের এই কুরুক্ষেত্র শ্মশানের দৃশ্যে কি আমাদের চৈতন্য হবে না?' রাসেল একটু করুণ হাসি হেসে বল্‌লেন:—'দেখ, মানুষের স্বভাবই এই যে অপরের মধ্যে যে দোষ ত্রুটি দেখলে সে শিউরে ওঠে, সুবিধে পেলে নিজে কিন্তু সে পাপ হ'তে নিবৃত্ত হয় না।'

রাসেলের লেখার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনি বোধ হয় তাঁর লিখন-ভঙ্গীতে (style) বিশেষ ক'রে আকৃষ্ট না হ'য়েই পারেন না। আমার মনে হয় যে, এরকম প্রাঞ্জলতা শুধু নিছক্ প্রাঞ্জলতার জন্যই ইংরাজী লেখার একটা আদর্শ হিসেবে গণ্য হ'তে পারে। আমি অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ে কোনও লেখকের লিখন-ভঙ্গীর চেয়ে রাসেলের লেখার ঢঙ্‌কে নীচে স্থান দিতে পারি না। রাসেলের লেখায় কোথাও জড়তা নেই, অস্পষ্টতার ছায়াপাত নেই, আত্ম-প্রবঞ্চনার ইঙ্গিত নেই। নিজের অসাধারণ পড়াশুনা ও জ্ঞানকে তিনি জাহির কর্ব্বার কখনও চেষ্টা করেন না।—তাঁর যেটুকু জ্ঞান বা সংগৃহীত তথ্য লোকের সাম্‌নে ধরার দরকার বোঝেন, সেটুকু আহরণ ক'রে তার পাঠক পাঠিকার সাম্‌নে ধরেন মাত্র। তাঁর লেখা ছুরির মতই শাণিত, প্রস্রবণ ধারার মতই উজ্জ্বল, স্ফটিকের মতই স্বচ্ছ। সরল ভাষায় যে কত গভীর ভাব প্রকাশ করা যায়, রাসেলের লেখা তা'র জ্বাজ্বল্যমান উদাহরণ। রসিকতা হ'তে গাম্ভীর্য্যে ও গাম্ভীর্য্য হ'তে রসিকতায় স্বতঃস্ফূর্ত্তি রাসেলের লেখার একটা মস্ত সম্পদ। যেমন যেখানে তিনি লিখ্‌ছেন;

Now-a-days many men love their wives in the way they love mutton, as something to devour and destroy. But in the love that goes with reverence, there is a joy of quite another order, than any to be found in mastery. a joy which satisfies the spirit and not

only the instincts.' (Roads to Freedom) অথবা যেখানে তিনি স্বজাতির সম্বন্ধে বলছেন যে, আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে—'kindliness and tolerance are worth all the creeds in the world—a view which, it is true we do not apply to other nations or subject races.' (Theory & Practice of Bolshevism).

আমার রাসেল-রোঁলা প্রমুখ দু'চার জন য়ুরোপের চিন্তাবীরের সঙ্গে আলাপ করবার পর মনে হচ্ছিল যে, শুধু এঁদের লেখা থেকে এঁদের চরিত্রের গরিমার বা বহুধা পরিণতির সম্বন্ধে জ্ঞানটা অনেকটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ জ্ঞান বা ধারণার সম্পূর্ণতা অনেক বেড়ে যায় যদি এঁদের মত লোকের সঙ্গে একটু নিকট সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়। কারণ খুব বড় শিল্পী বা শিক্ষকও তাঁর শিল্পে বা লেখায় অনেক সময়েই এমন অনেক জিনিষ প্রকাশ করতে পারেন না, যা' তাঁ'দের ব্যক্তিত্বের সৌরভ আমাদের এক মুহূর্ত্তেই এনে দিয়ে থাকে। অথচ এ কথা ঠিক যে, কোন উপায়েই মানুষ তা'র সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে বাইরের লোকচক্ষুর কাছে পূর্ণভাবে মূর্ত্ত করে ধরতে পারে না; সৃষ্টির এইখানেই একটা মহৎ গরিমা ও রহস্য বিদ্যমান যে, আসল মানুষটি চিরকালই তার সব জড়িয়ে অভিব্যক্তিরও অতিরিক্ত থেকে যায়। অথচ হয়ত যেটুকু সে প্রকাশ করতে পারে তার চেয়ে তার রহস্যময় অস্ফুট রূপটা ঢের বেশি আসল। তবে এ প্রকাশ সম্বন্ধেও একটা কথা আছে। একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের আত্মপ্রকাশও ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রকম ঠেকে ও ঠেকতে বাধ্য। কারণ আমরা বস্তুতঃ অপরের এমন কোনও মহত্ত্ব বা পরিণতি ধরতে ছুঁতে পারি না, যার বীজ আমাদের স্বীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে খানিকটাও অঙ্কুরিত হয়নি। উদাহরণতঃ বলা যেতে পারে যে, কোনও কবির বা শিল্পীর বা দার্শনিকের সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ দিক্ বিভিন্ন লোককে বিশেষ বিশেষ রসের খোরাক যোগায়। কিন্তু আসল কবি বা শিল্পী বা মানুষটি তা'র এ বিভিন্ন রূপ বা বিকাশের সমষ্টিরও অতিরিক্ত নয় কি? রাসেল প্রমুখ গভীরাত্মা মানুষের সংস্পর্শে এলে এ কথার যাথার্থ্য বোধ হয়, বেশি ক'রে উপলব্ধি করা যায়। যেমন, যে কোনও বড় লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হ'লে তাঁর লেখার দাম আমাদের কাছে যথেষ্ট বেড়ে গিয়ে থাকে দেখা যায়। তখন তাঁর প্রতি পত্রের মধ্যেই আমরা একটা নূতন অর্থ, নূতন গন্ধ, নূতন ব্যঞ্জনা আবিষ্কার না করেই পারি না। এজন্য এরূপ মহাজনের নিকট সংস্পর্শের মূল্য আমি একটু বেশি করেই ধার্য্য করার পক্ষপাতী। তাই আমি এটা আমাদের একটা পরম লোকসান মনে না করেই পারি না যে কালিদাস, সেক্সপীয়র, ডষ্টয়েভস্কি, টলষ্টয় প্রভৃতি মহাত্মাদের সঙ্গে আমরা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হ'বার সুযোগ পাইনি।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অভিজ্ঞ লোকের পক্ষে মানুষে বিশ্বাস রাখা অনেক সময়ে অসম্ভব হয়ে উঠে দেখা যায়। কারণ অভিজ্ঞতার আলোয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি জিনিষটা কল্পনা ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতার সাহায্যে মানুষের মধ্যে এমন অনেক অসারতা, নৃশংসতা ও অদূরদর্শিতার সন্ধান পেয়ে থাকে যা সাধারণ অনভিজ্ঞ বুদ্ধির চোখ সহজেই এড়িয়ে যায়। য়ুরোপে বর্ত্তমান সময়ে বুদ্ধি ও জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা শিক্ষিতদের মধ্যে আগেকার চেয়ে ঢের বেশি চারিয়ে গেছে। তাই সেখানে বিজ্ঞ লোকদের মধ্যে অনেকেই মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হ'য়ে পড়েছেন—বিশেষতঃ গত মহাযুদ্ধের পর থেকে। একটা উদাহরণ দেব।—আমি তখন প্রাগে আমার এক বান্ধবীর গৃহে অতিথি। সেখানে একদিন এক চেক্(Czech) ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। তিনি ছিলেন একজন লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক ও বাস্তবিকই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। তিনি বলছিলেন: 'মনুষ্যত্ব, millennium প্রভৃতি বড় বড় কথায় আমি বিশ্বাস করি না। আমি যা' চোখে দেখেছি, তাতেই আমার মন সাড়া দেয়। মনুষ্যত্ব আমি কখনও দেখিনি। দেখেছি—মানুষ। এখন, মানুষের মধ্যে ত চিরকালই দেখতে পাই মূঢ়তা জ্ঞানের চেয়ে বেশি, ক্ষুদ্রতা উদারতার চেয়ে প্রবল, অসারতা সারবত্তার চেয়ে বিস্তীর্ণ।' আমার ফরাসী বান্ধবী এ কথায় আপত্তি করার উপক্রম করতে না করতে তিনি বলে' উঠলেন: 'উঁহুঃ! বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বাড়লে লম্বা লম্বা কথা ও বড় বড় নীতিসূত্রে বিশ্বাস বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। কারণ, বিশ্বাস নির্ভর করে—নানান্ সত্য না জানার উপর ও তা' থেকে যথাযথ সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতার অভাবের উপর। দেখুন না কেন, এত দেশ থাকতে ফরাসী দেশেই সর্ব্ব প্রকার অবিশ্বাসের বন্যা এসেছিল। এর কারণ আর কিছুই নয়, এর কারণ ফরাসী বর্ত্তমান জগতে সব চেয়ে বুদ্ধিমান জাতি।' বর্ত্তমান য়ুরোপে সর্ব্বপ্রকার 'নাস্তিবাদ' (nihilism) যে গত যুদ্ধের পর থেকে বুদ্ধিমান্ লোকের মনকে অলক্ষিতে কতটা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে, তা'র এমন উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যেতে পারে। তবে তা নিষ্প্রয়োজন ব'লে এ প্রসঙ্গে কেবল এই কথা বলেই ক্ষান্ত হ'ব যে এরূপ অবিশ্বাসের হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেতে হ'লে সাধারণ আটপৌরে যুক্তির একটু উপরে যেতে হয়। কারণ, টাকা-আনা-পাইয়ের সঙ্কীর্ণ যুক্তির বলে সে দূরদর্শিতা অর্জ্জন করা সম্ভব নয় যার সাহায্যে মানুষ আপাতদৃষ্টির সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হতে মুক্তি লাভ করতে পারে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার অসংখ্য নৃশংসতা, পাশবিকতা, অসারতা ও মূঢ়তা সত্ত্বেও মানুষ যে কোন্ উজ্জ্বল শক্তিবলে মানুষের ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখতে পারে তা'র দৃষ্টান্ত পেতে হ'লে রাসেল, রোলাঁ, ক্রপটকিন, অরবিন্দ প্রমুখ চিন্তাবীরের কাছে যেতে হবে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার হৃদয়হীনতায় রাসেল যে একটু নিরাশ হ'য়ে পড়েছেন, এ কথার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বেই করেছি। তবে ঐ নৈরাশ্য যে তাঁর সাময়িক মাত্র এ কথা মনে করার কারণগুলি আমি আমার 'চীন সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে নির্দ্দেশ করবার চেষ্টা পেয়েছি। (৬)

(৬) আমি সে প্রবন্ধে রাসেলের যুদ্ধের আগেকার optimism ও যুদ্ধের পরেরকার pessimism নিয়ে আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা

তাই সে প্রসঙ্গের আর আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করছি। তবে এ প্রবন্ধটি শেষ করার আগে রাসেলের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কিরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগে, প্রকৃতির অবিচার সত্ত্বেও তাঁর মনে কিরূপ আদর্শবাদ বদ্ধমূল, বর্ত্তমান জগতের হাহাকার সত্ত্বেও মানুষের ভবিষ্যতে তাঁর মনে কিরূপ বিশ্বাস বিরাজমান, সে সম্বন্ধে একটি হৃদয়স্পর্শী বাণী উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।—

"The world we must seek is a world in which the creative spirit is alive, in which life is an adventure full of joy and hope, based rather upon the impulse to construct that upon the desire to retain what we possess or to seize what is possessed by others. It must be a world in which affection has free play, in which love is purged of the instinct for domination, in which cruelty and envy have been dispelled by happiness and unfettered developement of all the instincts that build up life and fill it with mental delights. Such a world is possible; it waits only for men to wish to create it.

Meantime the world in which we exist has other aims. But it will pass away, burnt up in the fire of its own hot passions; and from its ashes will spring a new and younger world, full of fresh hope, with the light of morning in its eyes."

(Roads to Freedom, শেষ অধ্যায়)

প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কার

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

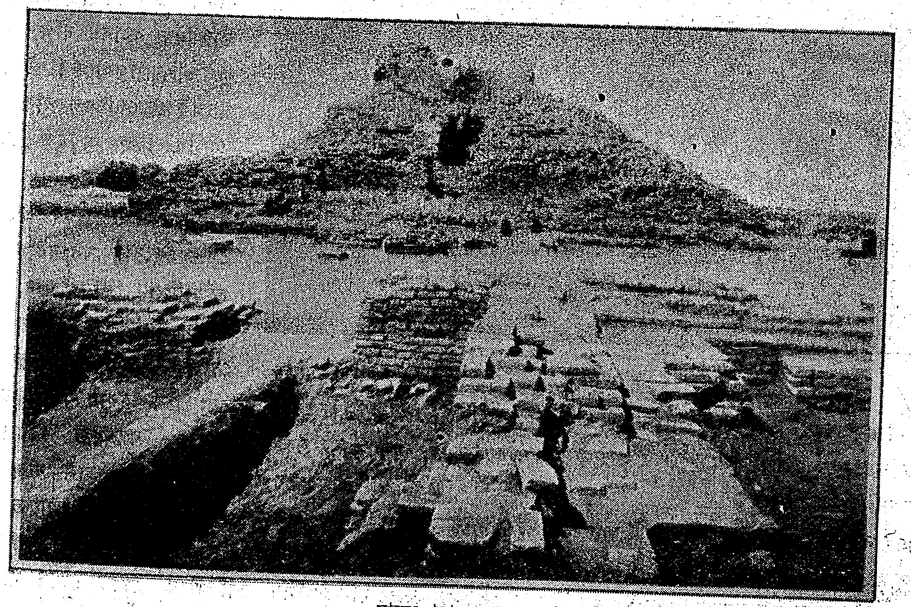

মাহেঞ্জোদারো স্তূপ

ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসের গোড়ার কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। কেহ তাহার প্রাচীনত্বকে খৃষ্ট-পূর্ব্ব দুই চারি শতাব্দী টানিয়াই শেষ করিয়াছেন; আবার কেহ বা তাহাকে টানিয়া বাড়াইয়া খৃষ্ট-পূর্ব্ব দুই চারি হাজার বৎসরে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিকদের দ্বারা প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত মাল মশলা

আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা প্রস্তর এবং তাম্র-যুগের অল্প-বিস্তর অস্ত্র-শস্ত্র, দক্ষিণ-ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েকটি কবর এবং বিহারের রাজগৃহের ভগ্ন দেয়ালের ভিতরেই একরূপ সীমাবদ্ধ। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের মত একটা দেশের আদিম যুগের ইতিহাস গড়িয়া তুলিবার পক্ষে এ মূলধন মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। এই স্বল্প মূলধনের সাহায্যে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসের একটা ভিত্তি মোটামুটি ভাবে খাড়া করা সম্ভবপর হইলেও, আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি হঠাৎ এমন দুইটি স্থানের

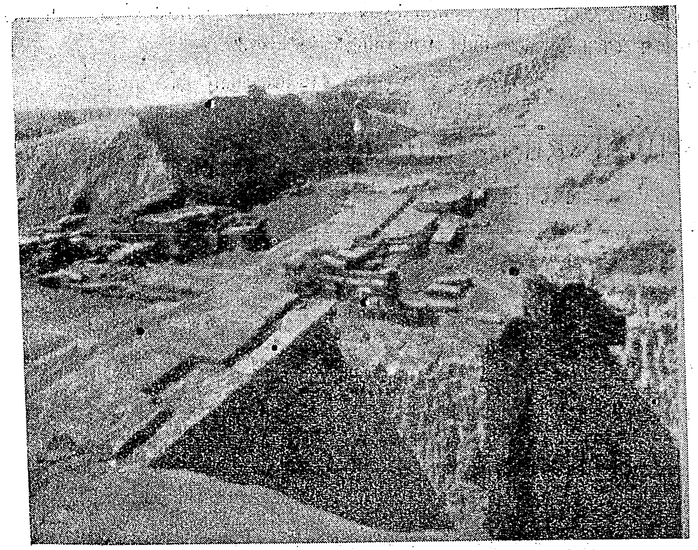

হরপ্পা স্তূপ

আবিষ্কারের খবর আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যেখানে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের বহু শত বৎসর পূর্ব্বের ধ্বংসাবশেষও গচ্ছিত আছে বলিয়া মনে হয়।

এই নবাবিষ্কৃত স্থান দুইটির একটি হইতেছে পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলার হরপ্পা, আর একটি সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার মোহেঞ্জদরো। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কেবল মাত্র পরীক্ষা হিসাবেই এই দুইটি স্থানে খননের কাজে হাত দিয়াছিলেন। খুব বেশী জিনিষ এখনও তাঁহাদের হস্তগত হয় নাই। কিন্তু যতটুকু তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গড়িয়া তোলার সম্পর্কে তাহার দামই ঢের। সুতরাং তাঁহারা মনে করিতেছেন—ভারতবর্ষের এই অঞ্চলটা ভালো করিয়া খুঁড়িতে পারিলে, ইতিহাস গড়িয়া তোলার উপাদান এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই মিলিবে,—মেসোপটেমিয়া এবং নীল নদের উপত্যকার মত সিন্ধু-নদের উপত্যকাটিও প্রাচীন সভ্যতার নিশানায় পরিপূর্ণ।

মোহেঞ্জদরো এবং হরপ্পা খননকালে দেখা গিয়াছে যে, এই উভয় স্থানের মৃত্তিকাভ্যন্তরই কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। এবং নিম্নতর স্তরগুলিতেই অধিকতর প্রাচীন কালের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। মোহেঞ্জদরোর প্রথম স্তরে যে সমস্ত জিনিষ পাওয়া গিয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর কুশান রাজাদের সমসাময়িক। পুরাতন সহরের প্রধান রাস্তাটি এখনও রাস্তা বলিয়া চেনা যায়। এই রাস্তাটি নদীর দক্ষিণ তীর দিয়া বরাবর দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। উহার উভয় পার্শ্বেই যে লোকের বাস গৃহ ছিল তাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানেই মোহেঞ্জদরোর খননের কাজ সুরু হইয়াছিল। তিনি বলেন,—রাস্তাটি নদীগর্ভে যেখানে হারাইয়া গিয়াছে, সেইখানেই সম্ভবতঃ এই লুপ্ত রাজ্যটির রাজপ্রাসাদ ছিল, এবং ঠিক ইহার বিপরীত দিকেই অধুনা-শুষ্ক নদীগর্ভে ছিল কয়েকটি দ্বীপ। এই দ্বীপগুলির ভিতর সহরের প্রধান প্রধান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধ-স্তূপ আয়ত ক্ষেত্রের একটি মঞ্চের উপর এখনও দাঁড়াইয়া আছে। বড় বড় মন্দিরগুলির চারিধারে ছোট ছোট মন্দির এবং সন্ন্যাসীদের থাকিবার মঠের চিহ্নও পাওয়া গিয়াছে।

এই প্রথম স্তরের আবিষ্কারটি অবশ্য খুব প্রাচীন নয়। তাহার পূর্ব্বের, এমন কি, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দেরও অনেক

রহস্যই ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও উক্ত সময়ের পর হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের যে যে অধ্যায়গুলি এখনও রহস্যের যবনিকার

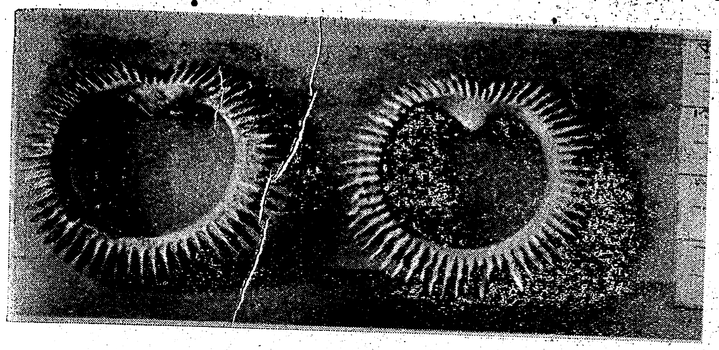

হরপ্পায় প্রাপ্ত বলয়

ন্তরালে ঢাকা আছে—এই কুশানদের াজত্ব-কাল তাহাদেরই অন্যতম। সুতরাং ই নূতন আবিষ্কার ইতিহাসের এই অন্ধ-ার অংশটাতেও যথেষ্ট আলোকের রেখা-াত করিতে সমর্থ হইবে। মৃতদেহের ভস্মাবশেষ রক্ষা করিবার আধার, ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী অক্ষরে লেখা চিত্রবহুল ফ্রেসকো, নূতন ধরণের মুদ্রা প্রভৃতি যে ব জিনিষ সেখানে পাওয়া গিয়াছে, সে সমস্তই সেই যুগের ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ।

কিন্তু প্রথম স্তরের এই উপাদানগুলি যতই মূল্যবান হোক্ না কেন, তাহা অপেক্ষাও ঢের বেশী মূল্যবান তাহার নীচের স্তরের উপাদানগুলি। হরপ্পার খনন কার্য্যের নেতৃত্ব রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহানি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর সাহানি ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দ্বয়ের চেষ্টাতেই এই বিস্ময়কর আবিষ্কার হইয়াছে; এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

বৌদ্ধ-যুগের এই ধ্বংসগুলির বহু নিম্নে আরো দুইটি স্তর এই খননের ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং সেখানে ইহা অপেক্ষাও বহুশত বৎসরের প্রাচীন যুগের দ্রব্যের সন্ধান মিলিয়াছে। সে যুগ যে কত প্রাচীন, তাহা অনুমান করিয়া লওয়া ছাড়া, নিশ্চয় করিয়া বলা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এই স্তর দালান, কুঠুরী, প্রবেশ-দ্বার প্রভৃতির ধ্বংসস্তূপে পরিপূর্ণ। এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা ধ্বংসাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, যাহার দেওয়াল চওড়ায় প্রায় সাত আট ফিট হইবে। এই সব দেয়ালের গায়ে অনেকগুলি পয়ঃ-প্রণালীর মত ছিদ্র আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলিতেছেন, এ দেয়াল দেব মন্দিরের। পয়ঃ-প্রণালীগুলি দেবতাকে স্নান

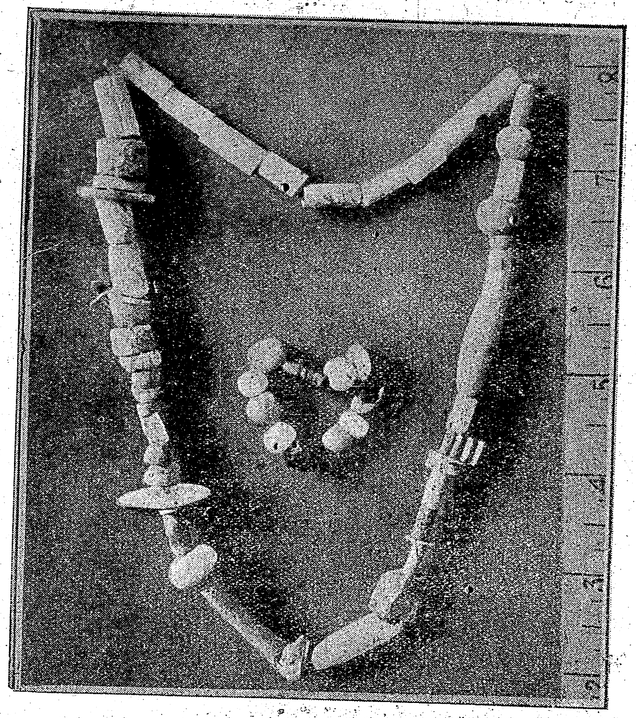

মোহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত কণ্ঠহার

করানোর পর জলনির্গমের পথরূপে ব্যবহৃত হইত। স্থানে স্থানে পালিশ-করা ইটের দ্বারা ই

পাওয়া গিয়াছে। এগুলিতেও পূর্ব্বের ন্যায় পয়ঃপ্রণালীর চিহ্ন বিদ্যমান।

হরপ্পা খননেও অন্ততঃ সাত আটটি স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৃতীয় খৃষ্টাব্দের বহু শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে যে এখানে সমৃদ্ধিশালী নগরের গোড়া-পত্তন হইয়াছিল, এই আবিষ্কারের পর সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহেরই আর অবকাশ নাই। বাসের জন্য যে সকল গৃহ ব্যবহৃত হইত, তাহার গাঁথনিও ছিল পাকা, পোড়ানো এবং ভাল মশলার তৈরী ইটের! হরপ্পাতে রেলওয়ে কোম্পানীর অনুগ্রহে ধ্বংস স্তূপের অবস্থা মোহেঞ্জদরো অপেক্ষাও শোচনীয়। আবিষ্কৃত জিনিষের অধিকাংশই

মাহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত মৃৎপাত্র

মাহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত সিলমোহর

টুক্‌রো টুক্‌রো অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ছোটখাট জিনিষগুলির চেহারা উভয় স্থানেই প্রায় এক রকমের। কতকগুলি মাটির পাত্র এই সব ধ্বংস স্তূপের ভিতর পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের গড়নও সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। তাহাদের ভিতর হাতে তৈরী এবং চাকে তৈরী, চিত্রিত এবং অচিত্রিত সব রকমের পাত্রই আছে। তাহা ছাড়া মাটির মূর্ত্তি, খেল্‌না, নীলকাচের বালা, নূতন ধরণের মুদ্রা, ছুরি, পাশা, দাবার ঘুঁটি, এক নূতন ধাঁচের পাথরের আংটি, খোদাই-করা সিল-মোহর—এ সমস্ত জিনিষও অনেক পাওয়া গিয়াছে। উপরের স্তর ছাড়া নীচের স্তর লোহার জিনিষ এখনও কিছুই পাওয়া যায় নাই।

এই সব আবিষ্কারের ভিতর সিল-মোহরগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। চিত্রাঙ্কর ইহার গায়ে যে সব মূর্ত্তি খোদাই করা আছে, তাহার পরিচয় এখন পর্য্যন্তও জানা যায় নাই। তাহা ছাড়া, খোদাই করিবার ধরণ এবং খোদিত মূর্ত্তিও সম্পূর্ণ নূতন রকমের,—ভারতীয় শিল্প কলায় এ ধরণের নমুনা আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। মোহরগুলি কতক বা পাথরের, কতক বা হাতীর দাঁতের এবং কতক গ্লাস্ পেটের তৈরী—অধিকাংশের আকৃতিই চতুষ্কোণ। অঙ্কিত পশুগুলির চেহারা কোনটিতে ষাঁড়ের মত, কোনটিতে বা ইউনিকর্ণের মত। উন্নত ককুদযুক্ত ভারতীয় ষাঁড় বা জলহস্তীর চেহারা কোথাও নাই।

যে সব ছবি দ্বারা অক্ষরের কাজ করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে তিনটি জিনিষ বিশেষ ভাবে

লক্ষ্য করিয়া দেখার উপযুক্ত। প্রথমতঃ অধিকাংশ ছবির রেখাই বেশ উন্নতিশীল যুগের ছবির রেখার মত। দ্বিতীয়তঃ, মোহেঞ্জদরোর কতকগুলি লিপি হরপ্পা অপেক্ষা অক্ষরমালার উদ্বর্ত্তনের পথে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগের জিনিষ। তৃতীয়তঃ, আমাদের জানা প্রাচীন ভারতের কোন অক্ষরমালার সঙ্গেই তাহার সাদৃশ্য নাই। পক্ষান্তরে তাহাদের চেহারা মাইকেনিয় যুগের চিত্রাক্ষরের চেহারার সঙ্গে অনেকটা মেলে।

উক্ত স্থানদ্বয়ে প্রাপ্ত চিত্রাঙ্কিত সিলমোহর

এই সব চিত্রাক্ষর যে কেবল মোহরের উপরই পাওয়া গিয়াছে তাহা নহে,—তাহা ছাড়া অনেকগুলি তামার পাতের উপরেও পাওয়া গিয়াছে। এই তামার টুক্‌রাগুলি খুব সম্ভব মুদ্রা রূপেই ব্যবহৃত হইত, যদিও ওজনে ইহাদের সহিত প্রাচীন ভারতের কোন মুদ্রারই কোনরূপ সাদৃশ্য নাই। এ অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে এই মুদ্রাগুলিই সম্ভবতঃ জগতের আদিমতম মুদ্রা বলিয়া গণ্য হইবে। কারণ, এ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রাচীন মুদ্রার নমুনা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের ভিতর প্রাচীনত্ব হিসাব লীডিয় মুদ্রার দাবীই সকলের উপরে এবং এই লীডিয় মুদ্রাগুলিও খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতকের জিনিষ। মোহেঞ্জদরোর এই তাম্রখণ্ডগুলি যে সপ্তম শতকের অনেক আগের জিনিষ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মোহেঞ্জদরোর আবিষ্কারে আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় ধরা পড়িয়াছে—সেটি প্রাচীন ভারতের মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা। অতি প্রাচীন যুগে মৃতদেহকে বক্র ভাবে শোয়াইয়া সাধারণতঃ চতুষ্কোণ ইষ্টকাধারের ভিতর সমাহিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্ত্তী যুগের যে ব্যবস্থার পরিচয় এখানে পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পরবর্ত্তীকালে মৃতদেহকে পোড়াইয়া তাহার ভস্মাবশেষ একটি ছোট পাত্রে রাখিয়া এইরূপ একাধিক পাত্র একটি গোলাকার পাত্রের ভিতর সমাহিত করা হইত। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য পোষাক প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ আর দুই চারিটি অতি ক্ষুদ্র পাত্র দেওয়ার প্রথাও ছিল।

এই আবিষ্কারের পর সাধারণতঃ দুইটি প্রশ্ন প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের জিজ্ঞাসু মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।—প্রথম এই সব জিনিষ কোন যুগের, অর্থাৎ খৃষ্টের কত শত বৎসর পূর্ব্বে এগুলি তৈরী হইয়াছিল? দ্বিতীয়, যাহারা এই সব জিনিষ গড়িয়াছিল, তাহারা কোন জাতীয়, অর্থাৎ কোন্ সভ্যতার স্তরে তাহাদের জন্ম?

এই দুইটি প্রশ্নের কোনটিরই উত্তর বর্ত্তমানে নির্ভুল ভাবে প্রদান করা সম্ভবপর নহে। আরও নূতন নূতন আবিষ্কারের উপর এ দুটি প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করিতেছে। তবে প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে এই উত্তর দেওয়া যায় যে, সিন্ধু নদের উপত্যকায় আজ যে সভ্যতার নমুনাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দুই একশত বৎসরের ফল নহে। বহু শত বৎসর ধরিয়া তাহা প্রসার লাভ করিয়াছিল, এবং খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয়শতকে মৌর্য্যদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই তাহার যবনিকা পড়িয়া গিয়াছিল। গৃহগুলির

চেহারা দেখিয়া এ সত্য যেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, তাম্র নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রের প্রাদুর্ভাব এবং লৌহের সম্পূর্ণ অসদ্ভাব প্রভৃতি ব্যাপারও সেই সত্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করে। ইট বা দুই একটি পুতুল ছাড়া, মৌর্য্য বা তাহার সমসাময়িক যুগের অন্য কোন জিনিষের সঙ্গে এখানকার আবিষ্কৃত জিনিষগুলির কোনোরূপ সাদৃশ্য নাই। মৌর্য্যদের সময় পর্য্যন্ত যদি এ সভ্যতা বাঁচিয়া থাকিত, তবে এরূপ অদ্ভুত সাদৃশ্যহীনতা কখনও সম্ভবপর হইত না। তাহা ছাড়া, ইহাদের চিত্রাক্ষরও রাজা অশোকের ব্রাহ্মী অক্ষর বা তাঁহার ব্যবহৃত উত্তরপশ্চিম সীমান্তের খরোষ্ঠি অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই সব প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ কথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে, এই নবাবিষ্কৃত জিনিষগুলি মৌর্য্য অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বের জিনিষ। বহু শত বৎসর ধরিয়া যে এ সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোন উপায় নাই। কারণ এই জিনিষগুলির নির্ম্মাণের ভিতর এমন নৈপুণ্য, পারিপাট্য এবং শিল্পজ্ঞানের পরিচয় আছে যে, দুই চারি শত বৎসরের সাধনায় তাহা লাভ করা যায় না।

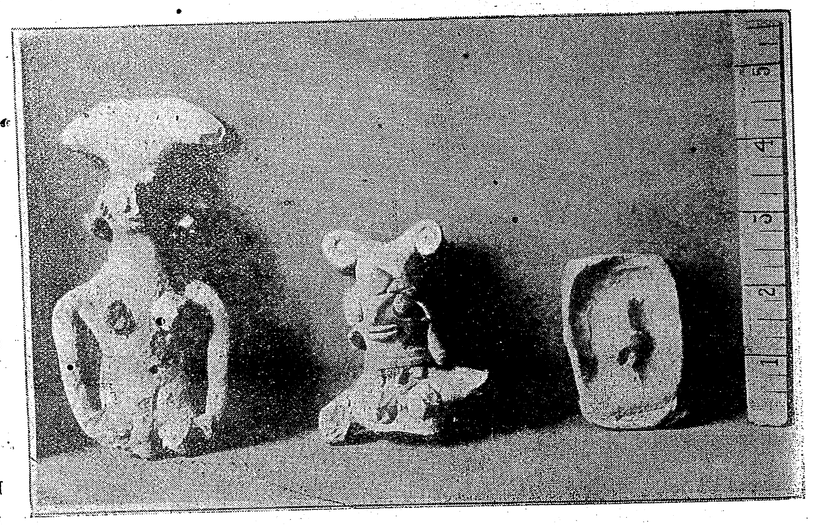

হরপ্পায় প্রাপ্ত মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মূর্ত্তি

মিঃ সি, জে গ্যাড এবং মিঃ সিড্‌নি স্মিথ ইজিপ্ট ও আসেরিয়ার প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া অসামান্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত একটি প্রবন্ধ গত ৪ঠা অক্টোবরের Illustrated London News পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত প্রাচীন শিল্পাবশেষের পাশাপাশি ব্যাবিলনের শিল্পাবশেষের ছবিগুলিও ছাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উভয় শিল্পাদর্শের ভিতরকার সাদৃশ্য অদ্ভুত। হরপ্পাতে যে সব মোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে, আকৃতিতে তাহারা অবিকল মুসা ও ব্যাবিলনের আবিষ্কৃত চতুষ্কোণ মোহরের অনুরূপ। সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত বৃষের চেহারা ও ব্যাবিলনের আবিষ্কৃত বৃষের চেহারার ভিতরেও বিশেষ প্রভেদ নাই। অন্ততঃ তাহার শিং, স্কন্ধ, ককুদ্—এগুলি একেবারেই অভিন্ন। হরপ্পা মোহরে লেখার পরিবর্ত্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারও অনেকগুলির সহিত সুমেরিয়ান চিত্রাক্ষরের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সংখ্যাবাচক অক্ষরগুলির ভিতরেও এই সাদৃশ্য নিতান্ত অল্প নহে। ব্যাবিলন এবং মুসার এই সব মোহর খৃষ্টের জন্মের ৩০০০—২৮০০ বৎসর পূর্ব্বে তৈরী হইয়াছিল বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং সিন্ধু উপত্যকার এই সভ্যতা ব্যাবিলনের এই সভ্যতা হইতে প্রাচীনতর কি না সে সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা না গেলেও, খৃষ্টজন্মের৩০০০—২৮০০ বৎসর পূর্ব্বে যাহারা সুমেরীয় সভ্যতাকে পুষ্ট করিয়াছিল, তাহাদের সহিত, সিন্ধু উপত্যকায় যাহাদের মোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের যে ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মোহর ছাড়াও আরো অনেক জিনিষের ভিতর দিয়া

এই দুইটি জাতির পরস্পরের পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। মোহেঞ্জদরোতে যে স্তম্ভাকার 'হেমাটাইট্' আবিষ্কৃত হইয়াছে, ব্যাবিলনে খৃষ্ট জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেও তাহা ব্যবহৃত হইত,—ছোঁট ছোট জিনিষের ওজন রূপে। পাথরের যে জিনিষটা ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অগ্নি-মন্দিরের দণ্ড বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা ব্যাবিলনের Mace Headএর অনুরূপ। ভারতে যেমন ইহাদের আকার এবং ওজনের কোনও স্থিরতা নাই, ব্যাবিলনেও তেমনি ইহার আকার এবং ওজনের ভিতর যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। মন্দির-চত্বালে এগুলি সম্ভবতঃ উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইত। সুতরাং উভয় সভ্যতার ভিতর যে একটা যোগাযোগ ছিল, এই অগ্নি মন্দিরের সম্পর্কেও আর একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। নক্সা-কাটা ও সাদা-

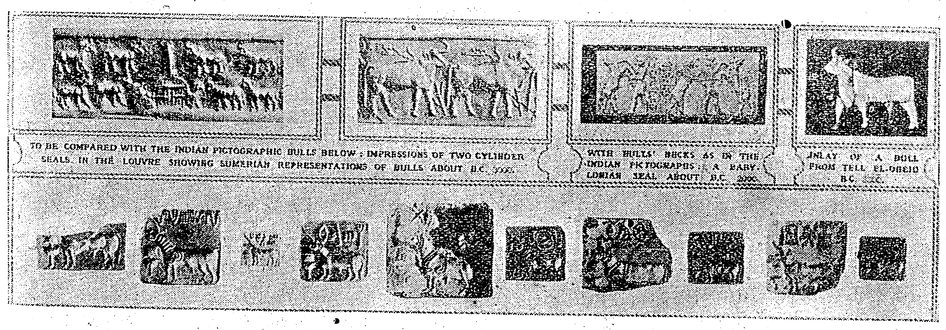

মাহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত বৃষমূর্ত্তি-অঙ্কিত সিলমোহর

শিল্প শঙ্খ ব্যাবিলন সভ্যতার একটি অঙ্গ ছিল, এই ধরণের শঙ্খ সিন্ধু উপত্যকাতেও পাওয়া গিয়াছে। মোহেঞ্জদরোর একটি মোরগের প্রতিকৃতি ব্যাবিলনের সীমান্ত প্রদেশে আবিষ্কৃত একটি পাখীর অবিকল অনুরূপ। ব্যাবিলনের এই পক্ষীটির চিত্র খৃষ্টের অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের আঁকা। এই উভয় স্থানের অট্টালিকা, পয়ঃ-প্রণালীর গঠন, পালিশ-করা ইটের নক্সা—এগুলির ভিতরেও সাদৃশ্য কম নহে। এ সমস্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই দুইটি প্রাচীন জাতির পরস্পরের পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি কতকগুলি নূতন আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় আর্য্যদের সহিত অতি প্রাচীন যুগেও মেসোপটেমিয়ার ঘনিষ্ট সংশ্রব ছিল—এ ধরণের একটা ধারণা প্রত্নতাত্ত্বিকদের মনে বদ্ধমূল হইবার সুযোগ পাইয়াছে। খৃষ্টের জন্মের ১৪০০—১২০০ বৎসর পূর্ব্বে মেসোপটেমিয়ায় যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহার ভিতর হইতে অশ্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহারা কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের সন্ধান পাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, ঠিক এই সময়েই মেসোপটেমিয়াতেও ইন্দ্র, বরুণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যে পূজা হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং মেসোপটেমিয়ার সহিত ভারতীয় আর্য্যদের যে একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা একরূপ বিনা বাদ-প্রতিবাদেই মানিয়া লওয়া যায়। তবে খৃষ্ট জন্মের ৩০০০—২৮০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যাহারা সুমেরিয়ানদের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহারই এই মেসোপটেমিয়ার পরিচিত আর্য্য কি না, বর্ত্তমান আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিয়া তাহা বলা যায় না। সেজন্য আরও নূতন আবিষ্কারের ও নূতন প্রমাণের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, মোহেঞ্জদরো এবং হরপ্পাতে যাহারা সভ্যতার নিদর্শনসমূহ পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহারা কোন্ সভ্যতার স্তরে বাড়িয়া উঠিয়াছিল? এ প্রশ্নের উত্তরেও কোনো কথা আজও জোর করিয়া বলা চলে না। কেহ কেহ মনে করিতেছেন, এই সভ্যতা বাহিরের আমদানী; আবার অনেকের মতে, সিন্ধু নদের উপত্যকাতেই এই সভ্যতা জন্মগ্রহণ করিয়া পুষ্টি-লাভ করিয়াছিল। এই মত-বৈষম্যের মীমাংসা করা আজ সম্ভবপর না হইলেও, শেষোক্ত মতই অপেক্ষাকৃত সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ, দুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের পাতাগুলি উল্টাইলেই দেখা যায় যে, বড় বড়

নদীর উপত্যকাতেই এক একটি নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। ডানিউব, নীলনদ, ইউফ্রেটিস্, টাইগ্রীস্—ইহাদের প্রত্যেকের কাছেই সভ্যতার গোড়া-পত্তনের জন্য মানুষের ঋণের পরিমাণ আজ প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিক্তিতে ধরা পড়িয়াছে। কেবল মাত্র সিন্ধু নদ এবং গঙ্গা নদীর কাছে তাহাদের ঋণের পরিমাণ আজিও অজ্ঞাত। হরপ্পা এবং মোহেঞ্জদরোতে যে সভ্যতার নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, বাহিরের আনাগোনা হয় তো সে সভ্যতাকে খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু সিন্ধুর উপত্যকাতেই যে তাহার জন্ম, তাহা একেবারে অসম্ভব না-ও হইতে পারে। বরং যে সমস্ত কারণের উপর নির্ভর করিয়া কোন দেশের সভ্যতার ভিত্তি গড়িয়া উঠে, সেগুলির দিকে নজর দিলে, সিন্ধুর উপত্যকাই ইহার জন্ম-কেন্দ্র বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ সম্বন্ধে এই স্বল্প আবিষ্কারের জোরে কোন কথাই আজ জোর করিয়া বলা যায় না।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধের উপকরণ ও চিত্রাদি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সার জন মার্শাল সাহেবের লিখিত প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইল।

আলো

শ্রীঊর্ম্মিলা দেবী

কঠিন বচন শাসন করিছে,
ভাল মোর সেই ভালো।
ভব-কারাগারে মোহ অন্ধকারে,
আলো মোর সেই আলো।
আমার যে কেহ ছিল আত্মপর,
সকলে মিলিয়া দিল অবসর,
অদৃষ্টের পরে করিয়া নির্ভর
তরণী আমার ভাসিল।
তীরের বাঁধন কাটিল এবার
ভাল মোর সেই ভালো,
মায়া-কারাগারে মোহের আঁধারে,
আলো মোর সেই আলো।
আদান প্রদান সাঙ্গ হইল কি?
হিসেব পত্তরে কিছু নেই বাকী?
মোর দান যত আগাগোড়া ফাঁকী
পেয়েছে যে, সে কহিল?
ঋণী রহিলাম সকলের কাছে,
ভাল মোর সেই ভালো,
মোহ কারাগারে ভবের আঁধারে
আলো মোর সেই আলো।
আর বাধা কোন নাই এ ভুবনে,
অশ্রুজল কারো ঝরেনা নয়নে,
আমারও তরণী মধুর পবনে,
অজানার পথে চলিল।
তীর হ'তে কেহ ডাকিবেনা ফিরে
ভাল মোর সেই ভালো।
মায়া-কারাগারে মোহের আঁধারে
আলো মোর সেই আলো।
চিনিয়াছি পথ গহন তিমিরে,
চলিয়াছি তাই শ্রান্তি ভরে ধীরে,
আজি এ সন্ধ্যার মৃদুল সমীরে,
জীবন আমার জুড়াল।
অকূলের মাঝে দিল যে ভাসায়ে,
ভাল মোর সেই ভালো।
ভব-কারাগারে মোহের আঁধারে
আলো মোর সেই আলো।
হে জগৎবাসি! তোমরা যে কেহ,
দেখাইয়া দিলে কোথা মোর গেহ,
সার্থক করেছ মোর এই দেহ,
আমারও আশা পূরিল!
সংসার যখন ত্যজিল আমারে,
ভালো মোর সেই ভালো।
মায়া-কারাগারে মোহের আঁধারে
আলো মোর সেই আলো।
কোথা আছ তুমি ওগো বিশ্বরাজ!
সমাপন করি সংসারের কাজ,
শ্রান্ত পথিক আসিয়াছে আজ
দেখাও তোমার আলো।
চির অন্ধকার ঘুচিল এবার,
ভালো মোর সেই ভালো,
ভব কারাগারে মোহের বিকারে
আলো মোর সেই আলো।

উৎসবে সমবেত মহারাজা ও তাঁর অনুচরবর্গ

ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত হিমালয়ের উপত্যকার মধ্যে যতগুলি দেশ আছে, প্রাকৃতিক সৌষ্ঠবে তাহার কোনটিই ভূটানের সমকক্ষ নহে।

ভূটানের সম্ভ্রান্ত পরিবার

ভূটানের উচ্চশৃঙ্গ পর্ব্বত-মালাকে যে গম্ভীর ও অবসর্পি গিরিবর্ত্মগুলি বেষ্টন ক'রে আছে, সে যেন "দ্যুয়ার্সের" সমতট থেকে তিব্বতের অধিত্যকার উপর যাবার জন্য প্রকৃতির স্বহস্ত-রচিত অধিরোহণীর মতো! এই সমুদায় পার্ব্বত্য-ভূভাগ একেবারে শিখরদেশ পর্য্যন্ত শ্যামল বন-শোভায় সমাচ্ছাদিত। ঝাউ ও দেবদারুর নিবিড় অরণ্য একেবারে পর্ব্বতের তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আট নয় হাজার ফুট উপরেও পুষ্পিত ওকবৃক্ষ ও নানা বিচিত্র বর্ণের কুসুমতরুরাজি দেখিতে পাওয়া যায়। একাধিক খরস্রোতা গিরি-নির্ঝরিণী তাদের পাষাণ-অবরোধ ভেদ ক'রে উদ্দাম উচ্ছ্বসিত বেগে ছুটে এসে ব্রহ্মপুত্রের প্রসারিত বিশাল বক্ষের উপর লুটিয়ে পড়েছে। এই সব নদীতটের নিম্ন-ভূমিতে সুদৃশ্য সুন্দর ঘন বেণুবন ছাড়াও যেসব বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি অয়নান্ত-বৃত্তমধ্যস্থ-প্রদেশেরই বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ, তাহাও এখানে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভূত হয়। এবং এই সব পার্ব্বত্য-নিকুঞ্জ ও নদীতট-বনের শোভা শতগুণে বৃদ্ধি ক'রে রেখেছে, এদেশের অপূর্ব্ব প্রজাপতির বিচিত্র বরণোজ্জ্বল সদা-চঞ্চল পক্ষপুট! অসীম অনন্ত বিচিত্র প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্যে ভূটান যেন কোন সুরলোকের অমরাবতীর তুল্য নয়নাভিরাম !

হিমালয়ের ঊর্দ্ধতম প্রদেশে যতদূর দৃষ্টি যায়, তার প্রত্যেক স্তরটি যেন ভূটানের ভৌগোলিক বিশেষত্বের নিদর্শন ধারণ ক'রে দাঁড়িয়ে র'য়েছে বলে মনে হয় ; তার পরই চ'খে পড়ে তিব্বতের শুভ্র সমুজ্জল তুষার কিরীট ! ভূটানের পার্ব্বত্য-উপত্যকার মাঝামাঝি উঠে দাঁড়িয়ে দেখলে, একসঙ্গে এই দুই বিপরীত দৃশ্য দৃষ্টি-গোচর হয়,—উপরে অভ্রভেদী তুষারমৌলিগিরিশৃঙ্গ, নিয়ে বিচিত্র শ্যামল বনভূমি !

কিন্তু ভূটানের পথ-ঘাটগুলি বেশ নিরাপদ ও সুগম নহে। পথিককে সহসা আক্রমণ করে হুল ফোটাবার জন্য বা দংশন করবার জন্য অনেক রকমের কীট-পতঙ্গ পথের আশে-পাশে ঝোপে-ঝাড়ে ওত পেতে বসে থাকে। বিশেষ ভূটানে জোঁকের উৎপাত এত বেশী যে মানুষ বা পশু কেউ তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ক'রে চলতে পারে না।

ভারত-সরকারের কাছে, ভূটানের একটা রাজ-নৈতিক

মন্ত্রিসভা

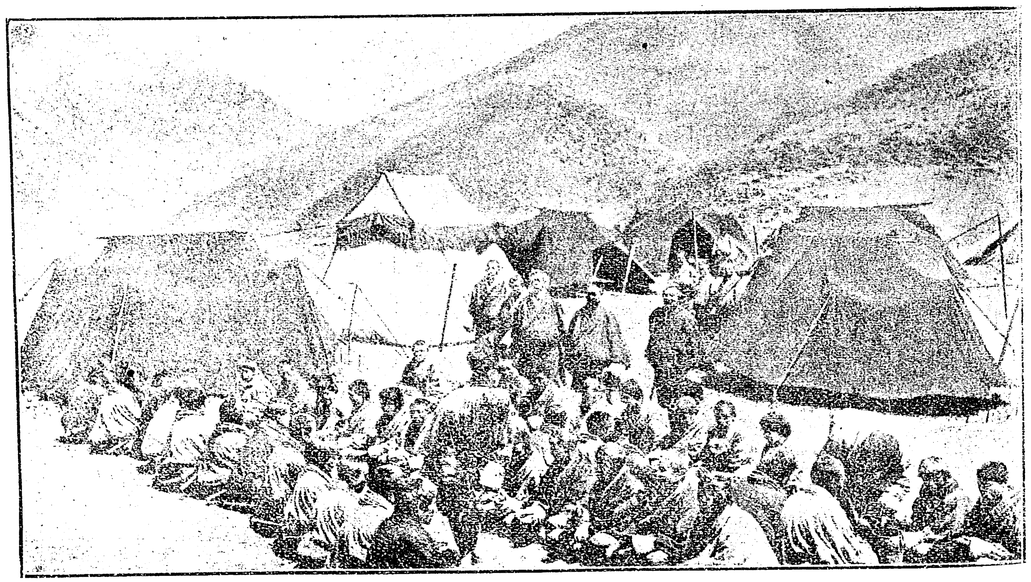

লিঙ্‌জী (১৫০০০ ফুট উচ্চে তুষারাচ্ছন্ন লিঙ জী গিরিশৃঙ্গে তাঁবু খাটিয়ে একদল ভূটানী বিশ্রাম করছে।)

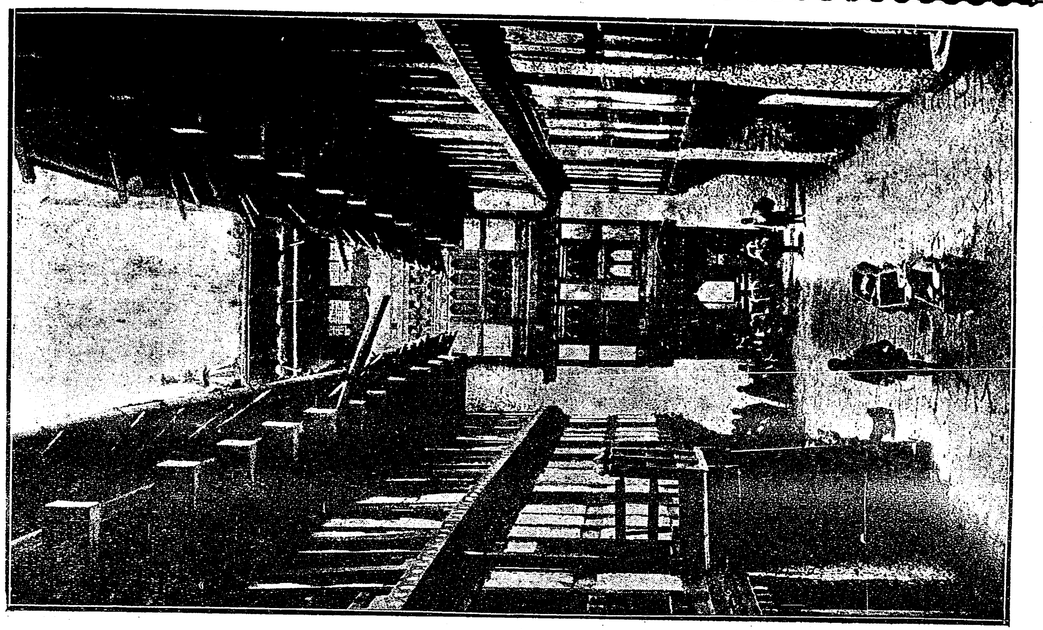

রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ

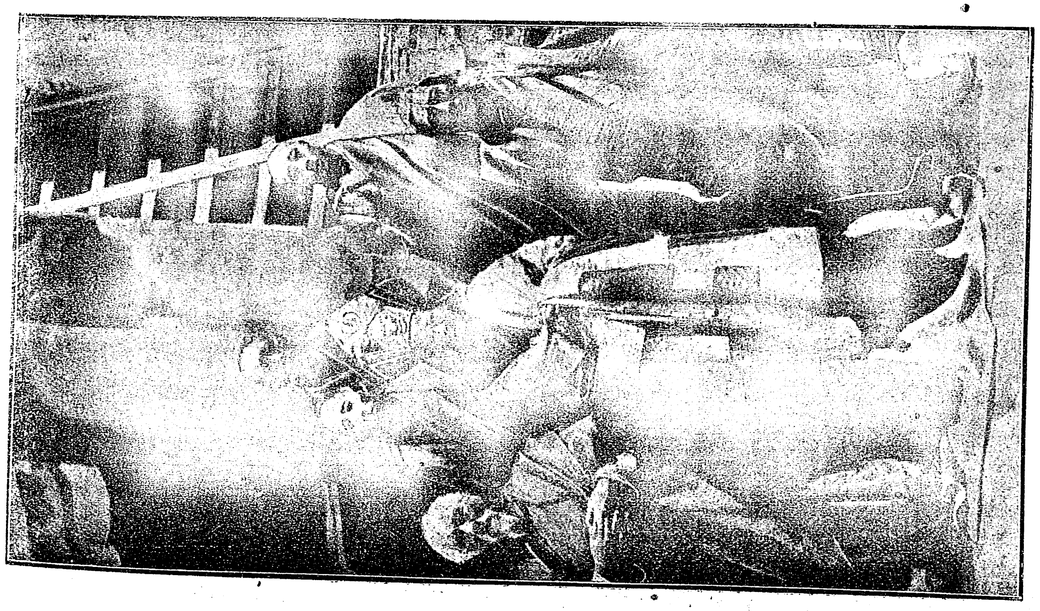

বৌদ্ধ দেবরাজ অবতার থালিঙ ও তাঁর প্রধান শিষ্যগণ

রক্ষি-পরিবেষ্টিত মহারাজ

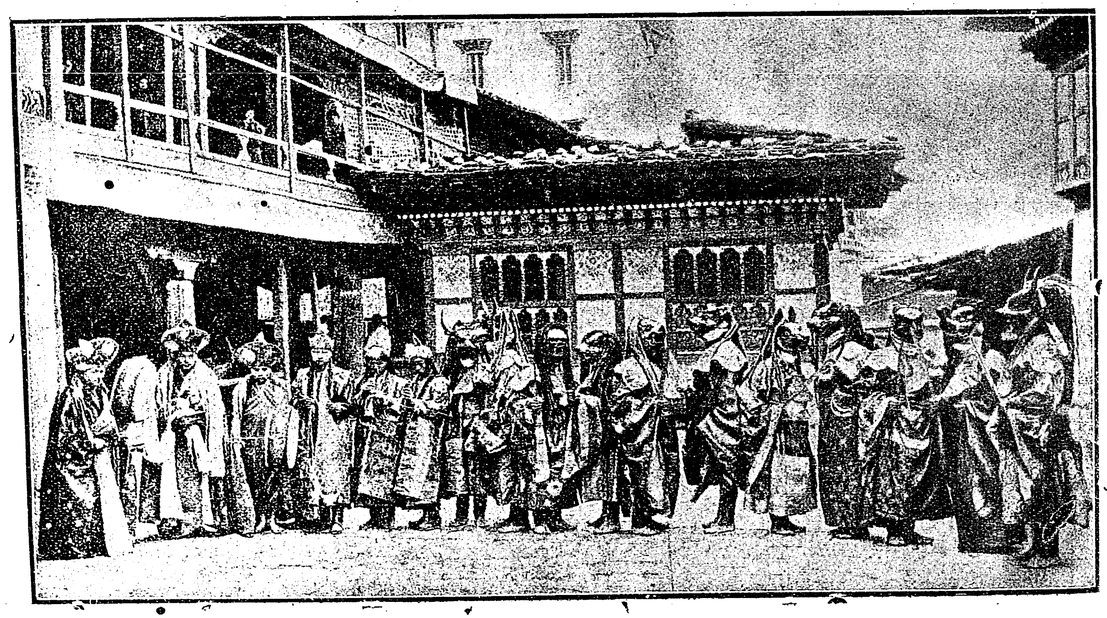

ভূটানের মুখোস্ পরা নাট্যসম্প্রদায়

বিশেষত্ব আছে, কারণ এইটি ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতে যাবার একটি প্রধান প্রবেশদ্বার। বিশেষতঃ পশ্চিমে বুক্‌শার পথ ও পূর্ব্বদিকের দ্বারবান গিরিপথ এ-দুটি একেবারে হিমালয় থেকে সোজা পুণাক্ষ পর্য্যন্ত চলে এসেছে। পুণাক্ষ ভূটানের প্রধান সহর। এইটিকেই রাজধানী বলা যেতে পারে, কেন না শাসন-বিভাগের আস্তানা এই সহরেই প্রতিষ্ঠিত।

তিব্বতের সঙ্গে আসামের যেটুকু কারবার চলে, সে এই পুণাক্ষ সহরের মারফতেই সুসম্পন্ন হয়। ভূটানের স্থানীয় ব্যবসা বিশেষ কিছুই নাই বলিলেও চলে। মোটা

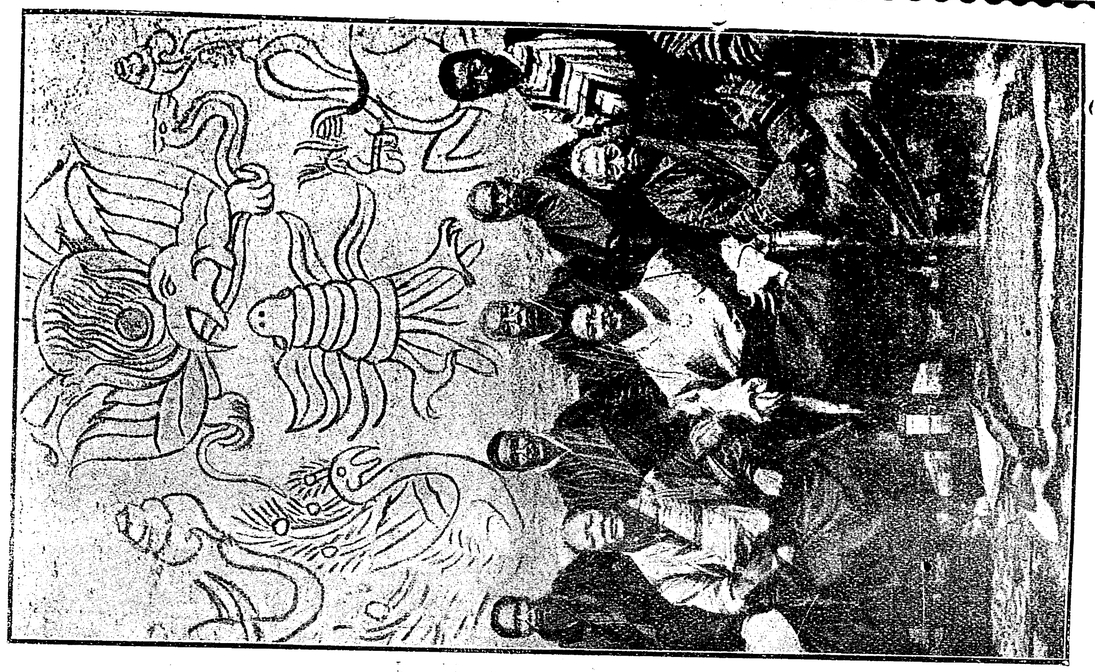

সপারিষদ রাজা

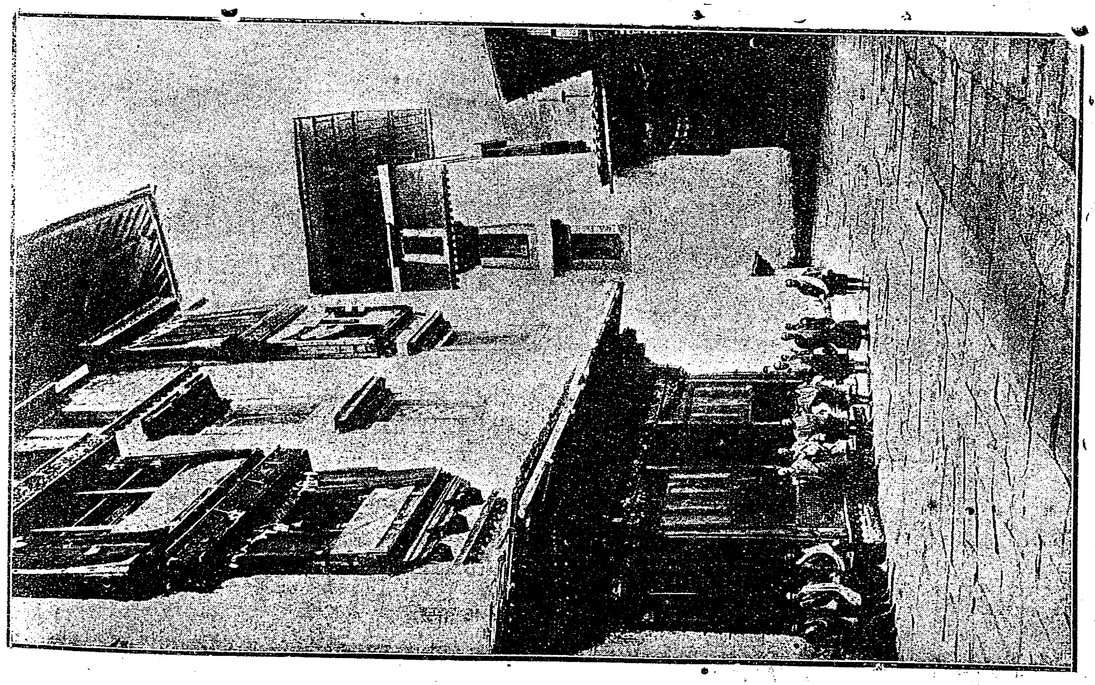

ফেরীজোড় দুর্গ

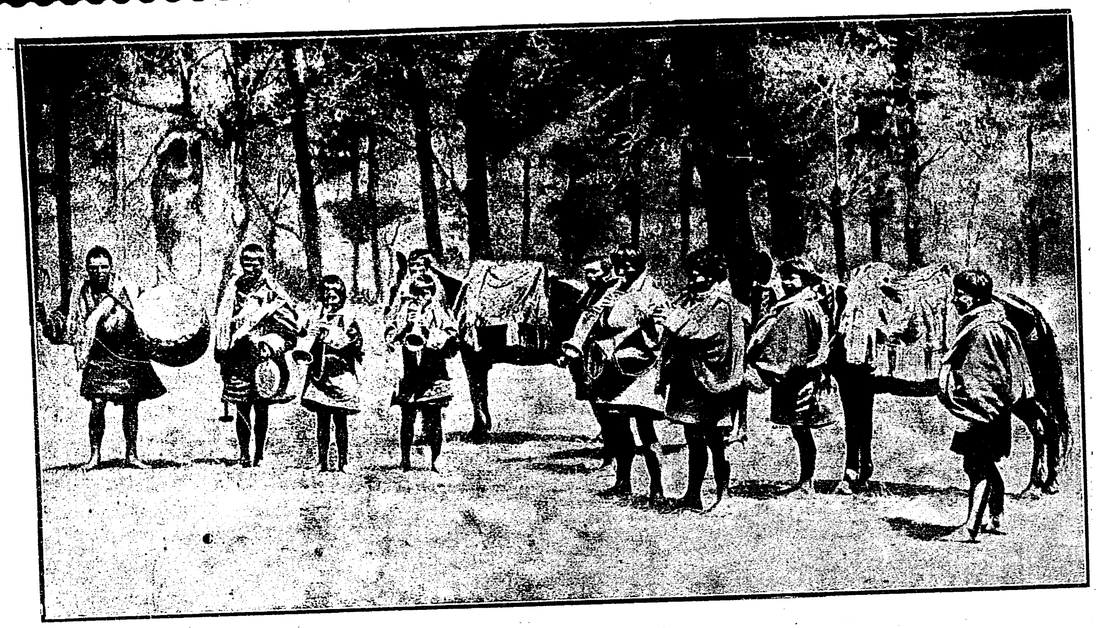

রাজপ্রাসাদের বাদক সম্প্রদায়

লামাদের নৃত্য-গীত ও বাদ্য

কম্বল, সূতির কাপড়, চামড়া আর লোহার জিনিস ছাড়া অন্য কিছু বড় একটা সেখানে উৎপন্ন হয় না, এবং এসবও যে পরিমাণে উৎপন্ন হয় তা দেশের প্রয়োজনের পক্ষেই যথেষ্ট না হওয়ায় রপ্তানী বা চালান যাবার জন্য কিছুই থাকে না।

দ্বারবান গিরিপথ আজকাল বড় একটা ব্যবহৃত হয়

না; কারণ এ-পথের উপস্থিত কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই; তবে ভবিষ্যতে হয়ত' কোনও দিন এই পথই একটা প্রধান রাজপথ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে; যদি একে 'মানস' নদীর গতি অনুসারিণী করে দেওয়া যায়, তাহ'লে এই পথটাই হবে তখন তিব্বতে যাবার,—তিব্বতে কেন,

দেবরাজ (ভূটানের অধ্যাত্ম-জগতের প্রধান প্রতিনিধি)

একেবারে 'লাশা' যাবার সব চেয়ে সিধে রাস্তা! 'মানস' হ'চ্ছে ভূটানের প্রধান নদী; তিব্বতের বৃহত্তম হ্রদ 'যমোদ-কোৎস' থেকে মানসের উৎপত্তি।

ভূটানী বা ভুঁটিয়ারা তিব্বতীদেরই জাত-ভাই। মাত্র দু'শতাব্দী আগেও পশ্চিম ভূটানের সমস্ত প্রদেশটা 'তেফু' ব'লে একজাতীয় লোকের অধিকারে ছিল। তেফুরা খুব সম্ভবতঃ কুচবিহারের একদল বর্ব্বর পার্ব্বত্য অধিবাসীদের শাখা-প্রশাখা ছিল; কিন্তু তিব্বতের সৈন্যদল তাদের বিতাড়িত করে সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলটা দখল ক'রে নিয়েছিল। এবং সেই থেকে ওদিকটা তাদেরই অধিকারে র'য়ে গেছে।

উচ্চশ্রেণীর ভুটিয়ারা সকলেই যেন আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্র ও আচার ব্যবহারে একেবারে হুবহু তিব্বতীদের মতো! তাদের ঘর-বাড়ী, দেবমন্দির, আশ্রম সবই অতি সুন্দর কারুকার্য্যে খচিত। কাঠের কাজ তারা ভারি সুচারুরূপে করতে পারে। তাদের কাঠের বাড়ীর সামনের খোদাইয়ের কাজ এত চমৎকার যে, দেখলে অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। শুধু তাই নয়, পাহাড়ের এমন সব অসম্ভব জায়গাতেও তারা বাড়ী তৈরী করতে পারে, যে তাদের বুদ্ধির ও দক্ষতার প্রশংসা না করে থাকা যায় না। তারা বিদেশীদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করে না, এবং অতিথি-সৎকারে কোনও দিনই বিমুখ হয় না, যদি ঠিক বন্ধুভাবে তাদের কাছে পৌছানো যায়।

ভূটানীরা চাষ-বাস ক'রতেও বেশ পটু। তারা নানা রকম উৎকৃষ্ট শাক-সব্জী উৎপাদন ক'রে, বিশেষতঃ—শালগম, গাজর প্রভৃতি সব্জী তাদের দেশের মতো আর কোথাও জন্মায় না।

ভূটানীদের দেশের শাসন প্রথাও অনেকটা তিব্বতীদেরই অনুরূপ। তাদের দু'জন রাজা আছে, একজন "দেবরাজ", অর্থাৎ যিনি দেশের আধ্যাত্মিক ব্যাপারের সর্ব্বময় কর্ত্তা; আর একজন "ধর্ম্মরাজ" অর্থাৎ

রাজ-বন্দনাকারিগণ

সাধারণ পোষাকে ভূটানের মহারাজা (সপরিবারে)

দেশের রাজকীয় ব্যাপরের সর্ব্বেশ্বর। কিন্তু এই যুগল রাজাকেই প্রকৃতপক্ষে কিছুই করতে হয় না। দেশের প্রধান পুরোহিত বা ধর্ম্ম-যাজকেরা যাঁকে 'দেবরাজ' রূপে নির্ব্বাচিত করেন, তিনিই এই পদের অধিকারী হন। ভূটানীরা সকলেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। ধর্ম্মরাজও দেশের প্রধান মন্ত্রীগণই নির্ব্বাচিত করেন। মন্ত্রীদের ভূটানীরা বলে "লেনেহেন"। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভূটানের শাসন-ভার সম্পূর্ণ রূপে এই মন্ত্রীদের হস্তেই ন্যস্ত আছে। গত শতাব্দীর শেষ ভাগেও ভূটানে প্রকৃতপক্ষে কোনও রকমেরই শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল না, সে সময় অনেকটা 'জোর যার মুল্লুক তার' এই ব্যবস্থাই ছিল। কিন্তু ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ইডেন সাহেবের অধীনে ইংরাজেরা ভূটানে যে একদল প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন, তারা ধর্ম্ম-প্রচারকের ছদ্মবেশে গেলেও, তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটা রাজ-নৈতিক সমস্যার সমাধান। ভুটিয়া সর্দ্দারেরা ইংরাজ রাজ্যের

তালাও মঠের তাজ্রোলামা

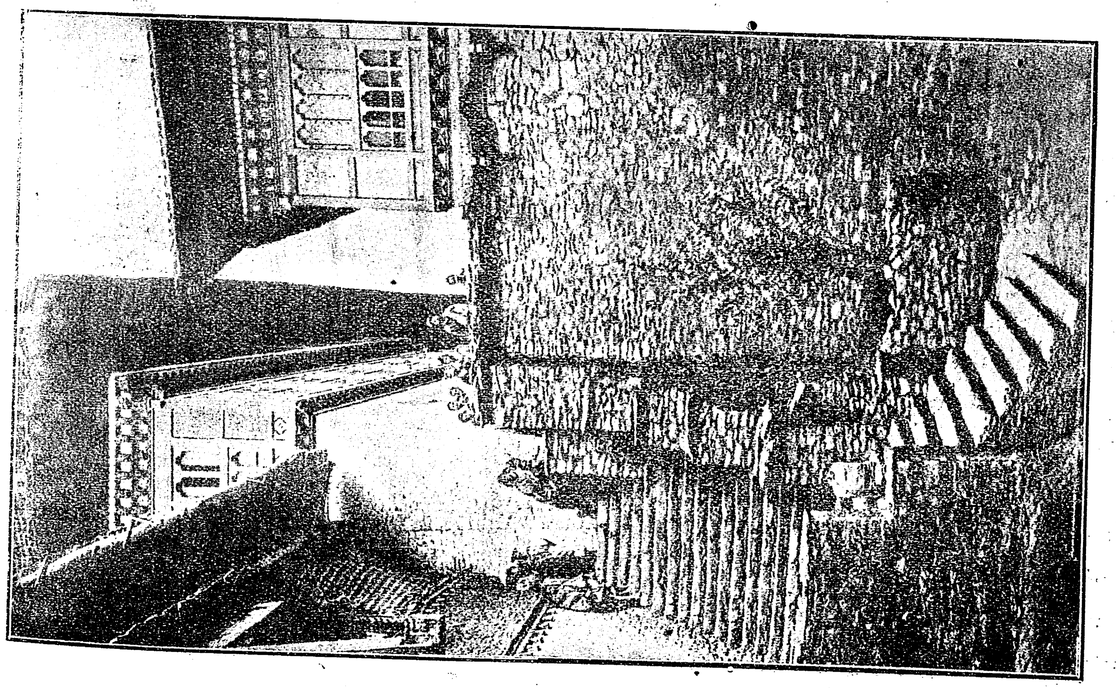

ভুটান রাজ-প্রাসাদের প্রবেশ-দ্বার

রাজ-প্রাসাদের পরিচারিকাগণ

তাঁর পদের আখ্যা হচ্ছে "টঙ্‌শা পেন্‌লপ্"।

সিকিমের ইংরাজ-প্রতিনিধি মিঃ ক্লডে হোয়াইট (Claude White) ১৯০৩।৪ সালে যখন ব্রিটিশ মিশনের পরিচালক হয়ে তিব্বতে অভিযান করেন, তখন ভূটানের তদানীন্তন টঙ্‌শা পেন্‌লপ্, 'লাশা' পর্য্যন্ত তাঁদের সঙ্গে গেছলেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে, টঙ্‌শা পেন্‌লপ্ সেই সময় যে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন, তারই প্রতিদান-স্বরূপ ইংরাজ সরকার তাঁকে 'নাইট্' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, এবং ভূটানের সঙ্গে সন্ধি করে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছিলেন।

১৮৬৩ সালের আগে ভূটানের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, যদিও ১৭৭৩ সাল থেকেই ভূটানের সঙ্গে ইংরাজের সংঘর্ষ সুরু হয়েছিল। এই সময় কুচবিহার থেকে ভূটানীদের বিতাড়িত করে দিয়ে ইংরাজ এই প্রদেশ দখল

সুসজ্জিতা রাজপুরবাসিনীরা

সীমান্তে এসে প্রায়ই যে লুটপাট ও অত্যাচার ক'রে যেতো, তারই প্রতিবিধান করাই ছিল তাদের প্রধান চেষ্টা। ইডেন মিশনের পশ্চাতে ইংরাজের সৈন্য-বাহিনী ভূটানে প্রবেশ ক'রে বক্‌শা ও দ্বারবান গিরি দখল করবার পর থেকে ক্রমশঃ সেখানে একটা বিধিবদ্ধ শাসন-প্রণালী গড়ে উঠেছে। এখন সেখানে নামমাত্র ইংরাজের অধীন হয়ে ভূটানের প্রতিভূ স্বরূপ যিনি রাজ্য শাসন করছেন,

করেছিল। তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ছিলেন ভারতের শাসনকর্ত্তা। তিনি জর্জ্জ বোগ্‌লে নামে একজন সিভিলিয়ানকে ভূটান ও তিব্বতের রাজধানীতে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বোগ্‌লের দৌত্যকার্য্য যে অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করেছিল, ভারতবর্ষ তার মর্য্যাদা রক্ষা করেনি বলেই, ১৭৮৪ খৃঃঅব্দে টার্ণার সাহেবের

রাজবেশে ভূটানেশ্বর

অধীনে যে দল তাদের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিল, তারা অকৃতকার্য্য হয়ে ফিরে এসেছিল। তার পর প্রায় এক শতাব্দী পরে ১৮৬৪ সালে ইংরাজের বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়েছিল। এই সময় 'ডুয়ার্স' বা ভূটানের নিম্নপ্রদেশ ইংরাজের অধিকারভুক্ত হয় এবং ইহাদের তত্ত্বাবধানে ক্রমশঃ ডুয়ার্সের প্রভূত উন্নতি সাধিত হ'য়েছে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, ভূটানের প্রধান নদী হ'চ্ছে মানস। কিন্তু মানস ছাড়াও সেখানে আরও অসংখ্য নদী আছে। প্রত্যেক নদীটিই প্রখর বেগবতী এবং সবগুলিই ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বক্ষে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তিস্তা ও চীঞ্চু নামে পশ্চিম ভূটানের দুটী নদী ভূটান থেকে লাশায় যাবার পথের প্রধান সংযোজক বলে, অনেকেরই সঙ্গে এদের পরিচয় আছে। পার্শ্ব নাম চাঞ্চুংই একটী শাখা তিব্বত ও ভূটানের সীমারেখার স্বরূপ বহে যাচ্ছে। ভূটানের যে গিরিপথ সোজা তিব্বতের দিকে চলে গেছে, সেই পথের প্রথম জনপদ হচ্ছে ফেরী জোঙ্। বোগ্‌লে এই স্থানের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে গেছেন, এখানটায় যেন একটা বিপুল ফাঁকা,

ভূটানী লেপ্‌চা

একটা অসীম নির্জ্জনতা, একটা বিরাট ঔদাসীন্য এবং একটা অনন্ত নিষ্ফলতা বিরাজ করছে বলে মনে হয়। ১৯০৪ সালে সেনাপতি ইয়ংহজব্যাণ্ড যখন তিব্বতে অভিযান করেন, তখন ব্রিটীশ সৈন্যদল ভূটান পার হয়ে এসে এইখানেই প্রথম বিশ্রাম গ্রহণ করেছিল। সেদিন মাউণ্ট এভারেষ্ট বা গৌরীশৃঙ্গ অভিযানে যাঁরা যাত্রা ক'রেছিলেন, 'ফেরী জোঙ্' তাঁদেরও বিশ্রাম-স্থল ও একটা প্রধান আড্ডা হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, লাশা যেতে হ'লে যে পথ দিয়ে যাওয়া হোক না কেন, ফেরী জোঙ্‌এ এসে বিশ্রাম নিতেই

হবে। সুতরাং এ স্থানটার ভৌগোলিক মর্য্যাদা যাই থাক্‌না, এর একটা যে বিশেষত্ব দাঁড়িয়ে গেছে, সেটাকে আর নিতান্ত তুচ্ছ করা যায় না।

ফেরী জোঙ্ প্রায় ১৪২০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এইখান থেকে তাঙ্‌লা গিরিবর্ত্ম আরম্ভ হয়েছে। এই গিরিবর্ত্ম একেবারে হিমালয়ের মেরুদণ্ডের উপর গিয়ে পৌছবার পথ নির্দ্দেশ করে দেয়। হিমালয়ের বিরাট 'চুমলহারী' শিখরের ছায়াতলে যেখানে এই পথ এসে মিশেছে সেস্থানের উচ্চতা প্রায় ষোল হাজার ফুট হবে।

ভুটিয়াদের শরীর খুব হৃষ্টপুষ্ট। তারা সকলেই বেশ সবল সুস্থ ও কর্ম্মঠ পুরুষ। কিন্তু তিব্বতীদেরই মতো তারা অত্যন্ত নোংরা। পুরুষেরা একটা মোটা পশমী কাপড়ের হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা ঢিলে জামা গায়ে দেয়। কোমরেও একখানা মোটা কাপড়ের কোমরবন্ধ বাঁধে। মেয়েদের পোষাকও অনেকটা ওই রকমেরই; কেবল

টঙ্‌শা মঠের লামারা

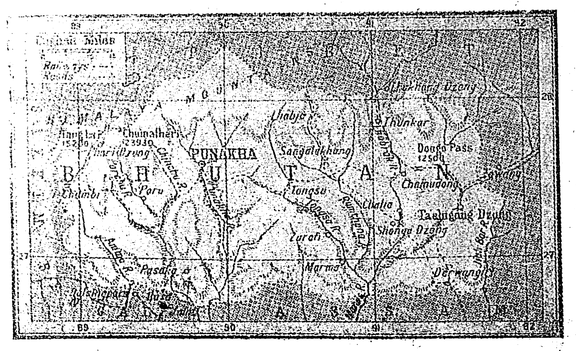

ভূটানের মানচিত্র

পা পর্য্যন্ত লম্বা এবং জামার হাতা দুটো খুব ঝল্‌ঝলে। ভূটানীরা বেশ প্রফুল্ল জাত, খুব আমোদপ্রিয়। জীবন যাত্রার জন্য তাদের যে কঠোর পরিশ্রম ক'রতে হয়, যে প্রাণান্ত কষ্টে তাদের সেই পার্ব্বত্য ভূমি কর্ষণ ক'রে চাষবাস ক'রতে হয়, তার তুলনায় তাদের এই আনন্দ-প্রিয়তা মোটেই দূষনীয় বলা চলে না।

ভূটানীরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বটে, কিন্তু সে নিতান্ত অধঃপতিত বৌদ্ধধর্ম্ম, যা এখন কেবলমাত্র তন্ত্র-মন্ত্র, ও ভূত-প্রেতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় পর্য্যবসিত হ'য়েছে। ভূটানীরা সকলেই যে একেবারে তিব্বতীদের বংশ, এ কথা বলা চলে না; কারণ, নৃতত্ত্ববিদেরা অনুসন্ধান ও গবেষণা করে স্থির করেছেন যে, পূর্ব্ব ভূটান-বাসীরা পশ্চিম ভূটানবাসীদের সমবংশীয় নয়। তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে দেখতে পাওয়া যায়। তারা তিব্বতী অপেক্ষা বরং আসাম সীমান্তবাসী মিস্‌মী ও আবরদেরই নিকটতম জ্ঞাতি। ভৌগোলিক হিসাবের দিক দিয়েও এরা শেষোক্ত দলেরই সঙ্গী ও প্রতিবাসী হওয়াতে এই ধারণাটাই সম্ভব ও সত্য বলে গ্রাহ্য হয়েছে।

বাদ-প্রতিবাদ

গঙ্গাতীরের প্রতিবাদের উত্তর।

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

গত আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত পুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "গঙ্গ তীরের" যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, বাঁড়ুয্যেদিগের ডাকাতি সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, উহা জনশ্রুতি অবলম্বনে লিখিত। ঐ জনশ্রুতি সকল বাঁড়ুয্যে-দিগের প্রতি প্রযোজ্য নহে; পরন্তু পুরাকালে বাঁড়ুয্যে উপাধিধারী যদি কেহ দস্যুতায় লিপ্ত হইয়া থাকে, তবে তাহার বা তাহাদিগের কি উহা প্রযোজ্য! ডাকাত বিশ্বনাথ বাঁড়ুয্যে যে ডুমুরদহের বর্ত্তমান বাঁড়ুয্যে বংশের কেহ ছিল, তাহাও আমার প্রবন্ধে নাই। ডুমুরদহের কোন বাঁড়ুয্যেদিগের ইতিহাস আমি অবগত ছিলাম না; কারণ, তাহা জানা আবশ্যক হয় নাই। পুরঞ্জয় বাবু ডুমুরদহের বর্ত্তমান রায় বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের যে ইতিহাস দিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি নিজেই দেখাইয়াছেন যে, আমার প্রবন্ধোক্ত ডাকাইতি অপবাদ বর্ত্তমান বাঁড়ুয্যেদিগের প্রতি প্রযোজ্য নহে ও ডাকাত বিশ্বনাথ বাবু এ বংশের কেহ ছিল না। আমার সামান্য ভ্রমণ কাহিনী কাহাকেও ব্যথা দিবার উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই। ইহার জন্য যে পুরঞ্জয় বাবুকে কষ্ট করিয়া প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে, তজ্জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। "প্রাচীন ও পবিত্র" ডুমুরদহ গ্রামের উপর একমাত্র আমিই সর্ব্ব প্রথম "অযথা কলঙ্কারোপ" করি নাই। আমার বহু পূর্ব্বে একাধিক লেখকের লেখা ইহাকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের ডুমুরদহের বিবরণের জন্য আমাকে কতক পরিমাণে নিম্নলিখিত পুস্তকাদির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে:—

(ক) "দেবগণের মর্ত্তে আগমনে" উল্লিখিত আছে—"বাম দিকে দেখা যাইতেছে ডাকাইত-প্রধান স্থান ডুমুরদহ। এক সময় ঐ স্থানের বালক বৃদ্ধ সকলেই ডাকাইত ছিল। ঐ গ্রামের লোকেরা বাটীতে অতিথিদিগকে বাসা দিয়া রজনীতে প্রাণ সংহার করিত। দিবসে মৎস্যজীবীরা মৎস্য ধরিত এবং রজনীতে নৌকায় বোম্বেটেগিরি করিত! ফলতঃ সে সময় কি জল পথ কি স্থল পথ, কোন পথেই ডুমুরদহের নিকট দিয়া টাকা কড়ি সহ কেহ যাইলে নিস্তার থাকিত না। প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইল, বিখ্যাত ডাকাত বিশ্বনাথ বাবু এই স্থানে বাস করিতেন। ইহার অধীন ডাকাইতেরা নৌকা যোগে যশোর পর্য্যন্ত ডাকাইতি করিয়া বেড়াইত। পরে মন্ত অবস্থায় বিশ্বনাথ বাবু কতিপয় সঙ্গীর সহিত ধৃত হন ও তাঁহার ফাঁসি হয়। যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন উহা গঙ্গাতীরের সন্নিকটস্থ একটি দোতালা কোঠা। ঐ বাড়ীর ছাদ হইতে গঙ্গার বহু দূর পর্য্যন্ত কোথায় কে আছে দেখিতে পাওয়া যাইত।" ইত্যাদি! তৎপরে বাবু ডাকাত বিশ্বনাথ পাল্কী আরোহণে ডাকাইতি করিতে যাইত তাহার কথা আছে।

বীর আশানন্দ ঢেঁকী (মুখোপাধ্যায়) কিরূপে ডুমুরদহের দুইজন ডাকাইত দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উহাদিগকে কক্ষদেশে ধারণ করিয়া তাহার শ্বশুরালয় গুপ্তিপাড়ায় লইয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা আছে।

(খ) শান্তিপুরবাসীগণের নিকট একটি প্রবাদ শুনা যায় যে, শান্তিপুরবাসী উক্ত আশানন্দ ঢেঁকী একবার কোন বৃদ্ধ দম্পতি সহ ডুমুরদহের কোন ভদ্রলোকের গৃহে রাত্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাত্রে গৃহস্বামী দলবল সহ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে আশানন্দ অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

(গ) Bholanath Chunder's "Travels of a Hindoo to various parts of Bengal and Upper India" 1869, নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে:—"Four miles north of Triveni is Doomurdah an extremely poor village noted very much for its robbers and dacoits. To this day people fear to pass this place after sunset, and no boats are moored in its ghauts even in broad daylight. The famous robber chief Bishonath Babu lived here about 60 years ago. It was his custom to give shelter to wayworn and benighted travellers and then to kill them at night in their sleep. He was caught to end his days on the scaffold. The house in which he lived still stands, it is a two-storied house just overlooking the river.

(ঘ) "বিশ্বকোষে" উল্লিখিত আছে:—"পূর্ব্বে এই স্থান ডাকাইতির জন্য বিখ্যাত ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোক এই স্থান দিয়া যাইতে ভয় করিত।" ইত্যাদি। অতঃপর ডাকাইত বিশ্বনাথ বাবুর বর্ণনা আছে।

(ঙ) "সুরধুনী কাব্যে" লিখিত আছে:—"ডাকাতে ডুমুরদহ এবে ভয় নাই। খালের উপরে সেতু নবীন সরাই।"

এই স্থানের ডাকাইতির বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থানে গল্প ও ছড়ার প্রচলন আছে। এতদ্ব্যতীত "Long's Seletions, 1748-1767"

নামক গ্রন্থে, ১৮৫৩ সালের "সংবাদ প্রভাকরে", "Bishop Heber's Journal" নামক গ্রন্থে এতদঞ্চলের ডাকাতির বিষয় জানিতে প্যারা যায়। আর কোথায় কি প্রমাণ আছে, তাহা ক্রমে হয়ত জানিতে পারিব।

আমার "গঙ্গাতীরে" প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কয়টি ভ্রম রহিয়া গিয়াছে; উহা সংশোধন করা আবশ্যক :—

স্বর্ণড়িয়া বর্ণনা স্থলে অনন্তরাম ও শ্রীপুরের বর্ণনা স্থলে রঘুনন্দন মুস্তৌফী "১১২৫ সালে উলা ত্যাগ করিয়া শ্রীপুরে গমন করেন" লিখিত হইয়াছে। "১১২৫ সাল" না হইয়া "অনুমান ১১১৪।১৫" সাল বা হইবে। স্বর্ণড়ার নিস্তবিণীর মন্দির "১১৫৪ সালে শকাব্দা ১৬৬০ হইবে। স্বর্ণড়ার নিস্তবিণীর মন্দির "১১৫৪ সালে ৺কাশীপতি মুস্তৌফী প্রস্তুত করেন" ইহা ভ্রমক্রমে উল্লেখ করা হয় নাই। এবং ৺আনন্দময়ীর পূজা "কায়ক্লেশে হয়" স্থলে "পূজার ভাল ব্যবস্থা আছে এবং তজ্জন্য ৺রাধাজীবন মুস্তৌফীর দৌহিত্রগণ প্রশংসার্হ" হইবে।

আনাতোল ফ্রাঁস

শ্রীভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য

অগ্রহায়ণের "ভারতবর্ষে" শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় "আনাতোল ফ্রান্স" নামে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে কয়েকটা ভুল আছে। আনাতোল ফ্রাঁসের মত বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিকের বিষয়ে কোথাও কিছুমাত্র ভুল থাকা উচিত নয়—সেজন্য তাহার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করি।

ভারতবর্ষের ৯৩৫ পৃষ্ঠা, ২য় কলমে তিনি আনাতোল ফ্রাঁসের Thais নামক পুস্তকের বিষয়ে লিখিয়াছেন, "থেঈস পুরাকালের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসী। আলেক্জান্দ্রিয়ার জনৈক অভিনেত্রীর...... চরিত্র সংশোধনের ভার গ্রহণ করেন এই সন্ন্যাসী" ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই অভিনেত্রীরই নাম Thais; সন্ন্যাসীর নাম Paphuntius। এই অভিনেত্রীর নাম অনুসারে বইখানির নাম Thais হইয়াছে

"তদ্দেশীয় পুরোহিত Paphuntius তাহার অনুরাগী ভক্ত ছিল।" কিন্তু সেই সন্ন্যাসী ছাড়া Paphuntius নামের আর কাহাকেও তো আমরা বইখানির মধ্যে খুঁজিয়া পাই না। অভিনেত্রী থেঈস্ (থেঈ ?) সন্ন্যাসী Paphuntius ও আর একজন স্বকপোলকল্পিত পুরোহিতের নাম লইয়া লেখক সমস্ত গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।

"থেঈসের শোচনীয় মৃত্যুর ও Paphuntius এর খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষার চিত্র মনোরম।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে থেঈসের মোটেই শোচনীয় মৃত্যু হয় নাই। তাহার মত সুখের মৃত্যু কে না চায়?

এখানে বইখানির আখ্যায়িকা ভাগের একটু বিবৃতি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বোধ হয়। আনাতোল ফ্রাঁস্ প্রথমেই বইখানিতে ঈজিপ্টের ধূ ধূ মরুভূর মধ্যে দৃঢ়ব্রতী, ধ্যানমৌন সন্ন্যাসীদের ছবি আঁকিয়াছেন। এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে Paphuntius একজন। এক দিন সে আলেকজাঁন্দ্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধা সুন্দরী অভিনেত্রী Thaisএর কথা শুনিতে পাইল। শুনিয়া তাহার মনে হইল যে, সৌন্দর্য্য—ভগবানের শ্রেষ্ঠ দানগুলির একটি বড় দান সৌন্দর্য্য—নির্ম্মল, শুভ্র ফুলটির মত পবিত্র—তেমনি অমলিন তেমনি গন্ধ-ভরা হওয়া উচিত। তাহাকে পথের ধূলায় হাজার পথিকের পায়ের তলায় লুটাইয়া দেওয়া ভগবানের সৃষ্টির বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর কিছু নয়। তার পর এক দিন সে Thaisকে ধর্ম্মের পথে ফিরাইয়া আনিবার দৃঢ় সংকল্প বুকে লইয়া মরুভূর বালুকা-প্রান্তর হইতে, তাহার সাধন-মন্দির হইতে, বাহির হইয়া পড়িল। আলেক্জান্দ্রিয়ায় পৌঁছিয়া এক রঙ্গালয়ে সে প্রথম থেঈসকে দেখিল; তাহার পর থেঈসের গৃহে গিয়া তাহার সহিত পরিচয়ের বন্ধন দৃঢ় করিয়া লইল।

ধর্ম্মের মহিমা থেঈসের নিকট প্রভাতের সদ্যফোটা কমলটির মত পাপড়ি মেলিয়া জাগিয়া উঠিল। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, থেঈসের মনে জন্ম-অপরাধীর ভাব—criminalityর ভাব ছিল না। বাল্যাবস্থায় আত্মীয়-স্বজন হারাইয়া এত বড় জগতে একা থেঈসকে দিক্‌ভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল; সে পাপের সোজা পথটাই বাছিয়া লইয়াছিল। কিন্তু এক দিন যখন এক অপূর্ব্ব শঙ্খধ্বনি তাহার কানের কাছে বাজিয়া উঠিল, সন্ন্যাসী Paphuntius যখন তাহার তরুণ বুক নূতন আলোয় ভরিয়া দিলেন, তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার বাহ্য আবরণটা খসিয়া পড়িল। তাহার অন্তরের সুপ্ত নারীপ্রকৃতি—ধ্যানরতা মহিমময়ী নারী—এতদিন পরে বাহির হইয়া আসিল। অগাধ ধনরত্ন অসীম প্রভাবের প্রলোভন এক কথায় আগুনে বিসর্জ্জন দিয়া সে ভিখারিণীর মত সন্ন্যাসীর সহিত অজ্ঞাত, দুর্গম পথে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু এবার সন্ন্যাসীর মনের বাঁধ ভাঙিয়া গেল; থেঈসকে দেখার পর হইতেই তাহার মনে বিপর্য্যয়ের ঝড় উঠিয়াছিল—যাহাকে সে শত চেষ্টাতেও পিষিয়া মারিতে পারে নাই,—এবার সেই ঝড় তাহার মনে প্রলয়ের ডমরু বাজাইতে লাগিল। হতভাগ্য সন্ন্যাসী থেঈসকে এক সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে রাখিয়া মনের দৃঢ়তা ফিরাইয়া আনিতে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া গেল। অনেক দিন সাধনায় কাটিল। এখানে আনাতোল ফ্রাঁস্ সন্ন্যাসীর মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া, এবং ক্ষুব্ধ বিচলিত মনের অপূর্ব্ব সংগ্রামের ছবি আঁকিয়া, আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

এদিকে থেঈস দিন দিন সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া চলিল। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! গর্ব্বিতা অভিনেত্রী এক দিন খৃষ্ট-মঠের সন্ন্যাসিনী!!

সন্ন্যাসী আর পারিল না। মনের যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, পরাজয় স্বীকার করিয়া এক দিন সে বুক-ভরা আগুন লইয়া থেঈসের কাছে ফিরিয়া আসিল। থেঈস তখন সুখের মৃত্যু-শয্যায়। এখানে আনাতোলের আঁকা আর একটি মন্-মাতানো ছবি।

Thaisএর এক জায়গায় আনাতোল বলিয়াছেন, "Man is a beautiful hymn of God."—মানুষ ভগবানের বীণাতন্ত্রীর একটি সুন্দর গান। এই ভাব থেঈসের মধ্যে বড় সুন্দর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আরো দু একটা কথা—লেখক আনাতোল ফ্রাঁসের Crainquille নামের কোনও পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। ও নামের কোনও পুস্তকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। বোধ হয় লেখক Crainquebille কে ভুল করিয়া Crainquille লিখিয়া থাকিবেন।

লেখক আনাতোলের অনেক বইয়ের নাম লিখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার একখানি খুব ভাল বই একেবারে বাদ দিয়াছেন। তাহার ইংরাজি নাম—"The Revolt of the Angels." ইহাতে লেখক আশ্চর্য্য satire ও কল্পনার গভীরতার পরিচয় দিয়াছেন। তবে অনেকে হয় তো উহার মধ্যে metaphysics দেখিতে পাইবেন।

নানা কথা

সাইকেলে কাশী যাত্রা

নর্দ্দার্ন ফ্রেণ্ডস্ ক্লাবের সভ্যগণ, যথা :—শ্রীমদনমোহন দে, শ্রীরামলাল দত্ত, শ্রীনিবারণচন্দ্র ধর, শ্রীগোরাচাঁদ মল্লিক, শ্রীবৈদ্যনাথ বড়াল, শ্রীমহাদেব বড়াল ও শ্রীতারকনাথ বড়াল ৪০ নং রতন সরকার গার্ডেন্ ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক বি-এল্, মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে গত ২রা কার্ত্তিক রবিবার প্রাতে ৪টা ১৫ মিনিট সময়ে যোড়াসাঁকো কালীমাতার মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মধ্য দিয়া বিগত ৯ই কার্ত্তিক রবিবার সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিট সময়ে নিরাপদে প্রায় ২২৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান পুণ্যময় বারাণসী ধামে উপনীত হন। শ্রীযুক্ত বিজনচন্দ্র বসু বর্দ্ধমান হইতে আসানসোল পর্য্যন্ত সাইকেলে আরোহণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তারকনাথ পাণ্ডুয়া হইতে বাষ্পীয় যানের সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই দলটী সর্ব্বসমেত ৪৯ ঘণ্টা ২৭ মিনিট সাইকেল চালাইয়াছিলেন; গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ৯.১ মাইল হিসাবে দৈনিক ৫৬.৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিতেন। তাঁহারা দৈনিক গড়ে ৬ ঘণ্টা ১০ মিনিট ৫২½ সেকেণ্ড সাইকেল চালাইতেন।

তাঁহারা পথিমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস যথাক্রমে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এম্-এল্-সি মহাশয়ের বর্দ্ধমান ও আসানসোলস্থ বসুভিলা নামক ভবনদ্বয়ে ভূরিভোজনান্তে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। তৃতীয় দিবস গোমো ষ্টেসনের বিশ্রামকক্ষে রাত্রি বাস হইয়াছিল। এ বিষয়ে ষ্টেশন মাষ্টার ইহাঁদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। গোমো ষ্টেশন হইতে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দূরত্ব ৩॥০ ক্রোশ; অধিকন্তু পথ অত্যন্ত দুর্গম। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবস যথাক্রমে (হাজারিবাগ) বাগোদর, (কোডার্ম্মা) বরহি ও (গয়া) সারঘাটি ডাক বাঙ্গলোয় রাত্রিবাস হইয়াছিল; এই তিনটী ডাক বাঙ্গলোর মধ্যে বরেহি ডাক বাঙ্গলোটী উত্তম। আহারাদি সমাপনান্তে সপ্তম রাত্রি কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ মল্লিক বি-এল্ মহাশয়ের ডেরি-অন্-শোনস্থ 'রিট্রিট্' নামক আবাসে অতিবাহিত হইয়াছিল ও অষ্টম দিবসে বারাণসী ধামে অবস্থিতি। তাঁহারা প্রায় প্রত্যহ প্রাতে সাইকেল আরোহণ করিতেন ও সায়াহ্নে নির্দ্ধারিত স্থানে উপনীত হইতেন; পথিমধ্যে তাঁহারা ভোজন ও বিশ্রামাদি করিতেন। বাগোদর হইতে সারঘাটি পর্য্যন্ত অরণ্যাবৃত স্থান বলিয়া বাগোদর হইতে বরহি যাইবার সময় তাঁহারা বেলা ১০টা ৪৫ মিনিটে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাগোদর, বরহি ও সারঘাটিতে মধ্যাহ্নের পর উপনীত হইয়াছিলেন।

আসানসোল হইতে তোপচাঁচি পর্য্যন্ত পথ অত্যন্ত উচ্চ-নীচ ও হাজারিবাগের অন্তর্গত 'দানুয়া ভালুয়ার' নিকটবর্ত্তী ৬ ক্রোশ পথ গভীর অরণ্যাবৃত। এই জঙ্গলের দূরত্ব কলিকাতা হইতে ১৩১ ক্রোশ। এই স্থানে শিকারীগণ মধ্যে মধ্যে শিকার করিবার মানসে উপস্থিত হয়েন। এই স্থানে টিকারীর মহারাজের শিকার করিবার জন্য একটী বাঙ্গলো আছে। কাশীর নিকটবর্ত্তী পথ মন্দ; অধিকন্তু ধূলি-ধূসরিত। বরাকর পুল, পরেশনাথ পাহাড় ও বরহির নিকটবর্ত্তী সূর্য্যপুকুর পাহাড়ের রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে পথিকের ক্লান্তির অপনোদন হয়। দুইজন সাইকেল আরোহী পরেশনাথ পাহাড়ের নিকট দুইবার নেকড়ে বাঘের গর্জ্জন শুনিতে পাইয়াছিলেন ও হাজারিবাগের জঙ্গলের নিকটস্থ নদীতে একটী সর্প একজন সাইকেল আরোহীকে তাড়া করিয়াছিল। তাঁহারা পথিমধ্যে একটী মৃত সর্পও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সাইকেল আরোহীগণ পদব্রজে শোন নদীর পুল অতিক্রম করিতে সবিশেষ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিপাত হইলেও ঐ সময় পশ্চিমাঞ্চলে সাইকেল আরোহণ করিবার পক্ষে বেশ সুবিধাজনক। এই দলটী কোন প্রতিযোগিতা না করিয়া আনন্দ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুর, ব্যাণ্ডেল গীর্জ্জা ও ধানবাদের নিকটবর্ত্তী বরাকর পুলের নিকট পথ গোলমাল হইবার সম্ভাবনা। এই স্থানে সকলকে বিশেষ সাবধানে যাইতে হয়। শেষ দিবসে এই দলটী ৪২ ক্রোশ পথ প্রায় ৯ ঘণ্টায় অতিক্রম করেন; দুর্গাপুরের ২ ক্রোশ ব্যাপী জঙ্গল ৫ মিনিট ৩৮ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেন ও হাজারিবাগের ৪॥০ ক্রোশ গভীর অরণ্যপথ অতিক্রম করিতে তাঁহাদের ৩৫ মিনিট অতিবাহিত হইয়াছিল। এই স্থানের পথ ঢালু থাকায় সাইকেল আরোহীগণকে পদ দ্বারা চাকা ঘুরাইতে হয় নাই। যাঁহারা এই বিষয়ে, ঐ দলটীকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা অশেষ ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

খাদি প্রতিষ্ঠান

এখনই তুলার চাষের সময়—কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বপন উপযোগী বীজ খাদি প্রতিষ্ঠানে আমদানী করা হইয়াছে। যে পরিমাণ বিক্রয়ের আশা করা গিয়াছিল তাহা হয় নাই। ফলে কয়েক মণ বীজ মজুদ থাকিয়া নষ্ট হইতে পারে। এই সময় বীজ বপন

করিলে জ্যৈষ্ঠ মাসে ফসল পাওয়া যাইবে। নীচু জমিতে যেখানে বর্ষার জল উঠে, সেই সকল স্থানে এই জাতের কার্পাসের চাষ করা যায়। আমরা প্রত্যেক জিলার কর্ম্মীদিগকে এই কার্পাসের চাষের জন্য বীজ লইতে অনুরোধ করিতেছি।

বপন প্রথা—জমীতে চাষ দিয়া একহাত অন্তর অন্তর লাইন করিতে হইবে। ঐ লাইনে একহাত অন্তর অন্তর দুইটী করিয়া বীজ বপন করিতে হইবে। চারা উঠিলে একটি মাত্র চারা রাখিয়া অপরটী ফেলিয়া দিতে হইবে। বীজ এক ইঞ্চ হইতে দেড় ইঞ্চ মাটীর নীচে পড়া চাই; বেশী নীচে পড়িলে চারা গজাইবে না। একবার নিড়ান দরকার। সেই সময়ে অতিরিক্ত চারা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। জল সেচনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। এক বিঘা জমিতে তিন সের বীজ লাগিবে। মূল্য প্রতি সের ।/০ আনা। এক বিঘায় দেড় মণ কার্পাস ও আধমণ তুলা হইবে।

অক্টোবর মাসে দেয় সুতা—অক্টোবর মাসের সুতা প্রতিষ্ঠান হইতে একটী পার্শেলে করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পার্শেলটিতে ৫৫১ জন সভ্যের সুতা প্রেরণ করা হইয়াছে। মোট ১০,০৬,২৭২ গজ সুতা পাঠান হইয়াছে। একজন ৪৫০০ গজ দিয়াছেন। আচার্য্য রায় ৯ নম্বরের ২২০০ গজ সুতা দিয়াছেন। আর একজন ভগ্নী ২২০০০ গজ দিয়াছেন।

সভ্যগণকে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে তাঁহাদের দেয় সুতা প্রেরণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে। যাঁহারা সুতা পাঠাইবেন তাঁহারা যেন ২০০০ গজের কম না পাঠান।

সুতা বিলম্বে পাঠান হয় বলিয়া খাদি বোর্ড হইতে অনুযোগ করা হইয়াছে। নিবেদন এই যে যাহাতে ১লা তারিখেই সুতা প্রেরণের ব্যবস্থা হয় তাহা করিবেন। গণিতে, লিষ্ট করিতে সময় লাগে। ৭ই তারিখে কলিকাতায় পঁহুছিলে তবে সময়মত সবরমতী পাঠান সম্ভব। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে:—

(১) এক ফুট ব্যাসের অর্থাৎ তিন ফুট বেড়ের লাটাই কাটুনীগণ ব্যবহার করিবেন, প্রতিষ্ঠান হইতে বাঙ্গলা দেশের জন্য এই মাপের লাটাই নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। (২) চরকা হইতে লাটাইয়ে সুতা তুলিবার সময় প্রত্যেক ১০০ গজ পরে একটী করিয়া "জো" তুলিয়া দিতে হইবে। ৫০০ গজ সুত উঠাইয়া একটী করিয়া ফেটী করিতে হইবে। প্রত্যেক ফেটীর উপর সুতার নম্বর ও ওজন একখানি টুক্‌রা কাগজে তুলিয়া লাগাইয়া দিতে হইবে। সুতার নম্বর নির্দ্ধারণ করিবার উপযোগী ছোট দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা প্রতিষ্ঠান হইতে বিক্রয় করা হয়। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। এক তোলা সুতায় যত গজ তাহাকে ২১ দ্বারা ভাগ করিলেই সুতার নম্বর পাওয়া যায়।

(৩) লাটাই হইতে সুতা তুলিয়া লইবার সময় উহা জলে ভিজাইয়া বাতাসে শুকাইয়া লইতে হইবে।

প্রতিষ্ঠান হইতে সুদক্ষ কাটুনী পাঠাইয়া এবং সমস্ত আবশ্যক জিনিষ পত্রাদি নগদ মূল্যে কিম্বা কোন স্থানে বিনামূল্যে সরবরাহ করিয়া চরকা ক্লাব প্রতিষ্ঠা কার্য্যে সহায়তা করা হয়। যাঁহারা এই প্রকার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠানের সহিত পত্র ব্যবহার করুন।

সম্পাদক, খাদি প্রতিষ্ঠান
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গালা প্রস্তুত পদ্ধতির উন্নতি সাধন

[বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগ হইতে গালা প্রস্তুত প্রণালীর উন্নতি সাধন সম্বন্ধে ডাঃ আর, এল, দত্ত ডি, এস্ টি, ইনডাষ্ট্রিয়াল কেমিষ্ট মহাশয় লিখিত যে পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে এই বিবরণ উদ্ধৃত হইল]

বাঙ্গালার কয়েকটী গালা প্রস্তুত করিবার কারখানায় যে সকল পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহার ফল এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা হইল। এই সকল কারখানায় অল্প পরিমাণে কুটীর-শিল্পের উপযোগী গালা প্রস্তুতের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাহা অত্যন্ত অসন্তোষকর—তাহাতে নিতান্ত অপকৃষ্ট শ্রেণীর গালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই পদ্ধতির যে উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ লাক্ষা বাটিবার, গুঁড়াইবার ও ধৌত করিবার প্রণালীতেই আবদ্ধ, সেই জন্য প্রচলিত যে প্রক্রিয়ায় গালা গলান হয়, তাহার বিবরণ এই প্রসঙ্গ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ঐ সকল কারখানায় এক্ষণে কুটীর-শিল্পের উপযোগী অল্প পরিমাণে প্রস্তুতের যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা হইল।

স্বাভাবিক বা অসংশোধিত লাক্ষা (crude lac) যাহা ক্রয় করা হয়, তাহা নানা আকারের ভাঙ্গা ভাঙ্গা টুকরার সমষ্টি. তাহাতে বহু পরিমাণে বালি, মাটি, ধূলা ও কাঠকুটা মিশ্রিত থাকে। উহা সেই অবস্থাতেই শিল-নোড়ায় বাটিয়া অথবা অপেক্ষাকৃত বড় বড় কারখানায় হস্তচালিত রুলের জাঁতাকলে পিষিয়া লওয়া হয়। সেই বাটী বা পেষা মাল ছয়-ঘরা চালনীতে (six mesh sieve) ছাঁকিয়া বড় বড় দানাগুলি, যাহা ঐ চালনীর ছিদ্রে গলে না তাহা, পুনরায় গুঁড়াইয়া লওয়া হয়—যে পর্য্যন্ত না সমস্ত মাল ছয়-ঘরা চালনীর ভিতর দিয়া গলিয়া ছাঁকা হইয়া যায়। তৎপরে উহা ধৌত করা হয়। কোনও কোনও কারখানায় কাঁচা বা স্বাভাবিক লাক্ষাকেই প্রথমে ছয়-ঘরা চালনীতে ছাঁকিয়া ছোট ছোট লাক্ষার কণিকাগুলি বাহির করিয়া লইয়া, বড় বড় দানাগুলি, যাহা চালনীর ছিদ্রে গলে না, তাহা বাটিয়া গুঁড়াইয়া, যাহাতে সমস্ত মাল ছয়-ঘরা চালনীর ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হয় এরূপ করিয়া লওয়া হয়। উক্ত দুই দফার মালই শেষে মিশ্রিত করিয়া ধৌত করা হয়। এই উপায়ে লাক্ষার যে সকল চূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থাতেই ছয়-ঘরা চালনীর ভিতর দিয়া গলিয়া যায়, সেগুলিকে পুনরায় গুঁড়াইবার শ্রম লাঘব করা হয়।

উক্ত প্রস্তুত-প্রণালীতে বহুবিধ দোষ থাকায় উহা দ্বারা উৎপন্ন বস্তুও অত্যন্ত অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা দেখা গিয়াছে যে, উৎপন্ন গালার ভাল মন্দ গুণ নিম্নলিখিত তত্ত্ব বা মূলসূত্রগুলির প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। এই সকল নিয়ম বা মূলতত্ত্ব যথাযথভাবে পালন করিলে অত্যুৎকৃষ্ট (superfine), উৎকৃষ্ট (fine) এবং নির্দ্দিষ্ট আদর্শের (standard) গালা সকলেই সকল সময়ে প্রস্তুত করিতে পারিবে। কাঁচা মাল (raw materials) বা স্বাভাবিক উপকরণ যেরূপই হউক না কেন, বীজ-লাক্ষার (seed lac) গুণানুযায়ী প্রস্তুত গালা অত্যুৎকৃষ্ট বা নিম্নশ্রেণীর হইবে। কাঁচা মাল সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর হইলে প্রস্তুত দ্রব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট হয়, মধ্যম শ্রেণীর হইলে আংশিক অত্যুৎকৃষ্ট এবং আংশিক উৎকৃষ্ট হয় এবং যারপর নাই নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচা মাল হইতেও উৎকৃষ্ট এবং নির্দ্দিষ্ট আদর্শের গালা উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর এবং T. N. শ্রেণীর গালা প্রস্তুত করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; কারণ, উচ্চতর স্তরের সহিত মিশায় উহা অত্যন্ত অল্প মূল্যে বিক্রীত হয়।

গালা প্রস্তুত করিবার প্রণালী নিম্নলিখিত তত্ত্ব বা মূলসূত্রগুলির উপর নির্ভর করে:—

(১) ইহা দেখা যায় যে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত বা অসংশোধিত লাক্ষা ছয়-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া যাইতে পারে, কেবলমাত্র এই ভাবে চূর্ণ করিয়া লইলে, সেই লাক্ষাচূর্ণের মধ্যে রঞ্জক লাক্ষারস (lac dye) আবদ্ধ হইয়া থাকে। লাক্ষা ধৌত করিলেও সেই লাক্ষারস ভিতরে অধৌত থাকিয়া যায় এবং শেষে গলাইবার সময় প্রস্তুত গালাকে দূষিত করে। যদি ঐ লাক্ষাখণ্ডগুলিকে দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া যাইবার মত গুড়ান হয়, তাহা হইলে সমস্ত লাক্ষারস সম্পূর্ণভাবে ধৌত করিয়া দিতে, পারা যায়; ঐ ক্ষুদ্র কণাগুলির মধ্যে উহা একটু থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না;

(২) লাক্ষার বড় বড় দানাগুলিকে চালনীতে ছাঁকিয়া পৃথক করিয়া লইয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে;

(৩) যে সকল দানা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং ধূলিমিশ্রিত, সেগুলিকেও পৃথক ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং ধূলা, মাটি ও অন্যান্য অপরিচ্ছন্নতা বাদ দিয়া তবে গুড়া করিতে হইবে;

(৪) ধূলা ও বাজে জিনিসের গুঁড়া বাদ দেওয়া বাছা লাক্ষা, চূর্ণ করিবার পরে কুলায় ঝাড়িতে নাই, কারণ তাহাতে অপচয় হইবার কথা। বিশুদ্ধ লাক্ষার গুঁড়াগুলি, যাহার সহিত কোনও বাজে জিনিস মিশ্রিত নাই, সেগুলি নষ্ট হইয়া যায়। সেই সকল নির্ম্মল লাক্ষার কণিকাগুলিকে আর কুলায় না ঝাড়িয়া একেবারে ধুইয়া গলাইয়া লইলেই হয়;

(৫) ধৌত করিবার পূর্ব্বে সমস্ত ধূলা মাটি বাদ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন; কারণ, ধূলা মাটি ভিজা অবস্থায় লাক্ষাতে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া থাকিতে চায়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকার কণাগুলিও লাক্ষার গাত্রে লাগিয়া থাকিবার খুব সম্ভাবনা। শেষে গলাইবার সময় সেগুলি ময়লার দাগের বা কলঙ্কের মত থাকিয়া গিয়া গালার উৎকর্ষতা বহু পরিমাণে হ্রাস করিয়া দেয়;

(৬) যদি মলামাটি, যাহা শুষ্ক অবস্থাতেই বাদ দেওয়া যায়, তাহা বিদূরিত করিয়া তাহার পরে কাঁচা বা অবিশুদ্ধ লাক্ষাকে ধৌত করা হয়, তাহা হইলে ধৌত করিবার প্রক্রিয়া অধিকতর সন্তোষজনক হইতে পারে এবং মলিনতার চিহ্নও নিঃশেষে বিলুপ্ত করিতে পারা যায়;

(৭) ধৌত করিবার প্রক্রিয়া অতি অল্প সময়েই এবং ঘষা মাজা সচরাচর যত করিতে হয় তাহার অনেক কমেই তাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে, যদি ধৌতকার্য্য করিবার পূর্ব্বে লাক্ষাকণাগুলিকে দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রে গলিবার যোগ্য করিয়া গুঁড়াইয়া লওয়া হয় এবং তাহা হইতে সমস্ত মলামাটি ও বাজে জিনিস বাদ দেওয়া হয়।

যে পদ্ধতি কার্য্যকালে অবলম্বন করিতে হইবে তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা হইল।

স্বাভাবিক বা অবিশুদ্ধ (crude) লাক্ষা প্রথমে ছয়-ঘরা চালনীতে চালিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। যাহা চালনীর ছিদ্রে না লাগিয়া তাহার উপরে জড় হইবে তাহাকে (ক) চিহ্নিত বলা হইবে, এবং যাহা ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলিয়া তলায় পড়িবে তাহাকে (খ) চিহ্নিত বলা হইবে। এই দুই দফায় মালগুলিকে শেষ প্রক্রিয়া—গলান পর্য্যন্ত পৃথকভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে। (ক) চিহ্নিত দফা, যাহা ছয়-ঘরা চালনীর উপরে জড় হয়, তাহা অবশ্যই একেবারে পরিষ্কার ধূলা ও বাজে জঞ্জাল বিবর্জ্জিত। উহা গুঁড়াইয়া ও দশ-ঘরা চালনীতে চালিয়া বড় বড় দানাগুলিকে পুনরায় গুঁড়াইয়া ও চালনীতে ছাঁকিয়া লইতে হয়, যে পর্য্যন্ত না সমস্ত মাল দশ-ঘরা চালনীর জালের ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হয়। ইহা দেখা গিয়াছে যে, দশ-ঘরা চালনীর ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হওয়া দানাগুলির অভ্যন্তরে লাক্ষারস (lac dye) আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সেই সমস্ত মালই কুলায় না ঝাড়িয়া, একেবারে ধৌত করিবার বিভাগে লইয়া যাওয়া হয়।

(খ) চিহ্নিত দফাটী তৎপরে দশ-ঘরা চালনীতে ছাঁকিয়া, বড় বড় দানাগুলিকে গুঁড়াইয়া লইতে হয়, যে পর্য্যন্ত না সমস্ত মাল দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হয়। উহা আলাদা রাখা হয়। যে দানাগুলি দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলিয়া বাহির হয়, সেগুলিকে আর গুঁড়াইতে নাই। সেগুলিকে কেবল ৩০ হইতে ৪০ ঘরা চালনীতে ছাঁকিয়া বালি ও কাঁকর বাদ দিতে হয়। হাল্‌কা গুঁড়াগুলি হস্ত দ্বারা কুলায় ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়।

উক্ত দুইভাগের মাল অর্থাৎ (১) যাহা দশ-ঘরা চালনীর জালের উপর হইতে জড় করিয়া গুঁড়াইয়া লওয়া হইয়াছিল, এবং (২) যাহা দশ-ঘরা চালনীর জালের ভিতর দিয়া গলিয়া পড়িয়াছিল ও যাহা হইতে ধূলা কুটা বাদ দেওয়া হইয়াছিল, একত্র মিশাইয়া (খ) চিহ্নিত দফা প্রস্তুত হয়। উহা তৎপরে ধৌত করিবার বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়।

যে দানাগুলি ৩০ হইতে ৪০ ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলিয়া পড়ে, সে গুলিকে ১০০ ঘরা চালনীতে চালিয়া লওয়া হয়; তাহাতে অধিকাংশ বালি ও কাঁকর বা ভারি ধূলিকণা বাদ পড়িয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার ফলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা কাঁচা বা অপরিশোধিত লাক্ষার শতকরা দশভাগ হইবে। উহা শ্রমিকদিগের হস্ত দ্বারা কুলার বাতাসে ঝাড়িয়া একটী স্বতন্ত্র বখরা করা হয়, উহাকে (গ) চিহ্নিত দফা বলা যাইতে পারে।

(ক) ও (খ) চিহ্নিত দফায় ধূলা বা বাজে জিনিসের গুঁড়া একেবারে থাকে না বলিয়া, উহাদের ধৌতকার্য্য খুব সহজে সুচারুরূপে সাধিত হইয়া থাকে। ঐ চূর্ণগুলি অতি ক্ষুদ্র, এবং দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হওয়াতে, উহাদের মধ্যে লাক্ষারস (lac dye) আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না।

সাধারণতঃ লাক্ষা ১২ হইতে ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখা আবশ্যক। সেই সময়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত লাক্ষারস গলিয়া যায়। তৎপরে উহা হস্ত বা পদ দ্বারা ঘষিয়া, একখানি বস্ত্রের ভিতর দিয়া গাঢ় রক্তবর্ণ ধোয়া জল ছাঁকিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়; ও যে সকল লাক্ষাচূর্ণ ভাসিয়া উঠে, সেগুলিকে ঐ বস্ত্রে আটকাইয়া পুনরায় গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়বার ধুইয়া ঘষিয়া লইলেই সচরাচর (ক) চিহ্নিত দফার প্রস্তুত কার্য্য সম্পূর্ণ হয়; এবং (খ) চিহ্নিত দফার শেষ ধৌত করা মাল পাইতে হইলে তিন বার ধুইয়া ঘষিয়া লইলেই যথেষ্ট হয়।

অবশেষে গালা প্রচলিত প্রথামত শুষ্ক করা হয়; এবং ধৌত করিবার পূর্ব্বেই সমস্ত ধূলা ও বাজে জিনিস বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, আর কুলায় না ঝাড়িয়া, একেবারে গলাইয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয়। গলাইবার প্রক্রিয়া সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপই হয়।

কখনও কখনও কাঁচা লাক্ষা (crude lac) চাপ্‌ড়া বাঁধিয়া বড় বড় শক্ত তালে পরিণত হয়। লাক্ষা কতকটা পুরাতন হইলে এবং কিছুকাল গলিয়ায় পুরিয়া সঙ্কীর্ণ স্থানে ফেলিয়া রাখিলে ঐরূপ হয়। ঐ রকম মাল প্রাপ্ত হইলে উহাকে দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রে গলিবার উপযোগী করিয়া গুঁড়াইয়া লইয়া ৩০ হইতে ৪০ ঘরা চালনীতে ছাঁকিয়া ধূলিকণা বাদ দিতে হয়। তৎপরে উহা ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। এরূপ স্থলে শুষ্ক করিয়া লইবার পরে সমস্ত তৈয়ারী মাল কুলায় ঝাড়িয়া সূক্ষ্ম চালনীতে চালিয়া, ধৌত করিবার সময় যে সমস্ত বালি ও বাজে জিনিসের গুঁড়া গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে, সে গুলি বিদূরিত করিতে হয়। যে দানাগুলি ৩০ কি ৪০ ঘরা চালনীর ছিদ্রে গলিয়া যায়, তাহা কুলায় ঝাড়িয়া, যে সকল গালার গুঁড়া তাহাতে মিশ্রিত থাকে, তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়।

ইহা দেখা গিয়াছে যে, উক্ত প্রস্তুত-প্রণালী অবলম্বন করিলে (ক) চিহ্নিত উত্তম শ্রেণীর লাক্ষা হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুনির্ম্মল (superfine) গালা, এবং (ক) চিহ্নিত অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচা লাক্ষা হইতে যে গালা পাওয়া যায় তাহা অত্যুৎকৃষ্টের কাছাকাছি উৎকৃষ্ট (fine) হইতে নিকৃষ্টতর নহে। (খ) চিহ্নিত উত্তম শ্রেণীর লাক্ষা হইতে উৎকৃষ্ট (fine) এবং অত্যুৎকৃষ্ট (superfine) এবং (খ) চিহ্নিত যে কোনও নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচা বা অসংশোধিত লাক্ষা হইতে ১নং উচ্চ আদর্শের (high standard No. 1) এবং উৎকৃষ্ট (fine) শ্রেণীর গালা পাওয়া যায়। (গ) চিহ্নিত দফায়, সমস্ত সূক্ষ্মতম কণাগুলি থাকে; তাহা হইতে মলামাটি একেবারে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। উহা সমস্ত মালের শতকরা দশভাগের অধিক হইবে না। উহা হইতে কেবল T. N. অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্তরের গালা পাওয়া যায়। যে লাক্ষা ভাল পাকাইয়া গিয়াছে এবং যাহা হইতে ইতঃপূর্ব্বে T. N. অর্থাৎ নিকৃষ্টতম ব্যতীত অপর কোনও উচ্চতর গুণবিশিষ্ট গালা পাওয়া যাইত না, তাহা হইতেও উপরে বর্ণিত প্রণালীতে ১নং আদর্শের (standard No. 1) অথবা উৎকৃষ্ট (fine) শ্রেণীর গালা পাওয়া যায়।

খাত্রা গালার কারখানায় (Khatra Shellac Factory) একটী আদর্শ পরীক্ষার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার ফল নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

৬০ সের কাঁচা (crude) লাক্ষা লওয়া হয়। উহা ছয়-ঘরা চালনীতে চালিয়া অপেক্ষাকৃত বড় বড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাগুলি, যাহাতে কোনও বাজে জিনিস মিশ্রিত নাই, তাহা সংগ্রহ করা হইল। ছয়-ঘরা চালনীর ছিদ্রে গলে না এরূপ মালের ওজন হইল ৩০ সের। উহাকে কুলার বাতাসে ঝাড়িয়া এবং গুঁড়াইয়া দশ-ঘরা চালনীতে ছাঁকিবার উপযোগী করিয়া লওয়া হইল। উহাই ১ম দফা মাল ধৌত করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ছয়-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া যাহা ছাঁকিয়া নীচে পড়িয়াছিল, তাহা কুলার বাতাসে হস্ত দ্বারা ধূলা ঝাড়িয়া নিম্নলিখিত বস্তু পাওয়া গেল:—

	সের	ছটাক।
ছয়-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলিয়া পড়া মাল।	২২	১২
লঘু বাদ দেওয়া জিনিস যাহাতে লাক্ষা নাই।	১	০
ধূলা ও অন্যান্য বাদ দেওয়া বাজে জিনিস (যাহা হইতে লাক্ষা সংগ্রহ করিতে হইবে)।	৪	৪
লঘু পরিত্যক্ত জিনিস হইতে সংগৃহীত লাক্ষা যাহা পরবর্ত্তী দফায় ব্যবহার করিতে হইবে।	১	০

ছয়-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলিয়া পড়া গুড়াগুলিকে পরে দশ ঘরা চালনীতে ছাঁকিয়া, যে গুঁড়াগুলি যথেষ্ট সূক্ষ্ম, সেগুলিকে আবার গুঁড়াইবার ব্যয় ও অযথা ধূলি বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা যতদূর সম্ভব লাঘব করিবার জন্য, তাহা আলাদা করিয়া রাখিতে হয়। দশ-ঘরা চালনীর উপরে জড় করা অপরিষ্কৃত মাল জাতায় পিষিয়া লইতে হয়; যাহাতে সমস্ত মালই ঐ চালনীর ছিদ্রের ভিতর

দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হয়। ঐ গুলি ধৌত করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত দ্বিতীয় দফার মাল হইল।

ধূলা ও বাদ দেওয়া মাল (যাহা হইতে লাক্ষা সংগ্রহ করিতে হইবে) ধৌত করিবার জন্য পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। প্রথম দফার লাক্ষার গায়ে যে সামান্য ধূলা লাগিয়া থাকে এবং তাহার মধ্যে যে লাক্ষারস বা রং মিশ্রিত থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীকরণের জন্য ঐ লাক্ষা দুইবার মাত্র ধৌত করিয়া ও মাজিয়া ঘষিয়া লওয়া দরকার। দ্বিতীয় দফার লাক্ষা তিন বার মাত্র ঐরূপ ধুইয়া ঘষিয়া লইলেই শেষে ধৌত করা তৈয়ারী মাল পাওয়া যায়। ধূলা ও বাদ দেওয়া ৪ সের ৪ ছটাক মাল তৎপরে ধৌত করা হয়। অধিকাংশ বাজুকাই সহজে পৃথক হইয়া যায়, কারণ সেগুলি ভারি বলিয়া তলায় গিয়া জমা হয়। শেষের তৈয়ারী মাল পাইবার জন্য চার পাঁচবার ধুইয়া লওয়া দরকার।

কাঁচা (crude) লাক্ষা বাটিবার ও ধুইবার পূর্ব্বে কুলার বাতাসে ধূলা ঝাড়িয়া লওয়া হয় বলিয়া, ধৌত করিবার পরে আর তাহা ঝাড়িয়া ধূলা বাহির করিয়া লইবার দরকার হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় দফা মালের ওজন যথাক্রমে ২৩।০ সের ও ১৭৸০ সের এবং উহা প্রধানতঃ সমস্ত লাক্ষার সমষ্টি। ধূলা ও বাদ দেওয়া মাল ছাঁকিয়া ও ঝাড়িয়া মোট ২ সের ১১ ছটাক লাক্ষা গলাইবার জন্য প্রস্তুত ভাবে পাওয়া যায়। ধৌত করা লাক্ষার পরিমাণ—

	সের	ছটাক।
১ম দফা	২৩	৮
২য় দফা	১৭	১২
ধূলা ও বাদ দেওয়া বা "ঝাড়তি" মাল	২	১১
ধূলা বাদ দেওয়া জঞ্জাল হইতে সংগৃহীত লাক্ষা যাহা পরবর্ত্তী দফায় ব্যবহারের জন্য রক্ষিত	১	০
মোট	৪৪	১৫

উক্ত তৈয়ারী মাল ঐ কারখানায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবে কাজ করিয়া সুফলের যে উচ্চতম পরিমাণ লিপিবদ্ধ আছে তাহার সমকক্ষ। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে প্রস্তুত মালের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য উহার গুণের উৎকর্ষের ক্ষতি করা হয় নাই। ঐ কারখানায় সচরাচর উৎপন্ন মালের পরিমাণ উহা হইতে অনেক কম।

ইহাও পরিদৃষ্ট হইবে যে, এই নূতন পদ্ধতিতে কোনও অতিরিক্ত শ্রমের প্রয়োজন হয় নাই, কারণ ঝাড়িবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা ধৌত করিবার পরে করা হইত, তাহা না হইয়া ধৌত করিবার পূর্ব্বে করা হইয়াছে। যদিও দশ-ঘরা চালনীতে গলিবার উপযোগী করিয়া গুঁড়াইবার জন্য কিছু বেশী শ্রমের দরকার হইয়াছে, তেমনি ধূলা ও সূক্ষ্ম চূর্ণগুলিকে গুঁড়াইতে না দিয়া অনেক শ্রমের লাঘব করা হইয়াছে।

সন্তরণ-প্রতিযোগিতা

ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটীর চেষ্টায় চন্দননগর চৌধুরী ঘাট হইতে কলিকাতার আহীরীটোলা ঘাট পর্য্যন্ত ২২ মাইল দীর্ঘ একটী সন্তরণ-প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। প্রতি বৎসরই এই প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে—এবার তৃতীয় বৎসর। ১৯২২ সালে এই সন্তরণ-প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয়। সেবার মাত্র ৭ জন প্রতিযোগী গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়াছিলেন। সেবার বাগবাজার সুইমিং ক্লাবের শ্রীমান বীরেন্দ্রকুমার বসু চন্দননগর চৌধুরী ঘাট হইতে আহীরীটোলা ঘাট পর্য্যন্ত ২২ মাইল পথ ৪ ঘণ্টা ২৪ মিনিটে অতিক্রম করিয়া প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ইহার তিন মিনিট পরে গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়া শ্রীমান আশুতোষ দত্ত দ্বিতীয় স্থান অধিকার

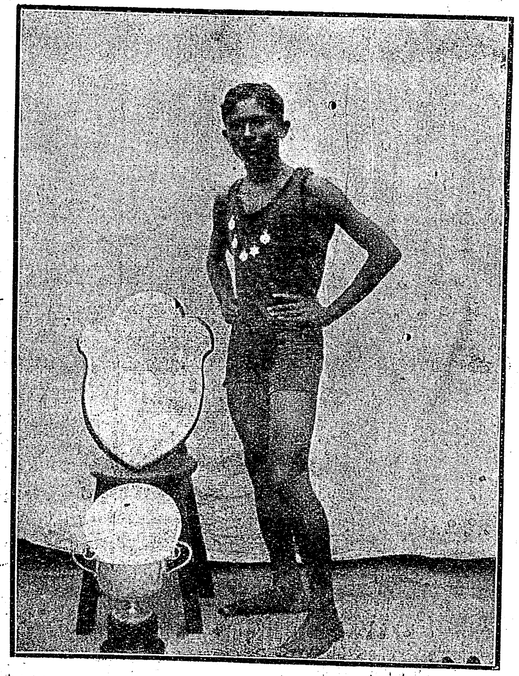

শ্রীমান জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

করেন। তৎপর বৎসরের প্রতিযোগিতায় শ্রীমান আশুতোষ দত্তই প্রথম হন। দ্বিতীয় বৎসর মোট ১৩ জন প্রতিযোগী আহীরীটোলা ঘাটে উপস্থিত হন।

বর্ত্তমান বৎসরে মোট ২৩ জন প্রতিযোগী সন্তরণে প্রস্তুত হন। তন্মধ্যে দুইজন শেষ বরাবর সন্তরণে যোগ দেন নাই। অপর একজন মধ্যপথে সন্তরণে ক্ষান্ত হন। অবশিষ্ট সকলে আহীরীটোলার ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীমান জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়া প্রথম বলিয়া গণ্য হন। শ্রীমান গোপীনাথ রায় ও শ্রীমান রাধাবল্লভ সাধুখাঁ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। শ্রীমান জ্ঞানচন্দ্রের বয়স ১৮ বৎসর। অপর দুইজনই ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক।

সন্তরণ-প্রতিযোগিতার সময় কর্ত্তৃপক্ষ খুব সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রবিবার প্রতিযোগিতা হয়,—শনিবার রাত্রে লাইফ সেভিং সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষ ৫৬খানি ষ্টীমার ও বহু সংখ্যক নৌকা চন্দননগর চৌধুরী ঘাটে পাঠাইয়া দেন। নৌকায় ও ষ্টীমারে বাদ্যের বন্দোবস্ত ছিল। এবার সন্তরণ-প্রতিযোগিতা দেখিবার জন্য গঙ্গার উভয় তীরে ঘাটে অঘাটে বহু সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও দর্শক শ্রেণীর মধ্যে ছিলেন। নৌকায় ও ষ্টীমারেও বহু দর্শক ছিলেন।

প্রতিযোগিতার শেষে একটী সভা হয়। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতি রূপে পুরস্কার বিতরণ করেন। ১৯২৩ ও ১৯২৪ সালের পুরস্কার একই সঙ্গে প্রদত্ত হয়।

১৯২৪ সালের প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীমান জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এন, সি, চ্যাটার্জ্জি মেমোরিয়েল শীল্ড, সোণার মেডেল, রূপার মেডেল, ও রূপার ট্রে পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পুরস্কার—সোণার রিষ্ট ওয়াচ, সোণার মেডেল শ্রীমান গোপীনাথ রায় প্রাপ্ত হন। পুরস্কার প্রদানের পর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় একটী হৃদয়-স্পর্শী বক্তৃতা করেন। তৎপরে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীমান সত্যরঞ্জন দাসগুপ্ত

ইনি ১৯১৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের M. Sc. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন; তৎপরে প্রথমে মৈমনসিং কলেজে ও পরে হুগলী কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হন।

শ্রীমান সত্যরঞ্জন দাসগুপ্ত

এদেশে অনেক স্বভাবজাত দ্রব্য,—যাহা হইতে অতি প্রয়োজনীয় নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে—ও তদ্দ্বারা দেশের অর্থ-সমস্যা ও অভাবের প্রতিবিধান হইতে পারে—কেবল উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে নষ্ট হইতেছে অনুভব করিয়া—M. Sc. পাশ করিবার পর হইতেই তিনি নানা উপায়ে ঐ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছিলেন। অধ্যাপকের সমস্ত কর্ত্তব্যের পরও কলিকাতার Commercial Library'র ঐ সম্বন্ধীয় সমস্ত পুস্তক সম্যক রূপে অধ্যয়নের অবসর করিয়া লইয়াছিলেন।

ইনি Bangaloreএ—'Biochemical Process of Leather Tannery সম্বন্ধে research করিতেছিলেন। তার পর Calcutta Research Tanneryতেও কিছুকাল research করেন। তিনি ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতা হইতে Morvada জাহাজে জার্ম্মাণী যাত্রা করেন। Darmstadtএ দুই বৎসর কাল মাত্র কার্য্য (research) করিয়া তিনি Doctor of Chemical Enn geering উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন। এইরূপে প্রভূত অধ্যবসায় ও কঠিন পরিশ্রমে তিনি ৬ বৎসরের course মাত্র দুই বৎসরে শেষ করিয়াছেন। ইহা বোধ হয় কেবল মাত্র বাঙ্গালী যুবক সত্যরঞ্জনেই সম্ভব।

এই ত গেল লেখা পড়ার কথা। ইহা ছাড়া, খেলা ধূলাতেও তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। তিনি একজন ভাল athlete ছিলেন। Cricket ও Tennisএ তাঁহার সমকক্ষ খেলোয়াড় হুগলীতে তাঁহার সময় খুব কমই ছিল। সর্ব্বোপরি তাঁহার ছাত্রদের প্রতি ভালবাসা ও ব্যবহার তাহাদের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অটুট করিয়া রাখিয়াছে।

বিদেশে বাঙ্গালী খেলোয়াড় দল

১। সাভা-বিজয়ী বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড় দল (পরিচয়ঃ—বাম হইতে দক্ষিণে—সকলের পিছন দিকে, (১) গাঙ্গুলী, পূর্ণদাস সামাদ; দণ্ডায়মান—ফণী মিত্র; পাঁচু চ্যাটার্জ্জি, হেমাঙ্গ বসু, রহমান, বলাই চ্যাটার্জ্জি, প্রফুল্ল চ্যাটার্জ্জি, মনা দত্ত। চেয়ারে উপবিষ্ট,—হাইদার, মণি দাস, রসার, পি, গুপ্ত, সুধীর দাস। ভূমিতে উপবিষ্ট—মণীন্দ্র দত্তরায়, দীনেশ গুপ্ত।

একটী বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড়ের দল সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ ও যবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া ফুটবল খেলায় জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে যত ফুটবল খেলোয়াড়ের দল আছে, তাহার মধ্যে বাছাই করিয়া এ, বি, রসার সাহেব একটী মিশ্র দল গঠন করেন, এবং সেই দল রেঙ্গুন, শিঙ্গাপুর ও যবদ্বীপে ভ্রমণ করিয়া স্থানীয় সকল ফুটবল খেলোয়াড় দলকে খেলায় পরাজিত করেন।

বাঙ্গালী আগন্তুক খেলোয়াড় দলের সঙ্গে ফুটবল খেলিবার জন্য সকল যায়গাতেই বাছা বাছা স্থানীয়

বলাই চ্যাটার্জ্জি হেড করে' হেমাঙ্গ বোসকে 'বল' 'পাশ' করে দিচ্ছেন

খেলোয়াড়দের দল গড়া হইয়াছিল। তা'ছাড়া সে সব যায়গায় সবচেয়ে ভাল খেলোয়াড় দলের সঙ্গেও বাঙ্গালীদের খেলা হইয়াছিল। রেঙ্গুনের বাছা দলের সঙ্গে খেলায় বাঙ্গালীরা এক গোলে জিতিয়াছেন। শিঙ্গাপুরের বাছা

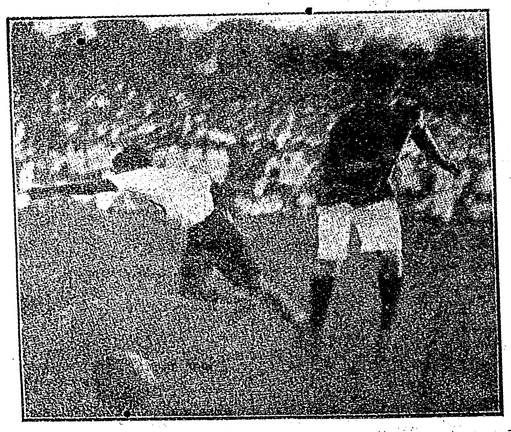

হারকিউলিস দলের সঙ্গে খেলায় রবি গাঙ্গুলী 'স্যুট' করে 'গোল' দিচ্ছেন।

দলের সঙ্গে তাঁরা ৪ গোলে জিতিয়াছেন। শিঙ্গাপুরের চীনাদের দলকে তাঁরা এক গোল খাওয়াইয়া আসিয়াছেন। যাভার হারকিউলিস দলকে তাঁরা ২ গোল দিয়াছেন। যাভার সোয়রাবায়ার বাছা দল তাঁহাদের কাছে এক গোল খাইয়াছে। যাভার ব্যান্ডোঙের বাছা দলকেও তাঁরা

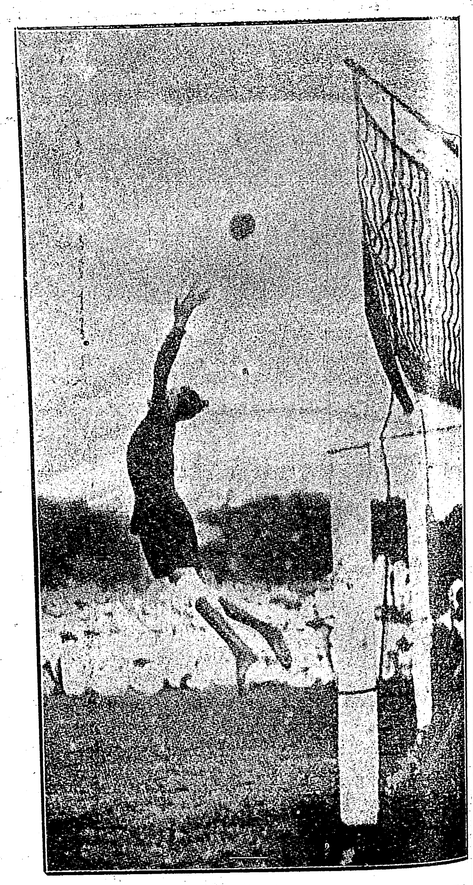

গোলকিপার পূর্ণদাস 'গোল' বাঁচাবার জন্য কর্ণার কচ্ছেন।

এক গোল দিয়া আসিয়াছেন। এই সব খেলাতেই প্রতিপক্ষ দল বাঙ্গালী দলকে একটাও গোল দিতে পারেন নাই। এদের মধ্যে হারকিউলিস দল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ—তাঁরা গত ১২ বছরের মধ্যে একটাও ম্যাচে হারেন নাই। এমন কি তাঁরা অষ্ট্রেলিয়াতে গিয়ে অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় দলকেও হারাইয়া দিয়া আসিয়াছিলেন।

যাভা বিজয়ী বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড় দল। পরিচয়ঃ—বাম হইতে দক্ষিণে (১) এইচ, বসু; (২) বি, ডি, চ্যাটার্জ্জি; (৩) রহমান; (৪) এম, দাস; (ক্যাপ্টেন); (৫) পি, দাস; (৬) পি, চ্যাটার্জ্জি; (৭) এফ, মিত্র; (৮) এম, দত্ত; (৯) ডি, গুপ্ত; (১০) আর, গাঙ্গুলী ও (১১) সামাদ।

যাজপুর

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

বালেশ্বর হইতে যাজপুর যাইতেছিলাম। সকাল বেলা ট্রেণ ছাড়িবার কথা। তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু ট্রেণ আসিল সন্ধ্যার পর। কারণ লিলুয়ার ধর্ম্মঘটকারিগণ ভোগপুরের নিকট রেলের লাইন খুলিয়া রাখিয়াছিল, গাড়ী উলটিয়া গিয়াছিল। সারাদিন ষ্টেশনে বসিয়া থাকিতে হইল। যাজপুর রোড ষ্টেশনে পৌছিলাম রাত্রি ১০টার সময়। ষ্টেশনের নিকট ডাকবাঙ্গলাতে রাত্রি কাটাইলাম। সকালে উঠিয়া যাজপুর রওনা হইলাম। ৮ ক্রোশ পথ। পূর্ব্ব হইতে গরুর গাড়ী বা পাল্কীর বন্দোবস্ত করিতে হয়। আমার সঙ্গে পাল্কী ছিল। তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া পাল্কীতে উঠিলাম। বেহারারা নানাবিধ দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পাল্কী লইয়া চলিল। পথে একটি বৃহৎ খাল পার হইলাম। ইহা High Level Canal নামে পরিচিত। যাইতে যাইতে পথ হইতে অনতিদূরে কয়েকটি প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। এগুলি অনাবৃত স্থানে পড়িয়া আছে। রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত না হইলে কালক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিছুক্ষণ পরে পথ বৈতরণীর তীরে তীরে চলিল।

পথের দুই ধারে লোকালয়। তাল খেজুর নারিকেল আম প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষপুঞ্জ শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। একটি সুন্দর মন্দির দেখিলাম। মন্দিরটি আধুনিক। একজন সাহু (মহাজন) ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মন্দিরের মেঝে মর্ম্মরমণ্ডিত। অনেক চিত্র ও মূর্ত্তির দ্বারা মন্দিরটি সুশোভিত। কিছু দূর গিয়া বৈতরণী পার হইলাম। বেলা ১১টার সময় যাজপুর পৌঁছিলাম। ৮ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে ৪৷৷০ ঘণ্টা লাগিল।

যাজপুর অতি প্রাচীন স্থান। মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। যাজপুর যজ্ঞপুর শব্দের অপভ্রংশ। প্রবাদ এই যে, ব্রহ্মা এখানে যজ্ঞ করিয়াছেন।

এতে কলিঙ্গা কৌন্তেয় যত্র বৈতারণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাচ্ছরণমেত্য বৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতং।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং গিরিসেবিতং॥

মহাভারত, বনপর্ব।

পুরাকালে এই পুণ্যভূমিতে ঋষিগণ বাস করিতেন। এখনও এখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস। বহু ব্রাহ্মণের বাস বলিয়া পূর্ব্বে ইহা দ্বিজভূমি বা ব্রাহ্মণ-নগর নামে পরিচিত ছিল। যাজপুর এক সময়ে উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। যাজপুরের অসংখ্য হিন্দু দেবালয় ইহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে। পরে রাজধানী এখান হইতে কটকে উঠিয়া গিয়াছিল। ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবকে যাজপুরের নিকটেই পরাভূত ও নিহত করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে উড়িষ্যায় হিন্দু রাজত্বের লোপ হয়।

যাজপুরে প্রধান মন্দির দুইটি—বিরজাদেবীর মন্দির (বা ঠাকুরাণীর মন্দির) এবং বরাহনাথের মন্দির। বিরজাদেবীর মাহাত্ম্যে এই স্থানের নাম বিরজাক্ষেত্র এবং ইহা ৫১ পীঠের মধ্যে অন্যতম। বিরজাদেবীর মন্দির বৈতরণী হইতে দুই মাইল দূরে। মন্দিরটি প্রাচীন। চারিদিকে পাথরের দেওয়াল দিয়া ঘেরা। এই দেওয়াল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি একজন সাধুর চেষ্টায় জীর্ণ-সংস্কার হইয়াছে। শুনিলাম, সাধুটি প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে একটি হাঁড়ি রাখিয়া অনুরোধ করেন, যেন প্রত্যহ এক মুষ্টি করিয়া চাউল এই মন্দিরে দেওয়া হয়। এই সহজ উপায়ে তিনি এই বৃহৎ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার পূর্ব্বদিকে। প্রবেশ-মার্গের দুই পার্শ্বে দুইটি সিংহ। উপরে একটি মন্দির আছে। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া একটি মন্দিরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ দেখিলাম। যাত্রিগণকে এখানে প্রণাম করিতে হয়। মূল মন্দিরের সংলগ্ন আর একটি মন্দির আছে। ইহা জগমোহন নামে পরিচিত। বিরজাদেবীর মূর্ত্তি কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত, পর্য্যাপ্ত পরিচ্ছদে ভূষিত, নানাবিধ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত,—বক্ষ পর্য্যন্ত রৌপ্যের অলঙ্কার, তদূর্দ্ধে স্বর্ণালঙ্কার। মূল বিগ্রহের পার্শ্বে একটি পিতলের ভোগ-মূর্ত্তি—উৎসবের সময় এই মূর্ত্তি বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। মন্দিরের বাহিরে আমরা একটি বৃহৎ রথ দেখিয়াছিলাম। শুনিলাম বিরজাদেবীর রথযাত্রা হয়।

মন্দিরের নিকট কয়েকটি শিবালয় আছে। একটি মন্দিরের মধ্যে একটী কূপ আছে, ইহাকে নাভিগয়া বলে। প্রবাদ এই যে, গয়াসুরের মস্তক গয়াতে পড়িয়াছিল, নাভি এইখানে পড়িয়াছিল, এবং পদদ্বয় রাজামাহেন্দ্রীতে (গোদাবরীতে) পড়িয়াছিল। অপর প্রবাদ অনুসারে সতীর নাভি এই স্থানে পড়িয়াছিল। যাত্রিগণ এখানে তর্পণ করিয়া কূপমধ্যে পিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া থাকে। বিরজাদেবীর মন্দিরের নিকটে একটী প্রাচীন প্রস্তরাবদ্ধ সরোবর আছে। ইহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড।

বরাহনাথের মন্দির বৈতরণীর মধ্যে একটী দ্বীপের উপর অবস্থিত। মন্দিরের উত্তর দিকে নদীর ধারাতে সর্ব্বদা জল থাকে; দক্ষিণের ধারাতে জল প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। আমরা প্রথমে বৈতরণীতে স্নান করিতে চলিলাম। মন্দিরের পাশেই বহু সংখ্যক পাণ্ডাদের বাড়ী। পাণ্ডাদের অবস্থা আজকাল বড় খারাপ—বাড়ীগুলি তাহার পরিচয় দিতেছে। সাধারণতঃ দরজার পাশে দেওয়ালের উপর আলপনা দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। অধিকাংশ বাড়ীর সম্মুখে উচ্চ তুলসীমঞ্চ। ইহা উৎকলের বিশেষত্ব। একটী তুলসীমঞ্চের তলে একটী প্রস্তরের সুগঠিত রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। সম্ভবতঃ ইহা মন্দিরের কোন অংশ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

বৈতরণীতে স্নান সারিয়া আমরা মন্দির দেখিতে গেলাম। এখানে প্রধান বিগ্রহ বরাহ অবতার; নিম্নভাগ মনুষ্যাকৃতি—মুখ বরাহের ন্যায়। ইহার এক পার্শ্বে

শ্বেতবরাহ—যাঁহার কল্প এক্ষণে প্রচলিত; অপর পার্শ্বে গজলক্ষ্মী। মন্দিরের বাহিরেও একটি বেদীর উপর বরাহদেবের মূর্ত্তি রহিয়াছে। বাম ভুজ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত—তাহার উপর একটি ক্ষুদ্র আকারের লক্ষ্মীমূর্ত্তি। মন্দিরের পার্শ্বে দশাশ্বমেধ ঘাট। প্রবাদ এই যে, ব্রহ্মা এখানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বৈতরণীর প্রবাহ এক্ষণে ঘাট হইতে সরিয়া গিয়াছে। ঘাটের সম্মুখে অল্পপরিমাণে স্রোতহীন জল পড়িয়া রহিয়াছে। মন্দিরের দেওয়ালে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রাকৃতি প্রস্তর-মূর্ত্তি রহিয়াছে।

এখান হইতে জগন্নাথদেবের মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। এই মন্দির বৈতরণীর দক্ষিণ তীরে নদীর বর্ত্তমান প্রবাহ হইতে কিছু দূরে। এই মন্দিরটিও প্রাচীন; চারিদিকে প্রস্তরের উচ্চ দেওয়াল—প্রাঙ্গণে নারিকেল প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ। মন্দিরমধ্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি—পুরীর মন্দিরের ন্যায়। জগন্নাথদেবের মন্দিরের বাহিরে গণেশের মন্দির। তাহার পার্শ্বে অষ্টমাতৃকার মন্দির। এই মন্দির মধ্যে সারি সারি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি—বারাহী, চামুণ্ডা, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী ও নারসিংহী। মূর্ত্তিগুলি নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত। কাহারও মুখে প্রসন্ন ভাব, কাহারও মুখে রুদ্র ভাব,—নানাবিধ ভাব সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিয়া শিল্পীর শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় দিতেছে।

এতদ্ব্যতীত যাজপুরে একটী প্রাচীন স্তম্ভ আছে, ইহার নাম শুভস্তম্ভ। বিরজাদেবীর মন্দিরে যাইবার পথ হইতে কিছু দূরে এই স্তম্ভ অবস্থিত। স্তম্ভটি কৃষ্ণপ্রস্তরের, উৎকৃষ্ট ভাবে পালিশ করা। ইহা তিনটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর অবস্থিত। ইহা একটী প্রস্তরখণ্ড হইতে নির্ম্মিত (Monolith)—দৈর্ঘ্যে ২২।২৩ ফুট। ইহার উপর ১০ফুট আন্দাজ অপর একটী প্রস্তর। তাহার গায়ে সিংহের মুখ এবং নির্ম্মাল্য উৎকীর্ণ হইয়াছে। উপরে গরুড় মূর্ত্তি ছিল, এখন তাহা একটি মন্দির মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। এই স্তম্ভের নিকটে কোন মন্দিরের চিহ্ন নাই। কালাপাহাড় এই স্তম্ভটি সরাইবার জন্য ইহার গায়ে ছিদ্র করিয়া দড়ি গলাইয়া হাতী দিয়া টানিয়াছিল, বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, এই স্তম্ভমধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মণিমুক্তাদি ছিল, তাহা এক সন্ন্যাসী বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভটি কোন রাজা কর্ত্তৃক কখন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা স্থির হয় নাই। ইহা কীর্ত্তিস্তম্ভ, গরুড়স্তম্ভ বা সভাস্তম্ভ নামে পরিচিত।

বিরজাদেবীর মন্দিরে যাইবার পথে একটী সেতু আছে। ইহা তেঁতুলিমাল বা এগারনালা নামে পরিচিত। ইহার গঠন-প্রণালী পুরীর বিখ্যাত আঠারনালা সেতুর অনুরূপ,—খিলান ব্যবহৃত হয় নাই। সেতুটি খুব প্রাচীন। স্থানে স্থানে পাথরের উপর বিবিধ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে।

যাজপুরের সবডিভিসনাল অফিসারের আফিসের নিকটেই চারিটি অতিশয় বৃহৎ আকারের প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে,—মূর্ত্তিগুলি বারাহী, চামুণ্ডা, ইন্দ্রাণী, ও শান্ত মাধবের। প্রথম তিনটি মূর্ত্তি সার্দ্ধপঞ্চহস্ত পরিমিত। বরাহী দেবী মহিষাসনা, নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা, তাঁহার ক্রোড়ে শিশু। চামুণ্ডামূর্ত্তি অতি ভয়ানক,—শুষ্কদেহ মুণ্ডমালাবিভূষিত। ইন্দ্রাণী গজারূঢ়া, সৌম্যমূর্ত্তি—ইঁহারও ক্রোড়ে শিশু। শান্ত মাধবের মূর্ত্তি অতি বৃহৎ—১৬।১৭ ফুট দীর্ঘ। মূর্ত্তিটি স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে। এক্ষণে ভূমির উপর পড়িয়া আছে।

যাজপুরের নানা স্থানে বহুসংখ্যক শিবালয় আছে। মন্দিরগুলির আকার ক্ষুদ্র। অনেক মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মুসলমানগণ বিশেষতঃ কালাপাহাড় অনেক মন্দির এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

উৎকলের অন্য তীর্থের ন্যায় যাজপুর শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। যাজপুরে চৈতন্যদেবের লীলার বিস্তারিত বিবরণ ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের "উৎকলে শ্রীচৈতন্য" গ্রন্থে লিখিত আছে। শ্রীচৈতন্যদেব দশাশ্বমেধ-ঘাটে স্নান করিয়া বরাহদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। পরে বিরজাদেবীর মন্দিরে গিয়া ভক্তিভরে দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। সেখানে নাভিগয়াতে পিতৃকৃত্য সমাপন করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন। অতঃপর চৈতন্যদেব নিজ শিষ্যগণের নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া একাকী যাজপুরের অসংখ্য মন্দির এবং দেবদেবী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। যাজপুরে কত মন্দির ও দেবালয় ছিল, সে সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

লক্ষ বৎসরেও নারি লৈতে সব নাম।
যাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান॥

দেবালয় নাহি হেন নাহি তথা স্থান।
কেবল দেবের বাস যাজপুর গ্রাম॥

যাজপুরের সে গৌরব-দিবস আজ নাই। বিশেষতঃ রেলওয়ে হইবার পর হইতে যাজপুরের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। পূর্ব্বে যাত্রিগণ যখন পদব্রজে যাইত, তখন সকল জগন্নাথযাত্রী যাজপুর দিয়া যাইত; এখানে মন্দির ও তীর্থ সকল দর্শন করিত। এক্ষণে রেলওয়ে লাইন এখান হইতে ৮ ক্রোশ দূর দিয়া গিয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক যাত্রী এক্ষণে কষ্ট করিয়া যাজপুরে আসে। যাজপুরের ব্রাহ্মণগণের এক্ষণে অতিশয় দুরবস্থা।

যাজপুর হইতে আমি যাজপুর রোড ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। এই ষ্টেশনের নাম পূর্ব্বে ব্যাসসরোবর ছিল। ষ্টেশন হইতে মাইল খানেক দূরে বনের মধ্যে একটি দেবালয় আছে। এখানে বৎসরে একবার করিয়া মেলা বসে। আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন স্থানটি জনহীন। দেবালয়ের চারিদিক খোলা,—কয়েকটি স্তম্ভের উপর ছাদ রহিয়াছে। মধ্যস্থলে একটি সমাধি। তাহার পার্শ্বে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত জটাজুট-মণ্ডিত, অক্ষমালা-সমন্বিত একটী মূর্ত্তি—বোধ হয় ইহাই ব্যাসদেবের মূর্ত্তি।

পুস্তক-পরিচয়

গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী। শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ বসু প্রণীত, মূল্য দুই টাকা।—নাম দেখিয়াই বলিতে পারা যায়, এই পুস্তকখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। ইংরাজী ১৯১৪ অব্দের অক্টোবর মাসে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৈলেন্দ্রবাবু, তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র সত্যেন্দ্রবাবু ও শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ দে মহাশয় কয়েকজন অনুচর সহ গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী ভ্রমণে যান। সেই ভ্রমণ-কাহিনী জিতেন্দ্রবাবু অতি সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ প্রদেশের কথা ইতঃপূর্ব্বে আরও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এখানি, বলিতে গেলে, আর এক রকমের; ইহাতে বর্ণনা-কৌশল নাই, উচ্ছ্বাস নাই, আড়ম্বর নাই; অতি সোজা কথায় অথচ মনোরম ভাবে, এই কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পড়িয়া কি তৃপ্তি যে অনুভব করিয়াছি, তাহা বলিবার নহে; বিশেষতঃ বহু দিনের বিস্মৃত-প্রায় দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে উপস্থাপিত হওয়ায়, আমরা অনেক স্থানে তন্ময় হইয়া গিয়াছি। যিনি বইখানি পড়িবেন, তিনিই আনন্দ তৃপ্তি লাভ করিবেন।

পূজ্যপাদ গুরুদাস। শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য তিন টাকা।—প্রাতঃস্মরণীয় পরলোকগত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হওয়া যে প্রয়োজন, এ কথা বাঙ্গালী মাত্রেই স্বীকার করিবেন; আমরাও এতদিন এই মহাত্মার জীবন-চরিত দেখিবার আগ্রহে ছিলাম; শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী মহাশয় আমাদের সে আগ্রহ পূর্ণ করিয়াছেন; তিনি সার গুরুদাসের জীবনের অবশ্য-জ্ঞাতব্য অনেক কথারই অবতারণা করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে সার গুরুদাসের বাল্যজীবন, কার্য্য-কুশলতার পরিচয়, গার্হস্থ্য-জীবন ও প্রকৃতির পরিচয় অবগত হইতে পারা যায়। জীবনী লেখক মহাশয় সার গুরুদাসের সুচিন্তিত পুস্তকাদির সমালোচনা ও তাঁহার মতের বিশ্লেষণ প্রভৃতি করেন নাই; তাহা হইলেই এই জীবন কথা একেবারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। তাহা হইলেও, ভবিষ্যৎ জীবন-চরিতকার এই পুস্তক হইতে যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

তপোময়। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। এই উপন্যাসখানি বাঙ্গলা মায়ের শান্ত, স্নিগ্ধ, শীতল, কল্যাণে সুপবিত্র সুমধুর পল্লীচিত্র। পল্লীবধূগণের সখিভাব, পল্লীজননীগণের বাৎসল্য ভাব, পল্লীবালকবালিকাগণের উগ্র কোমল, অনুমধুর বিচিত্র ভাব, পল্লীপ্রবীণগণের উৎকট শাসক ভাব ও অনুগ্র মৈত্রীভাবে বইখানির আগাগোড়া অনুরঞ্জিত। সার্থক ও ব্যর্থ দাম্পত্য প্রেম—অনূঢ়া তরুণী ও বাল-বিধবার ফোটে-ফোটে-ফোটে-না প্রেম, শিক্ষিতা যুবতীর সুমার্জ্জিত নিক্তিতে-ওজন-করা প্রেম—মানব হৃদয়ের সদসৎ বৃত্তিনিচয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ—বহুচরিত্রের বিবিধ ঘটনা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। পাষাণে-গড়া স্বামী মূর্ত্তি, সেবাপরায়ণা নারী মূর্ত্তি, বিশ্বাস নির্ভরশীলা কিশোরী মূর্ত্তি, বিষাদ-ভরা পত্নী মূর্ত্তি বাৎসল্য-মমতায়-গড়া জননী-মূর্ত্তিতে "অশ্রুময়" পাঠক-পাঠিকাকে না কাঁদাইয়া ছাড়িবে না।

মধ্যযুগে বাঙ্গলা। শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য তিন টাকা।—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় কাহারও নিকট দিতে হইবে না। তিনি অনেক দিন পরে এই 'মধ্যযুগের বাঙ্গলা' লিখিয়াছেন। 'মধ্যযুগ' শব্দ তিনি মুসলমান অধিকারের আরম্ভ হইতে কল্পনা করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার এ ইতিহাস মুসলমান অধিকারের আরম্ভ হইতে পরবর্ত্তী মোগল শাসনের কতক দিনের বিবরণ। এখানি ধারাবাহিক ইতিহাস নহে, তাঁহার কল্পিত মধ্যযুগে রাজ্য শাসন প্রণালী, দেশের ও দশের অবস্থা, সামাজিক ও নৈতিক বিবরণ, বাঙ্গালীর তৎকালিক আচার ব্যবহার

লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বইখানি পাঠ করিলে সে সময়ের সকল ব্যাপারের সুস্পষ্ট চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবীণ ঐতিহাসিককে আমরা সসম্ভ্রম অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

ভগবৎ-প্রসঙ্গ। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা।—এখানি 'ভারতবর্ষ' 'উদ্বোধন' 'সাহিত্য' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত লেখক মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ-সংগ্রহ। প্রবন্ধগুলি যখন নানা পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন সকলেই ইহা সাগ্রহে পাঠ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইলাম। লেখক যে শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি যে নিজে স্বধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি, তাহা এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

সোক্রাটীস।—শ্রীরজনীকান্ত গুহ এম-এ প্রণীত, মূল্য পাঁচ টাকা। শ্রীযুক্ত গুহ মহাশয় গ্রীক্ ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি বহু পরিশ্রমে এই 'সোক্রাটীস' পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু, এখানিতে সোক্রাটীসের জীবন-কথা আরম্ভ করিতেই পারেন নাই। সোক্রাটীসের জীবন-কথা বলিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে গ্রীক জাতি ও গ্রীক সভ্যতার ইতিহাস বলিতে হয়, নতুবা সোক্রাটীসের জীবন-কথা বোধগম্য হয় না। সেই জন্য এই খণ্ডে সুপণ্ডিত রজনীবাবু গ্রীক সভ্যতার ইতিহাসই বিবৃত করিয়াছেন, পরবর্ত্তী খণ্ডে জীবনকথা বলিবেন। গ্রীক্ সভ্যতা সম্বন্ধে কোন ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বহুদিন পূর্ব্বে প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'গ্রীক ও হিন্দু' নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; তাহা অসম্পূর্ণ। অধ্যাপক রজনীবাবু গ্রীক জাতি ও গ্রীক সভ্যতার ইতিহাসের যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার রচনাভঙ্গী অতি সুন্দর, বর্ণনা অতি সরল, আড়ম্বরশূন্য, ভাষা অননুকরণীয়। এমন সুন্দর পুস্তকের আদর অবশ্যম্ভাবী।

ঘরের কথা।—শ্রীহরিহর শেঠ প্রণীত, মূল্য আট আনা। এখানি সংগ্রহ পুস্তক; ইহার অধিকাংশই 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রবন্ধগুলি নিবদ্ধ না রাখিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া গ্রন্থকার ভালই করিয়াছেন। গ্রন্থকার সুলেখক, চিন্তাশীল ব্যক্তি, প্রবন্ধগুলিতে তাঁহার চিন্তাশীলতা সুপরিস্ফুট।

অরবিন্দ-প্রসঙ্গ।—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত, মূল্য দশ আনা। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় যখন বরোদায় ছিলেন, সেই সময় সুলেখক দীনেন্দ্রবাবু তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। দীনেন্দ্রবাবু তাঁহার অনন্যসাধারণ সুমধুর ভাষায় সেই সময়ের অরবিন্দ-প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন। এই বইখানির যে যথেষ্ট আদর হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

হীরের টুকরো।—শ্রীনিশিকান্ত সেন প্রণীত, মূল্য এক টাকা। শিশু-সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বাবু পুস্তকের নামকরণেই ইহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—বইখানি সত্যসত্যই হীরের টুকরো; গল্পগুলি হীরকের মতই জ্বল জ্বল করিতেছে; শিশুরা ত গল্প পড়িয়া মুগ্ধ হইবেই, শিশুদের অভিভাবকেরাও প্রশংসা করিবেন।

সোণার হরিণ।—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু প্রণীত, মূল্য এক টাকা ন' আনা। এখানি গল্প সংগ্রহ। ইহাতে পাঁচটী ছোট গল্প আছে। এগুলি যখন ভারতবর্ষ ও অন্যান্য মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন সকলেই ভাল বলিয়াছিলেন; এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় সকলেই এক এক খণ্ড ঘরে রাখিতে পারিবেন। মণীন্দ্রবাবু উপন্যাস ক্ষেত্রে যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, ছোট গল্প রচনাতেও সে যশঃ অক্ষুণ্ণ আছে।

নাট-মন্দির।—শ্রীসুবোধ রায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা। এই পুস্তকখানিতে তিনটী কথা-নাট্য প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীমান সুবোধের এই নাট-মন্দির প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

শতবর্ষের বাংলা।—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত; মূল্য বার আনা। পূজার সংখ্যা 'প্রবর্ত্তকে' এই শত বর্ষের বাংলা প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সংখ্যা প্রবর্ত্তক আর বাজারে মেলে না; তাই শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় প্রস্তাবটী পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি যত সংখ্যাই এই সংস্করণে ছাপিয়া থাকুন, তাহা অনতিবিলম্বে ফুরাইয়া যাইবে, আবার সংস্করণের প্রয়োজন হইবে, এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। শতবর্ষের বাংলার কথা এমন সুন্দর ভাবে আর কেহ এত দিন বলেন নাই।

আর্য্য নিত্যকৃত্যম্।—শ্রীসারদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ প্রণীত, মূল্য ১৷৷০ টাকা। নিত্যকর্ম্মের পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়; কিন্তু নিত্যকর্ম্ম সর্ব্বথা শাস্ত্রবিহিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই পুস্তকখানি শাস্ত্রবিহিত; সুতরাং যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রে আস্থাবান ও নিত্যকৃত্যের অনুরাগী, তাঁহারা এই পুস্তকখানিকে বহু মূল্য জ্ঞান করিবেন।

স্বাধীন গরীব।—শ্রীজহরলাল দে প্রণীত, মূল্য আট আনা। এখানি গার্হস্থ্য নাটক; তিন অঙ্কে পরিসমাপ্ত। আধুনিক সমাজের কতকগুলি অযথা উৎপীড়নের মর্ম্মভেদী দৃশ্য এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। নাট্যকারের উদ্দেশ্য সাধু; তাঁহার চেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

রসাঙ্কুর।—শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ৸০ আনা। এখানি কবিতা পুস্তক। সাধারণতঃ কবিতা পুস্তকে যে সকল মামুলী কবিতা থাকে, এখানিতে তাহা নাই; কবিতাগুলির অধিকাংশই উপভোগ্য, কোথাও কষ্ট-কল্পনা নাই।

বঙ্গে দুর্গোৎসব।—শ্রীমনোমোহন গুহ প্রণীত, মূল্য ৸০ আনা। এই পুস্তকখানিতে দুর্গোৎসবের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখক মহাশয় সরল ভাষায় দুর্গা পূজার কথা বলিয়াছেন। যে সনাতন

আদর্শের উপর এই উৎসব প্রতিষ্ঠিত, সেই আদর্শ প্রচার করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

সমবায়-বিজ্ঞান।—শ্রীললিতকুমার সেন বি-এ প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। এক্ষণে আমাদের দেশে নানা স্থানে ঘোথ-ঋণদান-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং তাহার দ্বারা সত্যসত্যই অনেক কাজ হইতেছে। এ সময়ে এই সমবায়-বিজ্ঞান প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার জনসাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। সমবায় সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রঙ্গিনী।—শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বিরচিত, মূল্য এক টাকা। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমরা এত দিন উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক বলিয়াই জানিতাম। তিনি প্রবীণ বয়সে নাটক লিখিয়াছেন; সে নাটকও আবার সামাজিক; পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। সুতরাং নাটকখানি পড়িবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। এ নাটকে দার্শনিক তত্ত্ব নাই, গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনের কথাই নাটকাকারে গ্রথিত হইয়াছে।

কবি সেখ সাদী।—শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী প্রণীত; মূল্য পাঁচ সিকা। বঙ্গভাষায় পারস্যের অমর কবি সেখ সাদীর জীবনী পূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই; শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবুই এই অমূল্য রত্ন প্রথম বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিলেন। শেখ সাদীর গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ আমরা পড়িয়াছি; কিন্তু তাঁহার বিস্তৃত জীবন কথা অনেকেই জানেন না। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে যে এই অমর কবির জীবন কাহিনীই জানিতে পারা যাইবে তাহা নহে, শেখ সাদীর অমৃতোপম কবিতারও রসাস্বাদন করিতে পারা যাইবে। শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবু এই গ্রন্থে পারস্য ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত অধিকাংশ প্রামাণ্য গ্রন্থেরই আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাফল্য এবং এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

দমকা হাওয়া।—শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য এক টাকা। এখানি যে উপন্যাস, তাহা নাম দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। গ্রন্থকার এই উপন্যাসে সরসী মিত্র বা ভেকোর যে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বেশ হইয়াছে। বইখানি পড়িয়া অনেকেই সন্তোষ লাভ করিবেন।

বাংলার পাখী।—শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় সুললিত ও সহজবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞানের নানা কথা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার এই 'বাংলার পাখী' পুস্তকখানি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তিনি পক্ষীতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বাংলা-দেশের পাখী সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা জানিতে পারিলাম। এই শ্রেণীর পুস্তক লিখিয়া শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বাবু বাঙ্গলা-সাহিত্যের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন।

ধ্রুবা।—শ্রীমতী লীলা দেবী প্রণীত। মূল্য দুই টাকা।—এ উপন্যাসখানির একটু বিশেষত্ব আছে। গ্রন্থকর্ত্রী পাঠকদের সম্মুখে একটী উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন,—শুধু মামুলি প্রেমের কথায় পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলি ভরিয়া দেন নাই। বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে নিরাশ্রয়া বিধবার অবস্থা একটা সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে; পুর্ব্বতন আদর্শ এখন লুপ্ত এবং পাশ্চাত্য আদর্শও আমরা ঠিক আপনার করিয়া লইতে পারি নাই—লওয়া উচিত কি না, সে বিষয়েও মতদ্বৈধ আছে। এই সময়ে ধ্রুবার আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সেবাধর্ম্মের ন্যায় আদর্শ শুধু আমাদের দেশে কেন—যে কোনও দেশে উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য—এবং তাহা হইয়াছেও। আমাদের দেশে অধুনাতন যুগে স্বামী বিবেকানন্দ এই আদর্শ পুনঃপ্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। নরনারী-নির্ব্বিশেষে ইহা মুক্তির সোপান। বিশেষতঃ নারীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ আর কি হইতে পারে? ধ্রুবা ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রও বেশ ফুটিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রীর ভাষা বিশুদ্ধ। একটু সংস্কৃত-গন্ধী হইলেও কোথাও আড়ষ্ট হয় নাই; বরং কবিত্ব ও মিষ্টত্বে পাঠককে তৃপ্তি দান করে। পুস্তকখানি গ্রন্থকর্ত্রীর প্রথম উদ্যম এবং সে হিসাবে ইহা খুব ভালই হইয়াছে। বইখানির ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

শোক-সংবাদ

৺শরৎকুমার মল্লিক

প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও স্বদেশ-হিতকামী ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু তিনি চিকিৎসা-কার্য্য অপেক্ষা দেশহিতকর কার্য্যেই তাঁহার জীবনের অধিক সময় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথম বেঙ্গল রেজিমেণ্টের বাঙ্গালী পল্টন গঠন এবং বেঙ্গল টেরিটোরিয়েল ফোর্স সম্বন্ধে তিনি যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহা কেহই ভুলিবে না। এই টেরিটোরিয়েল ফোর্স কমিটি সম্পর্কে তিনি দিল্লী গিয়াছিলেন; সেখানেই তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন। তাহার অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় আসিয়া হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়গণের গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺গৌরহরি সেন

কলিকাতা চৈতন্য-লাইব্রেরীর প্রাণস্বরূপ, আমাদের পরম-বন্ধু গৌরহরি সেন মহাশয় আর ইহ-জগতে নাই; গত ১লা নভেম্বর তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইয়াছে। গৌরহরি বাবু কিছু দিন হইতে বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন।

৺গৌরহরি সেন

অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়াছিল যে, তিনি বাড়ীর বাহির হইতে পারিতেন না। এই অবস্থাতেও, আমরা দেখিয়াছি, তিনি তাঁহার দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া রাস্তার অপর পার্শ্বে অবস্থিত চৈতন্য-লাইব্রেরীর কার্য্য পরিচালন করিতেন। তাঁহার জীবনই চৈতন্য-লাইব্রেরীময় ছিল; উহারই উন্নতির জন্য তিনি ৩৫ বৎসর কাল অনন্যমনা, অনন্যকর্ম্মা হইয়া খাটিয়াছেন। চিরকুমার গৌরহরি বাবু সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিকগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। দেশের সমস্ত সভাসমিতি, সদনুষ্ঠানের সহিতই তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল। চিরজীবন তিনি সাহিত্য-সাধনাতেই অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধা জননী এখনও বাঁচিয়া আছেন। একমাত্র পুত্রের বিয়োগ-বেদনা তাঁহাকে যে কতদূর অভিভূত করিয়াছে; তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাঁহার এ শোক সহানুভূতির অতীত। যত দিন চৈতন্য-লাইব্রেরীর অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিন দেশের লোক গৌরহরি বাবুকে ভুলিয়া যাইতে পারিবে না।

মিঃ মণ্টেগু

ভারতের বর্ত্তমান শাসন-সংস্কারের প্রবর্ত্তক, ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট-সেক্রেটারী রাইট অনারেবল এডুইন সামুয়েল মণ্টেগু মহোদয় পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। ১৯১০ সালে ৩১ বৎসর বয়সে মণ্টেগু ভারতের অণ্ডার-সেক্রেটারী হন, ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যেই নিযুক্ত থাকেন। বিগত মহা যুদ্ধের সময় তিনি সদর বিভাগের মন্ত্রী হন। তাহার পর ১৯১৭ সালে তিনি ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী হন। এই সময়, ভারতের শাসন-সংস্কার কি ভাবে হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং এ দেশের নানা স্থানে নানা লোকের অভিমত সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি পার্লামেণ্টে পেশ করেন; বৃটীশ পার্লামেণ্ট সেই ব্যবস্থাই পাশ করেন। তাহার কিছু দিন পরেই মণ্টেগু মহোদয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন।

সজীব নায়ক

চিত্র

শ্রীসত্যেশ চন্দ্র গুপ্ত এম্-এ

এক

মাঠে ঘাটে ঘুরি ফিরি ; সেটা পেশা, করি পেটের দায়ে। মাসিকে গল্প টল্‌প লিখি ; সেটা নেশা, করি খেয়ালের খাতিরে।

নেশায় বিপত্তি, খেয়ালের বেচালে একবার ঘটেছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা। শ্রাবণের শেষ ; জমকালো বাদল। ঘরে আরামে বসে, কল্পনার অরণ্যে মনটাকে হারানোর সুখভোগ কপালে লেখা ছিল না। গোলামীর গুঁতোয় বনজঙ্গল ভেঙ্গে, বৃষ্টিতে কাদায়, যেতে হয়েছিল সুদূর এক পল্লীগ্রামে। সারারাত ধরে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়েছিল যে রাতে আমি ফিরলুম। গোশকটে যাত্রা ; বাঁশের চাটাই ঘেরা ছৈ-এর উপরে তেরপল্ ঢেকে বৃষ্টি নিবারণের চেষ্টা অনেকটা সফল হয়েছিল। ভিতরে পুরু করে খড় বিছিয়ে কম্বল পেতে লম্বা শুঁয়ে পড়েছিলুম। আর একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে তার ওপর বর্ষাতি-টা ঢাকা দিয়েছিলুম। পঞ্চভূতের নিবারণী সভার পেয়াদার ভয় না থাকলেও, বলদ্ দুটার গায়ে ছালা ঢাকা দেওয়া হয়েছিল। শকট-চালক বসেছিলেন একটা ছাল মুড়ি দিয়ে, আর মাথায় ধরে-ছিলেন একটা বাঁশের ছাতা। আমার পায়ের দিকে, গাড়ীর ভিতর বসে বসে ঢুল্‌ছিলেন আর দুল্‌ছিলেন, আমার সঙ্গের লোকটি, যাঁর নাম রহমৎ। গাড়ীর নীচে ঝুলছিল একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন, যার আলোতে, বাইরের অন্ধকার দূর না হলেও, কাচের চিমনির ভিতরের কালো জমাটবাঁধা ঝুলটা বেশ পরিস্ফুট হয়েছিল।

রাস্তাটা নিতান্ত খারাপ ছিল না। লোক্যালবোর্ডের কাঁচা রাস্তা ; তাতে বর্ষাকাল। মাটিটা একটু বেশী নরম ছিল। গাড়ীর চাকা ফুট খানেক বসে যাচ্ছিল। তবে দিনের বেলায় অনেক গাড়ীর চলাচল হয়েছে, আমার গাড়োয়ান তারই লিস্ ধরে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গরু দুটার শ্রম কিছু লাঘব হচ্ছিল বটে, তবে তাদের গতি শামুকের গতিকে হার মানিয়েছিল।

গরুগুলো হলো বিদেশ-মুখো। আরোহী ঘর-মুখো হলেও গরুর গাড়ীর গতিবেগ কিছুমাত্র বাড়ে না, এ জ্ঞানটা আমার ছিল। কাজেই, সকাল সাতটায় বিনপুর ষ্টেশনে না পৌছে দিলে ভাড়া পাবে না, এই ধারণাটা গাড়োয়ানের মনে দৃঢ় করে দিয়ে নিদ্রাদেবীর শরণ নিলুম।

অভ্যাস থাক্‌লে গরুর গাড়ীতে এমন অবস্থায় বেশ আরামে নিদ্রা দেওয়া যায়। সে রাতে কিন্তু ব্যাঘাতের হেতু ছিল। রহমতের দোদুল্যমান মাথাটা মাঝে মাঝে জোরে এসে আমার কোমরে ধাক্কা দিচ্ছিল ; আর নিদ্রাতুর গাড়োয়ানের বাঁশের ছাতাটা প্রায়ই আমার কপালে এসে ঠেক্‌ছিল। নিরুপায় আমি কিন্তু নির্ব্বিকারেই শুয়ে ছিলুম।

দুই

ভোর চারটেয় আকাশ যেন একটু পরিষ্কার হয়েছিল। বৃষ্টিও থেমে গিয়েছিল। রহমৎ বেচারী গাড়ী থেকে নেমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লো। বাদ্‌লা বলেই সে গাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। সারারাত ধ'রে এই আশ্রয় তাকে যে রকম আড়ষ্ট করে রেখেছিল, তাতে সে নিরাশ্রয়ের দরকারটাই বেশী স্পষ্ট করে বুঝেছিল। রহমৎ নেমে যেতেই আমি পা ছড়িয়ে, ভাল করে শুলুম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। ঘুম যখন ভাঙ্গলো, তখন বি, এন, আর লাইনের বিনপুর ষ্টেশন দেখা যাচ্ছিল। ৬টা বেজেছে। বৃষ্টি নেই, তবে আকাশ ঘোরালো কালো মেঘে ঢাকা।

বিনপুর ষ্টেশনটি ছোট্ট। মাষ্টার বাবু ও তাঁর সহকারী একাধারে, ষ্টেশন মাষ্টার, বুকিং-ক্লার্ক, সিগনেলার ও মালবাবু। পানিপাঁড়ে ও পয়েণ্ট্‌স্‌ম্যান একই ব্যক্তি।

ছোট্ট একটি ঘর—তার তিন দিকে জানালা। একদিকের জানালায় মাষ্টার মশায় টিকিট বাঁটেন, আর একদিকের জানালায় মাল বুক করেন, আর তৃতীয় জানালার ধারে বসে রেজিষ্টার ও ফরম পূরণ করেন। ছ'ফুট চওড়া বারান্দার এক কোণে গার্ড সাহেবদের খাবার জলের বাঁশের একটা ফিল্টার। তাতে মাটীর কলসী মাত্র দুটি ; নীচের থাকটা ফাঁক। মাঝের কলসীতে উপরের কলসী থেকে জল চুঁয়ে পড়বার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না ; কারণ, ওটার মুখটি এনামেলের বহু পুরাতন মগ দিয়ে ঢাকা। দরজার পাশে একখানা বেঞ্চ পাতা আছে। তার হেলান দেবার কাঠটি, 'চুণ, খয়ের আর আলকাত্‌রায় সুচিত্রিত। বসবার জায়গাটা ধূলো আর তেলে ধূসর রং ধারণ করেছে।

টিকিটের জানালার সামনেই আর একটা খোলা বারান্দা আছে—একসঙ্গে মালগুদাম আর যাত্রীদের বিশ্রামাগার। তার এক পাশে রেল ষ্টেশনের চিরসঙ্গী পানবিড়িওয়ালা বিরাজমান। তার কাছে পান, বিড়ি, দেশলাই ছাড়া হাতিমার্কা সিগারেটও থাকে। উপরন্তু অজানা কালের তৈরী, প্রাচীন কয়েকটা মোণ্ডাও ছিল।

তিন

ষ্টেশনের কাছে গাড়ী এসে দাঁড়াল। রহমৎ ইতিমধ্যে মাথায় পাগড়ী এঁটেছে, কাঁধে চাপরাশ ঝুলিয়েছে। নেমে বল্‌লুম তাড়াতাড়ি চায়ের বন্দোবস্ত করতে।

আমার লেখায় ও কথায় যদিও স্বদেশী ভাবটা ছিল খুব ঝাঁঝালো, পোষাক পরিচ্ছদে কিন্তু ফিরিঙ্গিয়ানা ছিল খুব জাঁকালো।

বিনপুরের মতো ছোট ষ্টেশনে, হ্যাট-কোট-টুপীধারী জীবের আবির্ভাব খুব কমই হ'ত। তাতে চাপ্‌রাশধারী অনুচর। সুতরাং আমার ষ্টেশন প্রবেশটা ছোটবড় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। মাষ্টার মশায় তখনও আসেন নি। সহকারী রাত ডিউটি করে বড়বাবুর অপেক্ষায় বসেছিল। আমাকে দেখে মনে মনে বোধ হয় ভাব্‌লে, এ আবার একটা আপদ এসে জুট্‌লো কোত্থেকে !

জিজ্ঞাসা করে জানলুম, গাড়ী আসতে তখনও ঘণ্টা-খানেক দেরী। ওয়েটিং-রুমের কথা জিজ্ঞাসা করতেই, ছোটবাবু মুচ্‌কি হেঁসে বল্‌লেন, 'আজ্ঞে, এটা ছোট্ট ষ্টেশন, আজ্ঞে এখানে—'

সারারাত ঘুম না হওয়ায় আমার সাধারণ ফেরঙ্গ মেজাজ্‌টা একটু চড়ায় বাঁধা ছিল। ছোটবাবুর কথা শেষ না হতেই আমি একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌লুম 'Damn, Shame ! মশায়, ভদ্রলোককে বস্‌তে দেবার একটা জায়গা রাখেন নি ?' ছোটবাবু বল্‌লেন 'মশায়, কোম্পানী রেখেছে ঐ বেঞ্চি—তাও দেখ্‌ছেন ভাঙ্গা ও পুরানো। তবে আপনাদের মত লোক যদি complain করেন, তাহলে একটা নতুন বেঞ্চ পেতে পারি। আমি বল্‌লুম, 'সে ত পরের কথা—এখন আপনাদের আফিস্ থেকে একটা চেয়ারটেয়ার দিতে পারেন না ?—আমি একজন সেকেণ্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জার, বুঝ্‌ছেন না ?'

ছোট বাবু কি বুঝ্‌লেন জানি না। ভিতরে গিয়ে একখানা উঁচু টুল এনে বস্‌তে দিলেন। আমি তাতেই বসে সিগারেট ধরালুম। রহমৎ যোগাড়ে লোক। এরই ভিতর সে জল গরম করে চা তৈরী করতে লেগে গেছে। আমার সঙ্গের কাঠের তোরঙ্গটার উপর চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে রেখে, সে দুধের সন্ধান চাইলে ছোটবাবুর কাছে। ছোটবাবু বল্‌লেন, 'আরে, এ কি শহর বাজার পেয়েছ যে সকাল বেলাতেই দুধ পাবে ? আমরা এই জঙ্গলে আছি কেবল হাওয়া খেয়ে। তবে নিকটেই ঐ দেখ কয়েকটা ঘর। কল্‌কাতার বাবুরা আসেন হাওয়া খেতে—কিন্তু চা টার বদলে নয়। তাঁদের এত ভোরেও দুধের বরাদ্দ আছে। চাইলে পেতে পারো।'

রহমৎ দুধের সন্ধানে রওয়ানা হল। আমি ছোট ব্যাগটা খুলে, একখানা ইংরাজী মাসিক বার করে, পাতা ওল্‌টাতে লাগলুম।

রহমতের পরিচয়টা দেওয়া হয় নি। সে আমার সবে ধন নীলমণি,—সে আমার একাধারে চাপরাশী, বেয়ারা, খানসামা, বট্‌লার, বয়। মফঃস্বলে সেইই আমার একমাত্র কর্ত্তা ও পালয়িতা। সমস্ত বিপদ-জাল ছিন্ন ক'রে, অসাধ্য-সাধনে পটু—তার মত লোক আর দ্বিতীয় দেখি নি। দুর্দ্দিনের কাণ্ডারী রহমৎকে সঙ্গে না নিয়ে আমি এক পাও অগ্রসর হই না। সে আমার সহায়, সম্পদ, বল। সে না থাক্‌লে আমার দিন চলে না। ফিরিঙ্গিয়ানা বিফল হয়ে যায়।

সুতরাং বিনপুরেও যে আমার চা পানের ব্যাঘাত ঘটবে না তা নিশ্চিত জেনে, আর একটা সিগারেট মুখে দিলুম।

১০ মিনিটের মধ্যেই রহমৎ চা প্রস্তুত করে দিল। আমি বিস্কুটে মাখন মেখে, টোষ্টের অভাব মিটিয়ে নিলুম। পেয়ালায় চা ঢেলে আস্তে আস্তে চুমুক্ দিচ্ছি—আর সেই মাসিকটার পাতা উল্টাচ্ছি।

চার

এক পেয়ালা চা নিঃশেষে পান করে দ্বিতীয় পেয়ালায় মুখ দিয়েছি—এমন সময় হঠাৎ কাণে গেল এক বজ্রগম্ভীর ধ্বনি। আমি মুখ তুলে চাইলুম না—কাণ খাড়া রইল। প্রশ্ন শুনতে পেলুম,

'মশায়—আপনার নাম কি বিমল মুখুজ্যে?'

মুখ না তুলেই জবাব দিলুম 'আজ্ঞে হাঁ—মশায়—'

'আপনি কি গল্প-টল্প লেখেন?'

'আজ্ঞে হাঁ মাঝে মাঝে লিখি বটে—তাতে আপনার প্রয়োজন?'

'সে কথা পরে হচ্ছে—আচ্ছা বলুন দেখি, আষাঢ়ের নবজীবনে 'পত্নীহারা' 'গল্পটা কি আপনার লেখা'

মক্কেল নাছোড়বান্দা ভেবে এবার মুখ তুলে চাইলুম। দেখলুম, সুমুখে এক বিরাট বপু। রংটা তার সেদিনকার মেঘের মতই ঘোরালো কালো; দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায়ই সমান, ৪ ফুট হবে। পেটটা বেশী ফুলো, কি, পিটটা, তা, না মাপ্‌লে ঠিক করা যায় না। কপালটা বেজায় ছোট—তা অনুধাবনযোগ্য। উরু দুটো গদার মত, না, পা দুটো গোদা, তা পরিমাপ-সাপেক্ষ। হাঁটু বা কনুই বলে কোন অঙ্গ আছে কি না, হঠাৎ তাঁকে দেখ্‌লে ঠাওর হয় না। হাতের আঙুলগুলো ফুলে কলাগাছ না হলেও, পাকা কলার মত হয়েছে। হাতের পিঠ পাশটা, কালো না হলে, বাতাবী লেবুর আধখানা বলে ভ্রম হওয়া খুব সম্ভব ছিল। গাল দুটো ফুলেছে—যেন একটা কান্দিতে দুটো তাল ঝুল্‌ছে। কাণ দুটো এমন ভাবে পেছন দিকে শোয়ান যে, কেবল কর্ণরন্ধ্রই নয়নগোচর হয়। নাকটা এমন চেপ্টে গেছে যে সিঁড়ি না লাগালে কপালের নাগাল পাওয়া যায় না। নাকের নীচে থেকে গোঁফের গোছা দুদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, যেন দু আঁটি খড় ঝুল্‌ছে।

রূপ যাই হোক্, বাবুটির সখ আছে। পরনে তাঁর লালপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি। গায়ে ডবলব্রেষ্ট সার্ট; হাতে গলায় সোণার বোতাম; তার ওপর আলপাকার কোট। কোটের ওপর মুর্শিদাবাদের রেশমী চাদর। হাতে এক গাছা লাঠি, হাতলটা তার রূপায় বাঁধান। আর এক হাতে ছাতি—একটু বড়, ছত্র বল্‌লেই মানায় ভাল।

আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম—সাধের চা, পেয়ালায় ঠাণ্ডা হতে লাগলো।

পাঁচ

কতক্ষণ এ ভাবে চেয়ে ছিলুম জানি না। পলকহীন দৃষ্টিতে আমি যখন ঐ রূপ-সুধা পান করছিলুম—জলদগম্ভীর স্বর আবার কাণে বেজে উঠ্‌লো। আবার সেই প্রশ্ন—

'বলুন না মশায়, 'পত্নীহারা' গল্পটা কি আপনার লেখা!'

এবার আমার চমক ভাঙ্গলো। এমন একজন সুদর্শন নায়ককে পেয়ে একটু রসিকতা করবার লোভ মন উদয় হলো।

আমি বল্‌লুম, 'বসুন না মশায় এই বেঞ্চিটাতে। আলাপটা নেহাৎ একপেশে হয়ে যাচ্ছে না কি? মশায়ের পরিচয়টা পেলে কৃতার্থ হব।'

'সব জানতে পারবেন এখনি—আগে বলুন, 'পত্নীহারা' গল্পটা আপনার লেখা কি না?'

ব্যাপার সঙ্গীন মনে হ'ল। কৌতুক চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—'কই, কোন গল্পটা, দেখি?'

'আবার ন্যাকা সাজা হচ্ছে!—এই দেখুন, আষাঢ়ের নবজীবন, আর এই দেখুন এই গল্পটা—লেখক শ্রীবিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—দেখ্‌তে পাচ্ছেন? আপনিই কি এই বিমল মুখুজ্যে?'

'আজ্ঞে হেঁ'—অধরকোণে আমার হাসির রেখা ফুটে উঠলো। 'কেন কি হয়েছে মশায়?'

'তা এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আপনি জানেন যে, নদে জেলায় পুরন্দরপুর বলে একখানা গ্রাম আছে?'

'তা থাকতে পারে।'

'আর আপনি জানেন, নবগৌরাঙ্গ পাল ঐ গ্রামের জমিদার?'

'লব গৈরাঙ্গই বটে—তা কি হয়েছে কি?'—

'আর আপনি জানেন, তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আজ দুবছর হলো মারা গেছেন?'

'আজ্ঞে সেটা আমার জানবার সুযোগ হয়নি—'

'রসিকতা রাখুন মশায়! চালাকি চলবে না! ভদ্রলোকের পারিবারিক ঘটনা নিয়ে গল্প লিখে, তা আবার ছাপান হয়েছে। আবার রসিকতা করা হচ্ছে! জানেন্ আমিই সেই পুরন্দরপুরের নবগৌরাঙ্গ বাবু—"

'ও হো—হো—হো—হো—হো—তাই না কি? তাই না কি? আরে মশায় এতক্ষণ বল্‌তে হয়! আচ্ছা গৌরাঙ্গ বাবু, তবে গল্পটা মিলে যাচ্ছে না কি?—শেষটাও মিল্‌ছে না কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে নবগৌরাঙ্গ বাবু আমার দিকে দুই পা এগিয়ে এলেন। তাঁর নেত্রদ্বয় রক্ত, তনু কম্পিত, হস্তধৃত যষ্টি ঈষৎ উত্তোলিত, ভ্রূযুগল বিস্ফারিত।—

আমি বললুম—'মশায় এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? আপনি ত আর আমার গল্পের নায়কের মত নিশাচর হয়ে পড়েন নি! আর হলেই বা ক্ষতি কি? গল্প ত আর সত্যি হয় না! গল্প—গল্প'—

'আর বাহাদুরি করতে হবে না—আমার সম্বন্ধে যে সমস্ত কুৎসিত ব্যাপার আপনি লিখেছেন—সত্যি হলেও তা ছাপিয়ে প্রচার করবার আপনার কি অধিকার আছে? হ'ত পুরন্দরপুর—তাহলে দেখিয়ে দিতুম গ্রামের জমিদারের নামে অপবাদ দেওয়ার কি শাস্তি'—বাধা দিয়ে আমি বল্‌লাম—'মশায়, মিছে রাগ করেন কেন? আপনার পরিচয়ের সৌভাগ্য পূর্ব্বে হয়নি। হলে প্লটটা বদ্‌লে দিতুম।—'

'আবার ন্যাকামি? জানেন, আপনাকে মানহানির দায়ে জেলে দিতে পারি—জানেন, আপনার নামে ড্যামেজ সুট্ আনতে পারি—জানেন, এখুনি পুলিশ ডেকে আপনাকে হাতকড়ি লাগিয়ে গারদে পুরতে পারি—জানেন—'

শেষের কথাটা আমার কাণে পৌঁছল না। ট্রেন কখন এসেছিল, খেয়াল হয় নি। রহমৎ দৌড়ে এসে বল্‌লে—'গাড়ী ছোড়তা হ্যায়।' আমি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠলুম।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব

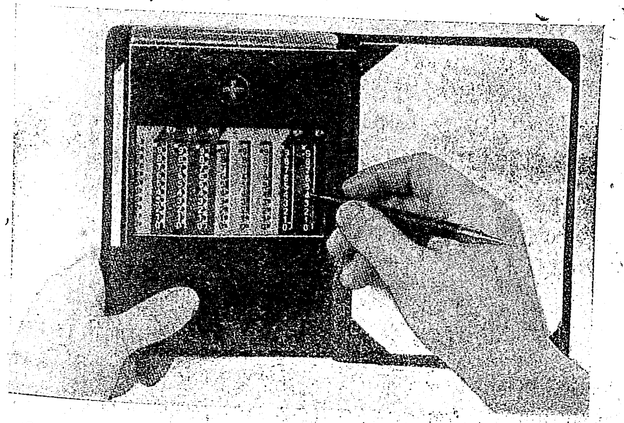

হিসাবের কল (এই কলের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ, কি ভাগ সবই করা যায়)

হিসাবের কল

খুব বড় বড় যোগ বিয়োগ, গুণ কি ভাগ ক'রতে অনেক সময় অনেক লোকে ভুল ক'রে থাকে। এই ভুলের জন্য অনেক ক্ষতিও হয়। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য একজন গণিত শাস্ত্রবিদ্ একটি সুন্দর যন্ত্র তৈরী করেছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে সকল রকম হিসাব সহজে ও সঠিকভাবে করা যায়।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা

সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মিস্ জেট্টা (Miss jetta) একজন সর্ব্ববিজয়িনী নারী। খুব কম সময়ের মধ্যে ইংলিস্ চেনেল (English Channel) অতিক্রম করার ব্যাপার নিয়ে অনেকেই হতাশ হয়েছেন ; কিন্তু মিস্ জেট্টা বলেন যে তিনি একটি নূতন রকমের রবারের পোষাক

সাঁতারের বেশে (মিস্ জেট্টা তাঁর নবোদ্ভাবিত সাঁতারের বেশ পরিধান ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন)

তৈরী ক'রবেন আর তাই গায়ে দিয়ে ভীষণ মাঘ মাসেও স্বচ্ছন্দে সাঁতার দিয়ে ইংলিস্ চেনেল্ অতিক্রম করবেন। তাঁর পোষাক এরূপ ভাবে তৈরী হবে যে, তাতে একটিও যোড় থাকবে না। কিন্তু যোড় না থাক্‌লেও যে সাঁতার কাট্‌বার সময় তাঁর হস্তপদ সঞ্চালনে কিছুমাত্র অসুবিধা হবে তাও নয়।

নূতন চশমা

আজকাল রাস্তায় বাহির হলেই নানা রকমের হাল ফ্যাসানের চশমা লোকের চোখে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে এক রকম নূতন ধরণের চশমা ব্যবহৃত হচ্ছে, যা আজ পর্য্যন্ত এখানকার বাজারে দেখ্‌তে পাওয়া যায় নি। চশমার কাঁচগুলি চৌকা ধরণের। জার্ম্মাণ ডাক্তারগণ বলেন যে, এরূপ ধরণের চশমা ব্যবহার

নূতন চশমা (একজন লোক নূতন চশমা চোখে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে)

করা উচিত ; কারণ, এরূপ ধরণের চশমা ব্যবহার ক'রলে শীঘ্রই চোখ খারাপ হ'বার সম্ভাবনা নেই।

দা ভিঞ্চির কল্পিত বিমান

লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি (Leonardo De Vinci) ইতালী দেশের মধ্যযুগের একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর উদ্ভাবনী-শক্তিও যে অসাধারণ ছিল, এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। তিনি অনেক নূতন জিনিষ আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি কালের

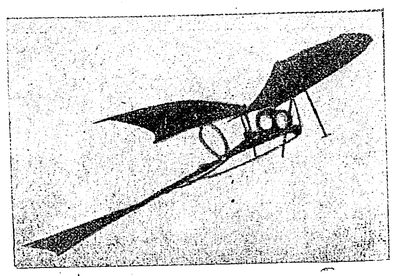

দাভিঞ্চির কল্পিত বিমান

আবর্ত্তে পড়ে লোকচক্ষুর গোচরে আসে নি। সম্প্রতি একটি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমঠের ভিতরকার জিনিষপত্র পরিষ্কার হ'তে হ'তে এক রাশ আবর্জ্জনার মধ্য থেকে পার্চ্চমেণ্ট কাগজের ওপর তাঁর হাতে আঁকা একটি বিমানের ছবি পাওয়া

গেছে। বিমানটি যা'তে পাখীর মতো ডানার সাহায্যে উড়্‌তে পারে, সেইরূপ দু'টি ডানা সংলগ্ন ক'রে তিনি সেটিকে উড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তারহীন বেতার

বায়বীয় ও পৃথিবী সংশ্লিষ্ট (aerial and ground wire) দুইটি তার ব্যতীত বেতারে কোনও কথা বলা বা শোনা অসম্ভব। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকার বোষ্টন (Boston) সহরের একজন প্রসিদ্ধ বেতারবিদ্ উক্ত দু'রকমের তার ব্যতীত বেতারে কথা বলবার ও শোনবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। তাঁর যন্ত্রপাতির মধ্যে হচ্ছে ফটো তোলবার ক্যামেরার একটি খালি বাক্স, আর তার ভিতর রাখবার উপযোগী কতকগুলি ছোট ছোট যন্ত্রপাতি। তাঁর যন্ত্রপাতি গুলি ছোট ছোট হলেও তাদের কার্য্যকরী শক্তি খুব বেশী।

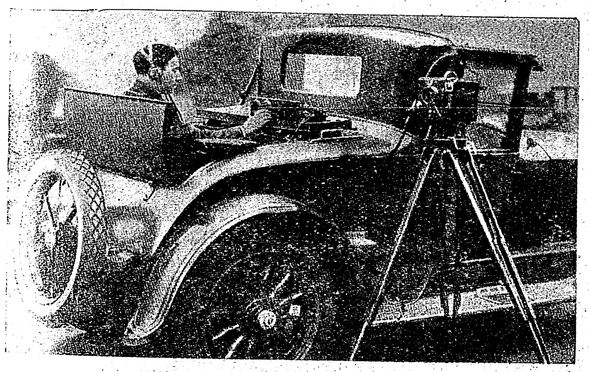

তারহীন বেতার (বৈজ্ঞানিক তাঁর গাড়ী থেকে বেতারে কথা শুনছেন)

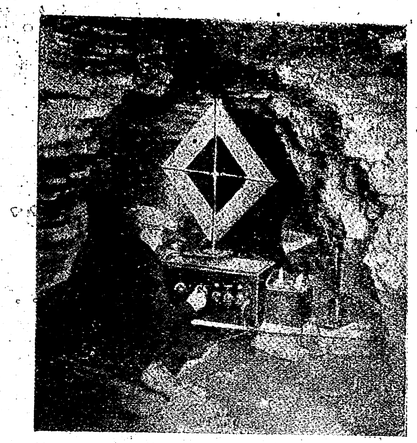

পাতালে বেতার (২৫০ ফুট খনির নীচে বসে বৈজ্ঞানিক বেতারে কথা শুন্‌ছেন)

মাটীর নীচের বেতার

ফাঁকা অর্থাৎ খোলা জায়গা ব্যতীত বেতারে কথা বলা বা শোনা যায় না, অনেক বৈজ্ঞানিকের এত দিন এই ধারণাই ছিল। কিন্তু সম্প্রতি মার্কিন দেশের ওহিও (Ohio) সহরের একজন বৈজ্ঞানিক একটি গহ্বরের মধ্যে সুড়ঙ্গ কেটে আরও প্রায় ১২০ ফুট নীচেয় গিয়ে, সুড়ঙ্গর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে বেতারে কথা শুনেছিলেন ও বলেছিলেন। তিনি বলেন যে ফাঁকা জায়গায় বেতারে আমরা যে রকম শুন্‌তে পাই; মাটীর নীচে থেকেও ঠিক সেই রকমই শুন্‌তে পাই।

যমজ গ্রহ

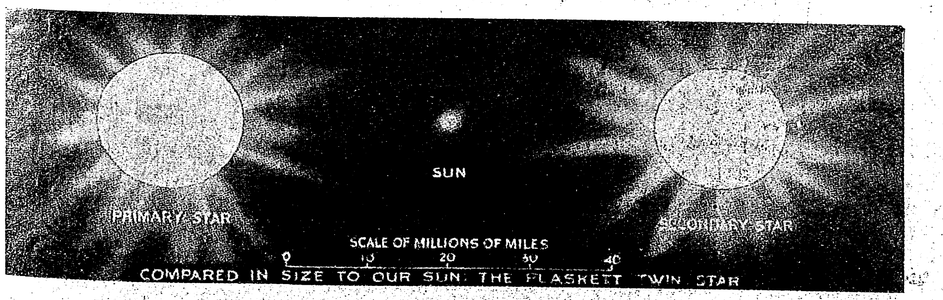

যমজ গ্রহ (প্লাস্‌কেট্ সাহেবের নবাবিষ্কৃত যমজ গ্রহ)

ডাক্তার জে, এস্ গ্লাসকেট্ (Dr. J. S. Plaskett) তাঁর পরীক্ষাগারে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একটি যমজগ্রহ আবিষ্কার ক'রেছেন। এরা সূর্য্যের চেয়ে বারো হাজার গুণ তেজস্কর এবং পরিধিতে দু'হাজার গুণ বড়। এদের গতি প্রতি মিনিটে ১৫৩ মাইল ক'রে। এরা পৃথিবীর চেয়ে আশী কোটি গুণ বড়; পৃথিবী থেকে এরা পঞ্চাশ হাজার কোটি মাইল তফাতে অবস্থিত। গ্লাসকেট্ সাহেব বলেন যে, এই যমজ গ্রহের গতি ও

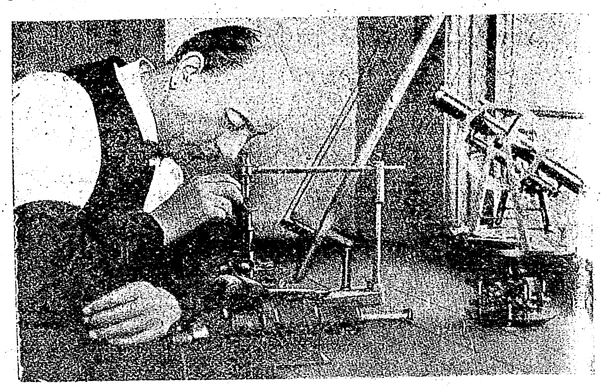

মাকড়সার জাল (বৈজ্ঞানিক দূরবীণের সাহায্যে মাকড়সার জাল পরীক্ষা ক'রে তা'কে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলছেন)

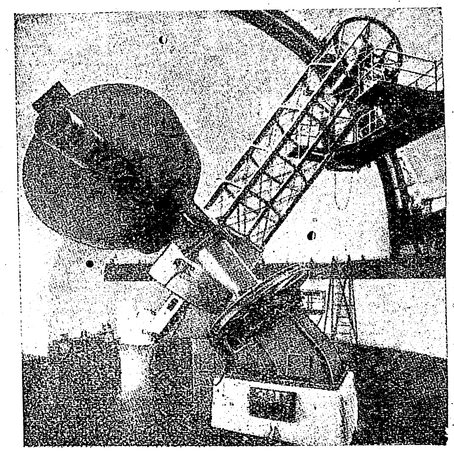

গ্রহনির্দ্দেশক-দূরবীণ (এই নবনির্ম্মিত দূরবীণের সাহায্যে গ্লাস্কেট্ সাহেব তারা দু টির আকার ও অবস্থা নির্ণয় ক'রেছেন)

অবস্থা দেখ্‌লে মনে হয় যে, তারা কয়েক বৎসরের মধ্যই ধূমকেতুতে রূপান্তরিত হ'য়ে জগতের লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে পারে।

মাকড়সার জালের সদ্ব্যবহার

মাকড়সার জালকে আমরা আবর্জ্জনাই মনে করি। কিন্তু ওহিও (Ohio) সহরের জর্জ্জ হ্যান্‌স্ (George Hannes) নামক একজন বৈজ্ঞানিক সযত্নে মাকড়সার জাল সংগ্রহ ক'রে তা' থেকে নানা সূক্ষ্ম শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করেন। তিনি বলেন যে, মাকড়সার জালের তন্তুগুলি এত শক্ত যে, তদুপযোগী মাকু বা তাঁত পেলে তাতে কাপড়ও বোনা যায়।

বৈদ্যুতিক ক্ষুর

বৈদ্যুতিক ক্ষুর (এই ক্ষুরের সাহায্যে বিনা আয়াসে ও বিনা যন্ত্রণায় সুন্দর ক্ষৌরকার্য্য করা যায়)

একজন বৈজ্ঞানিক একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কার ক'রেছেন, যাতে ক্ষুরের ফলা লাগিয়ে দিলে বিদ্যুৎ-প্রবাহে সেটা আপ্‌নি চল্‌তে থাকে। সেই ক্ষুর দাড়ির সংস্পর্শে এলে আপনিই ক্ষৌর-কার্য্য হ'য়ে যায়। এই ক্ষুর ব্যবহারে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ হয় না।

অল্প ব্যয়ে বেতার

অল্প ব্যয়ে বেতারে দেশের এক স্থান থেকে স্থানান্তরে কথা বলা বা শোনা এত দিন পর্য্যন্ত ঘটে ওঠেনি। সম্প্রতি গ্রাণ্ট্ হেক্‌টর (Grant Hector) নামে একজন বেতারবিদ্ একটি নূতন রকমের যন্ত্র তৈরী করেছেন, যদ্দ্বারা বহু শত ক্রোশ পর্য্যন্ত কথা বলা যায় ও বহু শত ক্রোশ দূর থেকে কথা শোনা যায়। তাঁর যন্ত্রের সর্ব্বশুদ্ধ দাম ৪৫৲।

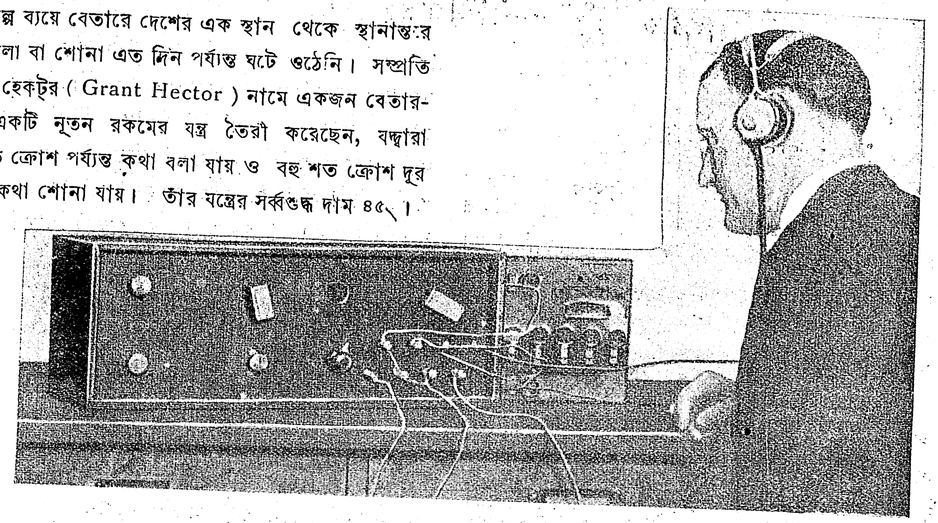

বেতার যন্ত্র (বৈজ্ঞানিক তাঁর নবোদ্ভাবিত যন্ত্র পরীক্ষা ক'রছেন)

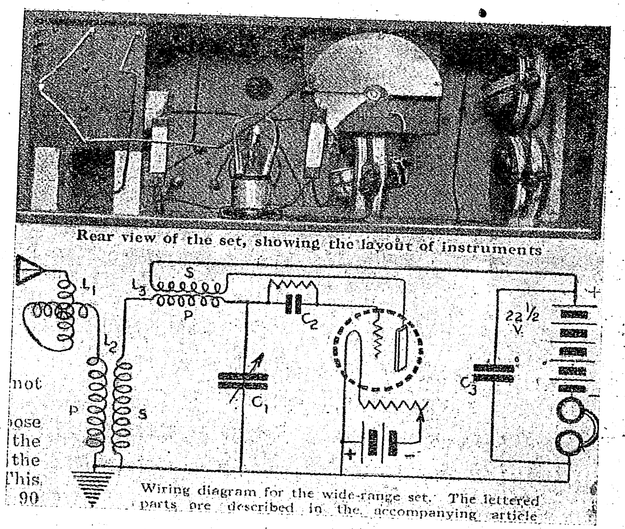

বেতার যন্ত্র বেতার যন্ত্রের পার্শ্বদিক
(বেতার যন্ত্রের তারগুলি কিরূপ ভাবে পরস্পরে সঙ্গে সংবদ্ধ আছে—এই ছবিতে তা' দেখান হচ্ছে),

সাময়িকী

এবার 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পটে যে মহাত্মার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তিনি বাঙ্গালা দেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষের পরিচিত, বরণীয়, দেশনায়ক পরম বৈষ্ণব শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়। মহাত্মা শিশিরকুমার বাঙ্গালা দেশের সংবাদপত্রের সেবকগণের অগ্রণীগণের অন্যতম। তাঁহার অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের দেশে জাতীয়তার পতাকা যাঁহারা বহন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, শিশিরকুমার তাঁহাদেরই একজন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার 'অমিয় নিমাই চরিত' অতুলনীয়। ১৩১৭ অব্দের এই পৌষ মাসেই তিনি দেহরক্ষা করিয়াছিলেন; আমরা আজ তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

এখনকার প্রধান কথা গবর্ণমেণ্টের তিন নম্বর রেগুলেশন ও নবপ্রচারিত অর্ডিনান্স। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ববারে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। সংবাদপত্রাদিতে ও দেশময় সভাসমিতিতে এই বে-আইনি আইন (lawless law) সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে, এবং এখনও তাহার জের চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট পক্ষও নীরব নহেন। বাঙ্গলার লাট লর্ড লিটন বাহাদুর একবার দুইবার নহে, তিন তিনবারে এই ব্যাপার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; প্রথমে মালদহে, তাহার পর দিনাজপুরে, তাহার পর উপাধি বিতরণের জন্য লাটপ্রাসাদে যে দরবার হয় সেখানে। এই তিনবারে তিনি গবর্ণমেণ্ট পক্ষের সমস্ত কথা বলিয়াছেন।

লর্ড লিটন বাহাদুর এই তিনটী বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, তিন নম্বর রেগুলেশন ও অর্ডিনান্স অনুসারে যাঁহাদিগকে আটক করা হইয়াছে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন। কেবল পুলিশের কথার উপরই তাঁহারা নির্ভর করেন নাই, পরস্পর অপরিচিত নিরপেক্ষ ক্ষেত্র হইতে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। সে সকল প্রমাণ তাঁহারা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছেন। তাহার পর সেই সকল প্রমাণ ব্যবহারাজীবদিগের শ্রেষ্ঠস্থানীয় ভারতের রাজপ্রতিনিধির নিকট দাখিল করিয়াছেন। তিনিও সেই সকল প্রমাণ আলোচনা করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহার পর গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বিপ্লবপন্থীরা যে প্রকার ভীষণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের মতে এই আইন প্রচলন করা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পূর্ব্বেও এই আইন প্রচলনের দ্বারা বিপ্লব-প্রচেষ্টা প্রশমিত হইয়াছিল, এবারও হইবে।

গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ্য আদালতে উপস্থিত করিতে পারেন না। লাট সাহেব বলিয়াছেন যে, প্রকাশ্য আদালতে বা অন্য ভাবে জনসাধারণের সম্মুখে সে সমস্ত প্রমাণ উপস্থাপিত করিলে, যাহারা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছে, যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহাদের জীবন বিপন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ সমস্ত কথা গোপন রাখিতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াই গবর্ণমেণ্ট এই বিপ্লববাদে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহারা এ সমস্ত প্রমাণ সাধারণ্যে উপস্থাপিত করিতে পারেন না।

এই উপলক্ষে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, প্রকাশ্য আদালতে না হউক দেশের তিনজন গণ্যমান্য নিরপেক্ষ সুবিবেচক ব্যক্তিকে সমস্ত কাগজ-পত্র দেখানো হউক; তাঁহাদের মন্তব্য সকলেই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবেন। লাট সাহেব তাহারও উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রথমতঃ এমন লোক মিলিবে না। গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদিগকে নিরপেক্ষ সুবিচারক মনে করিবেন, প্রতিপক্ষ তাঁহাদিগকে সে ভাবে গ্রহণ করিবেন না। আবার প্রতিপক্ষ যাঁহাদিগের নাম করিবেন, গবর্ণমেণ্ট হয় ত তাঁহাদিগকে সে ভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন না। দ্বিতীয়তঃ, এ প্রকার সালিস নিযুক্ত করায় গবর্ণমেণ্টের প্রেষ্টিজের হানি হইবে।

গবর্ণমেণ্ট হইতেছেন এ সম্বন্ধে প্রভুশক্তি। সেই শক্তির উপর সন্দেহ প্রকাশ করিলে তাঁহাদের কার্য্য-শক্তিকে পঙ্গু করা হয়; তাঁহাদের শাসন-প্রণালীকে অমর্য্যাদা করা হয়। সুতরাং লাট সাহেবের শেষ কথা এই যে, গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন, তাহা ঠিক কাজ করিয়াছেন; তাহাতে কোন ভুল হয় নাই। অতএব, এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ, বক্তৃতা, সভাসমিতি করা সমস্তই বৃথা, সমস্তই পণ্ডশ্রম!

ততঃ কিম্? তাহার পর কি কর্ত্তব্য? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও অন্যান্য দেশনায়কগণ বলিতেছেন যে, এ সকল লইয়া বাদ-প্রতিবাদে আর কাজ নাই। এস, আমরা দেশের কাজে মন দিই; আমরা পল্লী-সংস্কারে ব্রতী হই। দেশের যাহারা মেরুদণ্ড, সেই পল্লীবাসীদিগকে সবল, সুস্থ ও স্বস্থ করি। তাহা হইলেই গবর্ণমেণ্টের এই ধর্ষণ-নীতির জবাব দেওয়া হইবে, স্বরাজ লাভ হইবে। এই সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার 'দেশের ডাকে' বলিতেছেন—

"এই সংঘর্ষে বিজয়লাভ করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে চাই একতা,—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা,—সর্ব্বোপরি চাই স্বাবলম্বন। যদি সমস্ত গ্রামগুলিতে গ্রাম্য-সমিতি স্থাপন করিয়া স্কুল, চতুষ্পাঠী, মোক্তব, নৈশ বিদ্যালয়, সালিশী পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করতঃ, সেই সেই গ্রামের চাষ, আবাদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা, ঘাট ও পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিবাদ বিসম্বাদ, দলাদলি মিটাইয়া দেওয়া, উৎপন্ন শস্য রক্ষা ও উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত, প্রতিগৃহে তুলার গাছ লাগাইয়া তদ্দ্বারা প্রস্তুত সূত্রে কাপড় তৈয়ারী করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, উচ্চ নীচের ব্যবধান ভুলিয়া হিন্দু মুসলমান পরস্পরের ভ্রাতৃত্বের দৃঢ়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গ্রামগুলিকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারে তবে সমস্ত স্বাবলম্বী গ্রামগুলির সমবায়ে একটি বিরাট স্বাবলম্বী দেশ তৈয়ারী হইয়া অতি সহজে এই অসহনীয় পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হইতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার জন্য কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যালটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি আমলাতন্ত্র সরকারের সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারের কেন্দ্রগুলিকে দখল করিয়া দেশের কাজে লাগাইয়া জাতিকে গড়িয়া তুলিবার সহায়তা করিতে হইবে। এই বিরাট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিজেদের জাতীয় জীবন দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করতঃ আমলাতন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইলে যথেষ্ট একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও অর্থের আবশ্যক। সমস্ত বাংলাদেশের গ্রামের সংখ্যা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজারের কম হইবে না। প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ পাঁচ হাজার গ্রাম। কিন্তু প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ একশতখানা গ্রামে কার্য্য আরম্ভ করিতেই হইবে। চার-পাঁচখানি গ্রাম লইয়া এক-একটি কেন্দ্র করিয়া এই গ্রামগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। এই ভাবে কার্য্য করিতে হইলে প্রত্যেক জেলায় প্রথমতঃ অন্ততঃ পক্ষে ২০ জন কর্ম্মীর দরকার। প্রত্যেক কর্ম্মীকে অন্ততঃপক্ষে কুড়ি টাকা করিয়া না দিলে, তাহার পক্ষে সকল প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়াও জীবন ধারণ করা অসম্ভব। সমস্ত বাংলাদেশে এইরূপ ভাবে ছয় শত কর্ম্মী নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহাদের জন্য প্রতি মাসে ১২০০০ টাকা দরকার। কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় প্রথমতঃ প্রত্যেক কেন্দ্রেই কিছু কিছু টাকা দিতে হইবে। খুব কম করিয়া ধরিলেও প্রত্যেক জেলার কেন্দ্রসমূহের জন্য অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা সঙ্ঘবদ্ধ কেন্দ্রবাসী স্বেচ্ছায় তুলিয়া দিবে। এই বিরাট কার্য্যের আরম্ভের জন্য এখনই অন্ততঃ দেড়লক্ষ টাকা চাই। এতদ্ব্যতীত আরোও অনেক খরচ আছে। সমস্ত খরচের তালিকা এখানে এখন দেওয়া অসম্ভব। মোট কথা, এই মরণোন্মুখ জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, এককালীন তিন লক্ষ টাকা ও মাসিক বিশ হাজার টাকা তুলিতে হইবে। উপরিউক্ত ভাবে পল্লী সংগঠন, নূতন আইনে ধৃত দেশের সুসন্তানগণের অভাবক্লিষ্ট পরিজনের ভরণ-পোষণ, প্রয়োজন হইলে এই বে-আইনি আইনে ধৃত ব্যক্তিগণের আদালতে পক্ষ সমর্থন এবং কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকার করিতে প্রচুর অর্থের আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত জাতীয় জীবন গঠনের অনুকূল স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা, দুঃস্থ অসহায় বিধবাগণের জন্য আশ্রম, নির্য্যাতিতা ও ধর্ষিতা নারীগণের জন্য আবাসস্থল নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যেও বহু অর্থের প্রয়োজন। এই সমস্ত কার্য্য করাই আমার জীবনের ব্রত।"

আমরাও এতদিন এই কথাই বলিয়া আসিতেছিলাম। দেশের অধিকাংশ লোক, বলিতে গেলে যাহারা দেশের মেরুদণ্ড, তাহারা অনাহার ক্লিষ্ট, রোগে জীর্ণ, তাহাদের পরিধানে বস্ত্র নাই, ভাল পানীয় জলের অভাবে তাহারা হাহাকার করিতেছে, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া চিকিৎসার অভাবে, পথ্যের অভাবে দলে দলে মরিতেছে, তাহাদের উন্নতি সাধন, তাহাদিগকে ধ্বংসের কবল হইতে উদ্ধার-সাধন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আমাদের দেশনায়কেরা সে দিকে যথেষ্ট দৃষ্টিপাত করেন নাই। বাঙ্গালার গ্রাম ও পল্লীগুলি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে; নিরন্ন দরিদ্রের মুখে ক্ষুধার গ্রাস তুলিয়া ধরিতে হইবে, তাহাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে, রোগের জ্বালায় কাতর হইয়া যাহাতে তাহারা বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু, করিতে হইবে বলিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না। গ্রাম ও পল্লীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। বড় বড় সহরে যাঁহারা এখন বাস করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পল্লীগ্রাম হইতে সহরে আসিয়াছেন; তাহাদের পল্লীগৃহ এখন কোথাও ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে, কোথাও বা জঙ্গলের মধ্যে আত্ম গোপন করিয়া আছে। সহরের বিলাস-ব্যসনের মায়া ত্যাগ করিয়া পল্লী-গৃহে সকলকে গমন করিতে হইবে। দেশে যাতায়াত করিলেই দেশের উপর মায়া জন্মিবে। তখন পল্লীর উন্নতি সাধনের জন্য আগ্রহ জন্মিবে। নতুবা কালে ভদ্রে কোন গ্রামে যাইয়া দুইটা বক্তৃতা করিলে কোন ফলই হইবে না; দূর দেশ হইতে প্রেরিত স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রাণপাত চেষ্টাতেও কিছু হইবে না। যাঁহারা গ্রামে বাস করেন, তাঁহারা ঘোর অভাবগ্রস্ত; নিতান্ত নিরুপায় বলিয়াই তাঁহারা গ্রামে থাকেন। তাঁহাদের এমন অর্থ সামর্থ্য নাই যে, গ্রামের হিতকর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। কাজ তাঁহাদের দ্বারাই করাইতে হইবে। তাঁহাদের গ্রামের অভাব মোচনের জন্য তাঁহাকেই নিযুক্ত করিতে হইবে, এবং গ্রামের যে সকল সম্পন্ন অধিবাসী প্রবাসেই জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহাদের এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই প্রকৃতপক্ষে গ্রামসকল সমৃদ্ধ হইবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যদি এই দিকে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষের কোনই সম্ভাবনা নাই; ইহাতে দলাদলিরও স্থান নাই; নরম গরম সকলেই একবাক্যে এক প্রাণে পল্লীর উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন; হিন্দু মুসলমান একযোগে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন।

ভারত-রাজপ্রতিনিধি প্রতি বৎসরই শীতের সময় সফরে বাহির হইয়া থাকেন, ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, নানা রূপে অভিনন্দিত হইয়া রাজধানীতে বা শৈলাবাসে ফিরিয়া যান। সেই চিরাগত প্রথা অনুসারে ভারত-রাজপ্রতিনিধি লর্ড রেডিং বাহাদুর এবারও সফরে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু এবার বোম্বাই ও কলিকাতায় তাঁহার আগমন উপলক্ষে বড়ই একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত প্যাটেল মহোদয় বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর প্রেসিডেণ্ট। তিনি স্বরাজ-দলভুক্ত। বড়লাট সাহেব বোম্বাই যাইতেছেন শুনিয়া তিনি প্রকাশ করেন যে, লাট সাহেবের অভ্যর্থনায় বা তাঁহার অভিনন্দনে তিনি যোগদান করিবেন না। তিনি বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তা, অথচ তিনি লাট-অভ্যর্থনায় যোগ দিবেন না, সে কেমন কথা? বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর সভার অধিবেশন হইল। তাহাতে অধিকাংশের মতে স্থির হইল যে, মিউনিসিপালিটীর প্রেসিডেণ্টকে অভ্যর্থনায় যোগ দিতে হইবে। শ্রীযুক্ত প্যাটেল মহোদয় এ আদেশ অমান্য করিলেন; তিনি লাট-অভ্যর্থনায় যোগ দিলেন না, এবং মিউনিসিপালিটীর প্রেসিডেণ্টের পদে ইস্তাফা দিলেন।

এই ত গেল বোম্বাইয়ের কথা। কলিকাতাতেও ঐ দৃশ্যেরই পুনরভিনয় হইল, তবে একটু রূপান্তরিত ভাবে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর যিনি কর্ত্তা, তাঁহাকে মেয়র বলে। বর্ত্তমানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর মেয়র। প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাঁহাকে হাবড়া ষ্টেশনে বড়লাট বাহাদুরের সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য উপস্থিতির নিমন্ত্রণ লাটসাহেবের সেক্রেটারী করিলেন।

নিমন্ত্রণ দেশবন্ধুকে ব্যক্তিগত ভাবে নহে, কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর মেয়র ভাবেই। চিত্তরঞ্জন নিজে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না; তিনি মিউনিসিপাল করপোরেশনের সদস্যদিগের উপর সিদ্ধান্তের ভার দিলেন। সভার অধিবেশন হইল; অধিকাংশ সদস্যের মতে স্থির হইল যে মেয়র মহোদয় হাবড়া ষ্টেসনে বড়লাটের সংবর্দ্ধনায় উপস্থিত হইবেন না। সুতরাং দেশবন্ধু লাট-অভ্যর্থনায় যোগদান করেন নাই। এমন ব্যাপার কিন্তু পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

লাহোরের ৭ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পঞ্জাব কনফারেন্সের কার্য্য শেষ করিবার পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী সভাপতিরূপে কয়েকটি মন্তব্য করেন। তিনি পূর্ব্ব দিন যাত্রে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, পুনরায় সেই সব কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া হিন্দু-মুসলমানের একতা, চরকার প্রচলন এবং অস্পৃশ্যতা পরিহারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি পুনরায় বিপ্লববাদিগণের হিংসামূলক কার্য্যপদ্ধতিকে বিশেষভাবে নিন্দা করিয়া বলেন যে, বিপ্লববাদিগণ দেশের শত্রু, কারণ তাহারা তাহাদের ভ্রান্ত পন্থার অনুসরণ দ্বারা প্রতিনিয়তই স্বরাজ লাভে বিলম্ব ঘটাইতেছেন। তিনি গম্ভীরভাবে একটী নূতন পন্থার বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন এবং তাহাতে তিনি স্বরাজলাভ অথবা প্রাণ বিসর্জ্জন এই দুইটীর একটী করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিবেন। কারাবরণ অথবা জেলে যাওয়ারূপ কোন মধ্যপন্থার কথা তাহাতে থাকিবে না। এই নূতন কর্ম্মপন্থার কল্পনা সুপরিণত হইলে তিনি তাহা যত সত্বর হয় দেশবাসীর নিকট ঘোষণা করিবেন। সর্ব্বশেষ মহাত্মাজী বলেন যে, তিনি দেশবাসীর কণ্ঠে "মহাত্মা গান্ধী কি জয়" এই ধ্বনি মোটেই পছন্দ করেন না। তিনি সকলকে তাঁহার নীতি ও কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিতে বলেন। যাঁহারা তাঁহার উপদেশের অনুসরণ করেন না, তাঁহাদের মুখে তাঁহার নামোচ্চারণে তিনি গর্ব্ব অনুভব করেন না।

ভারতবর্ষে যে সকল বিলাতী সিবিলিয়ান চাকুরী করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর পক্ষপাতী নহেন, এ কথা সকলেই জানেন। তাঁহাদের সান্ত্বনার জন্য বিলাতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মহোদয় বলিয়াছিলেন যে, বিলাতী সিবিলিয়ানেরাই ভারত-শাসনের মেরুদণ্ড; তাঁহারাই এই প্রকাণ্ড শাসন-সৌধের ইস্পাতের কাঠামো (Steel frame); কিন্তু কথায় মন ভিজিতে পারে, চিঁড়ে ভেজে না। বিলাতী সিবিলিয়ানেরা বলেন যে, এই দুর্ম্মূল্যের দিনে তাঁহাদের এই সামান্য (?) বেতনে এ দেশে বাস করা পোষাইতেছে না; তাহার পর নূতন যে শাসন-ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের উন্নতিরও তেমন আশা নাই। এই কারণে অনেকে পদত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া যাইবেন, এ রকম কথাও শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। ওদিকে বিলাতে যে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাহাতে নাকি শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ যুবকগণ প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হন না, কারণ ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিসে এমন কোন উন্নতির আশা নাই, যাহাতে তাঁহারা প্রলুব্ধ হইতে পারেন; বেতন যোগ্যতানুরূপ নহে, ভাতার ব্যবস্থাও তেমন নাই, তাহার পর শাসন ক্ষমতাও অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছে। এ অবস্থায় তাঁহারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিবেন কেন? এদিকে কর্ত্তারা বেশ বুঝিয়াছেন যে, এই ইস্পাতের কাঠামো (Steel frame) না হইলে ভারত শাসন একেবারে অচল হইয়া উঠিবে। সুতরাং যাহাতে অধিক সংখ্যক বিলাতী সিবিলিয়ান এদেশে আসেন, তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে, তাহাদিগকে এ দেশে চাকুরী গ্রহণে প্রলুব্ধ করিতেই হইবে। সেই জন্য এক কমিসন বসিয়াছিল। শ্রীযুক্ত লি সাহেব সেই কমিসনের সভাপতি ছিলেন বলিয়া ঐ কমিসনের নাম লি কমিসন। কমিসনের সদস্যগণ যে মন্তব্য বিলাতে দাখিল করিয়াছিলেন, তাহার অতি সামান্য রদ-বদল হইয়া পাশ হইয়া গিয়াছে। এই কমিসনের মন্তব্য অনুসারে এ দেশের শাসন-কার্য্যে অধিক সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ আমদানী করিতে হইবে; সেজন্য বিলাতী সিবিলিয়ানদিগের বেতন, ভাতা, ছুটী প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহাতে কোন বিষয়ে তাঁহারা কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ না করেন, তাহার বন্দোবস্তে হইয়াছে। এই বন্দোবস্ত তাঁহাদের জন্য ব্যয় প্রায় দুই কোটী টাকা বাড়িবে—আমাদের দেশের লোক ব্যয়ভার বহন করিবেন

দুই চারি কোটী টাকা ব্যয় বাড়িবে, তাহাতে আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই, আমরা খোস মেজাজে, বহাল তবিয়তে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে রহিব। ও সকল আমাদের গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আসল কথা হইতেছে, আমাদের জন্য যে শাসন ব্যবস্থা এত সমারোহে, এত বিপুল ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, চারি বৎসর যাইতে না যাইতে তাহার সপিণ্ডকরণ হইতে চলিল; অথচ আইন যখন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বলা হইয়াছিল যে, দশবৎসর কাল এই ব্যবস্থাই চলিবে; তাহার পর ইহার সাফল্য অসাফল্য বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করা যাইবে। তবে, আইনে এ কথাও ছিল যে, এই আইন মত কার্য্য করিতে কোথাও কিছু সামান্য পরিবর্ত্তন যদি আবশ্যক হয়, তাহা সকৌন্সিল বড়লাট বাহাদুর করিতে পারিবেন; কিন্তু সে রিপুকর্ম্ম মাত্র, মূল নীতির পরিবর্ত্তন বিলাতের মহাসভা করিবেন এবং স্বয়ং ভারত-সম্রাট তাহাতে সম্মতি দান করিবেন। এখন দেখা গেল, দশ বৎসরের অপেক্ষাও সহিল না। আইনে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, দেশীয় উপযুক্ত লোকদিগকে অধিক সংখ্যায় উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে, এবং ক্রমে ক্রমে ভারতের শাসন ব্যবস্থা একেবারে ভারতীয় (Indianize) করা হইবে। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা হইল না, ইস্পাতের কাঠামো অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ান আমদানী করিতেই হইবে, নতুবা শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষা হয় না। সুতরাং যে শাসন-ব্যবস্থা মহাসমারোহে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যাহার কল্যাণে দেশের লোক ক্রমে ক্রমে স্বরাজ লাভ করিবে বলিয়া সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তাহার মূলই নড়িয়া গেল। বোধ হয় অতি সত্বরই একখানি সংশোধিত আইন প্রকাশিত হইবে। তথাস্তু!

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস 'অমলা' প্রকাশিত হইল; মূল্য ২৲।

শ্রীমৎ অধরচাঁদ গোস্বামী প্রণীত 'ভ্রান্তি-যুক্ত-রহস্য' প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত প্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ, বি-এল প্রণীত নূতন নাটক 'বিদ্রোহ' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৸০।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু প্রণীত নূতন গল্প পুস্তক 'সোণার হরিণ' ও 'রক্তকমল' প্রকাশিত হইল; মূল্য প্রত্যেকখানি ১৷৷/০।

শ্রীমতী লীলা দেবীর এলবম্ 'কিশলয়' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৩৲।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন প্রহসন 'জোরবরাত' প্রকাশিত হইল; মূল্য ৷৷০।

শ্রীযুক্ত জে চৌধুরী এম-এ প্রণীত 'আশুস্মৃতি' মূল্য ৷০ আনা, 'তপ্তশ্বাস' ১৲ ও মণিচোর ৷৷৵০ বাহির হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার সম্পাদিত এক সহস্র শ্রীমদ্ভগবত গীতা বিতরণ করিতেছেন। যাঁহারা বেদান্তদর্শনের দিক দিয়া গীতার কৃত দার্শনিক তত্ত্ব অবগত হইতে চাহেন, এবং নিত্য গীতা পাঠ করেন তাঁহারা কলিকাতা ২৮।৩ ঝামাপুকুর লেন রাজেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে একখানি করিয়া গীতা বিনামূল্যে পাইবেন।

অধ্যাপক শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের সম্পাদনে "স্বদেশী সিরিজ" নামে নূতন এক শ্রেণীর গ্রন্থাবলী বাহির হইতেছে। ইহার প্রথম গ্রন্থ 'দেশভক্তি বা আত্মোৎসর্গ' যন্ত্রস্থ হইয়াছে এবং সরস্বতী পূজার দিবস প্রকাশিত হইবে। অধ্যাপক সমাদ্দার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে এই পুস্তকাবলীও যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুখ্যাতি লাভ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

আগামী ২৯শে জানুয়ারী ১৯২৫ বাসন্তী পঞ্চমী দিবসে কবিসম্রাট মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মরণার্থ খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরীর উদ্যোগে দশম বার্ষিক "মধু-মিলন" উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখককে একটী রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইবে। বিষয়ঃ—"মধু-স্মৃতি"। কবিতা একশত ছত্রের অধিক হইবে না ও আগামী ১০ই জানুয়ারী ১৯২৫ উক্ত পাঠাগারের সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA

ভারতী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

[Bharatvarsha Halftone & Printing Works.